প্রকাশক :
শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
বামা পুস্তকালয়
১১এ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২
অরিয়েণ্টাল বুক ডিপো
জলপাইগুড়ি

মুদ্রক :
শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২নং শিবদাস ভাদুড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ :
সুমুথ মিত্র

আমার 'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারির' পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। সেই প্রবন্ধমালার কয়েকটি রচনা এবং সেই সঙ্গে অন্যত্র প্রকাশিত আরো কিছু কিছু লেখা 'সাহিত্য-বিচিন্তা' বইখানিতে সংকলিত হোলো। প্রকাশক শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এই বই প্রকাশের ব্যাপারে অকৃত্রিম অনুরাগের প্রাচুর্যে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই সূত্রে সে-কথা স্মরণ না করলে অন্যায় হবে। ইতি **হু. মি.**

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা

বিষয়-সূচী

অধ্যাপক শ্রীভোলানাথ ঘোষ

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের :

প্রবন্ধ : সাহিত্য-পরিক্রমা
বাংলা কাব্যে প্রাক্-রবীন্দ্র
সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি
কবিতার বিচিত্র কথা
তারাশঙ্কর
সাহিত্যের নানা কথা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ
রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ

কবিতা : তিমিরাভিসার
সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ইত্যাদি

সম্পাদিত সংকলন : নতুন খাতা ও কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য কবিতা
রবীন্দ্র-চর্চা

গল্প : অশেষ গল্প

ছোটদের : মধ্যরাতের সূর্য

সাহিত্য-বিচিন্তা

সাহিত্য-বিচিন্তা

সাহিত্যের কথা

পৃথিবীর মানুষের মুখে নানান্ ভাষা, কলমে বিভিন্ন লিপি। তার সব কথা সাহিত্য নয়। ভাত-কাপড়ের ভাবনা, মড়ক-মহামারীর দুর্ভাবনা, শত্রু-মিত্রের চিন্তা, দেশ-বিদেশের খবর,—সুখ, দুঃখ, মৃত্যু,—আর হাজার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তাকে আত্মসচেতন হতে হয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বুঝতে বুঝতে ক্রমশঃ এই আত্মবোধের পরিণতি ঘটে থাকে। অনেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও প্রত্যেকটি মানুষ বিশেষভাবে এক! ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে বহির্জগৎ নিত্যই তার অন্তর্লোকে প্রবেশ করছে। সেখানে স্মৃতি-বিস্মৃতির অশেষ বৈচিত্র্য! তাতে সুখও আছে, দুঃখও আছে। সব ঢেউ যেন মিলেমিশে তাকে কেবলই আঘাত ক'রে তার একান্ত সীমানা কেবলই বাড়িয়ে দিচ্ছে! মানুষের আত্মসীমার সেই পরিব্যাপ্তি থেকেই সাহিত্যের প্রেরণা দেখা দেয়। আমাদের-সাহিত্য-দার্শনিকেরা 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনায় 'সহিত' শব্দটির ওপরে তাই বিশেষ জোর দিয়েছেন। 'সাহিত্য' এক রকম 'সহিতত্ব'; তাতে একের সঙ্গে অন্যের মর্মস্পর্শী সংযোগ ঘটে থাকে।

জ্ঞানীর সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের কথা বোঝা সম্ভব নয়। ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রের পথ বন্ধুর,—পরিভাষাময়,—শ্রমগম্য। কিন্তু আয়েষার প্রেম, গোবিন্দলালের দুর্বলতা, ইন্দ্রনাথের খেয়াল-খুশি, অমিত-লাবণ্য-কেতকীর দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি আন্তরিক ব্যাপার মানুষের অন্তরের গুণেই অনায়াসে বোঝা যায়। অর্থাৎ সাহিত্য আমাদের জীবন-সত্যেরই সহজ পাঠ! তার টীকা নিষ্প্রয়োজন। তা'হলে সাহিত্যতত্ত্বের আবার বিশদ বিশ্লেষণ কেন? যা স্বতঃপ্রকাশ, তার আবার ব্যাখ্যার দরকার কি? বটগাছ কি আত্মব্যাখ্যানের প্রত্যাশী? আকাশ কি ভূমিকার ভিক্ষুক? চড়ুইটা, শালিখটা,—সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ইত্যাদি ব্যাপার কি স্বতঃসিদ্ধ নয়?

সাহিত্যও স্বতঃসিদ্ধ, সন্দেহ নেই। তার প্রবেশপথ অবারিত—যেমন, ফুলের শোভা দেখবার জন্যে প্রকৃতির দেওয়া চোখ-দুটোই যথেষ্ট। কিন্তু এক গোলাপের সঙ্গে অন্য গোলাপের প্রভেদ বুঝতে হলে আরো খুঁটিয়ে দেখতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও সাহিত্য, মধুসূদনের মহাকাব্যও সাহিত্য; কিন্তু প্রসঙ্গে, প্রকারে এবং রচনার কৌশলে উভয়ের মধ্যে ভেদ নানাবিধ। গীতিকাব্য, মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য,—প্রবন্ধ এবং রম্যরচনা,—ছোটগল্প এবং উপন্যাস—গীতিনাট্য, প্রহসন, ট্র্যাজেডি, কমেডি

ইত্যাদি বিবিধ নাট্যপ্রকার, সাহিত্যের এই সব প্রবাহ বহু শাখা-প্রশাখায় বহুমুখী নদীর মতোই বিচিত্র।

সাহিত্যের এই সব শাখা-প্রশাখার স্বরূপ জানা দরকার। আগেকার দিনে, চোদ্দমাত্রার পয়ার-বাহনে বারো মাসের সুখ-দুঃখের সংক্ষিপ্ত বিবরণীই যখন প্রশংসনীয় কবিতা হিসেবে সমাদৃত হোতো,—হঠাৎ কোনো অভাবিত বিপর্যয়ের ফলে, তখনকার পাঠক যদি সেই সেকালের মন নিয়ে একালের বাংলা কবিতার আসরে নিক্ষিপ্ত হতেন, তাহলে তাঁর চোখে আমাদের আধুনিক কাব্যরীতি কি উৎকটভাবে পৃথক বা ভিন্নজাতীয় বলে বোধ হোতো না? সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। মানুষের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে। সেই সঙ্গে সাহিত্যের ভাষা আর ভঙ্গি, প্রকার এবং আদর্শ কেবলই বদলে যাচ্ছে।

অতীতে ছিল পয়ার-ত্রিপদীর দিন। আমাদের সাহিত্যে তখন বিশেষ-বিশেষ ধর্মপ্রসঙ্গের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রথার চর্চা চলেছিল; কবিদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কতকটা নৈমিত্তিক যোগ বা আনুষঙ্গিক সম্পর্কমাত্র সে সাহিত্যে আদর পেয়েছে। সংস্কৃতের 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' (খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতক) এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' (ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকের রচনা),—প্রাকৃতের 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' (চতুর্দশ-শতাব্দী) ইত্যাদি রচনার মধ্যে কতকটা আনুষঙ্গিক ভাবে সেকালের সেই ভিন্ন রুচির কবি-মনেরই পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

বাংলা ভাষার উদ্ভবের যুগে অথবা তার আগেও, এদেশে সাহিত্য-চর্চার অভাব ছিল না। খ্রীষ্টাব্দের ৮০০ থেকে ১২০০-র মধ্যে মগধ অঞ্চলের প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশঃ বাংলার পৃথক রূপ দাঁড়িয়ে গেছে। সংস্কৃতে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতে যেমন,—তেমনি আবার শৌরসেনী অপভ্রংশের বাহনেও সে সময়ে সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃতের পথই ছিল সেকালে সাহিত্যকীর্তির প্রশস্ততম পথ। অনেককালের চর্চাতে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জৈন শাস্ত্রকারেরা সংস্কৃতের সাহায্যেই শাস্ত্রচর্চা করেছেন; জৈন কবিরা লিখেছিলেন প্রাকৃত ভাষায়। বাংলা দেশে তাঁদের প্রতিপত্তি তবু কমই ছিল। ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ মতের দিকেই বাংলার আনুগত্য বা মনোযোগ বেশি পড়েছিল। বাঙালী বৌদ্ধসমাজে আবার মহাযানপন্থীরাই ছিলেন দলে ভারি। তাঁরা লিখেছিলেন হয় খাঁটি সংস্কৃত ভাষায়, নয় তো প্রাকৃত মেশানো সংস্কৃতে—যার নাম 'বৌদ্ধসংস্কৃত'। খ্রীষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতক থেকে সে প্রথার পরিবর্তন শুরু হয়। খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকের শেষে বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে বাংলায় তুর্কী বিজয়ের পর থেকেই এদেশে সংস্কৃতের পরিবর্তে মথুরা অঞ্চলের শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনীতিকুমার বলেছেন যে, মধ্য এবং

পশ্চিম ভারতে আমাদের একালের হিন্দীর মতন সেকালে শৌরসেনী প্রাকৃতই ছিল সর্বপরিচিত ভাষা। খ্রীষ্টাব্দের ৪০০ থেকে ৫০০-র মধ্যে সে ভাষা সারা আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়েছিল; তারপর, ৬০০ থেকে ১২০০-র মধ্যে গেছে শৌরসেনী অপভ্রংশের বিস্তারের যুগ।

সংস্কৃতের যুগেও বাঙালীর সাহিত্যানুরাগী মন নিষ্ক্রিয় ছিল না। সংস্কৃতের মধ্যেও বাঙালী ভাষাশিল্পীর মনের ছাপ পড়েছে। বাংলার নাম থেকে গেছে সংস্কৃত গদ্যের প্রসিদ্ধ 'গৌড়ী রীতি'-র মধ্যে। আবার সন্ধ্যাকর নন্দী, শান্তিদেব, জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধনাচার্য প্রভৃতি বাঙালী সাহিত্যিক খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকেও জনসাধারণের জন্যে সহজ সংস্কৃত কাব্য লিখে গেছেন। সেকালের কাব্যানুরাগী বাঙালীর প্রিয় সংস্কৃত-কবিতার একখানি সংকলন বেরিয়েছিল তারই কাছাকাছি সময়ে। বাংলা দেশ যে কবিতার দেশ, সেকথা আজও সত্য, সেকালেও সত্য ছিল। বাঙালী কবিদের সংস্কৃত কবিতার কিছু-কিছু নমুনা আছে সেই 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে; তার মূল পুঁথি যদিও খণ্ডিত, তবু তারই মধ্যে মোট একশ' এগারো জন কবির নাম পাওয়া গেছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বইখানি সংকলিত হয়েছিল আরো পরে,—১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে। সংকলয়িতার নাম শ্রীধরদাস। তাতে সর্বসমেত চারশ' পঁচাশি জন কবির প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক সংগৃহীত হয়েছিল। পশু-পক্ষী, প্রেম, যুদ্ধ, ঋতু-বর্ণনা এবং আরো নানা বিষয়ে কবিরা এই সব শ্লোক লিখেছিলেন।

সুনীতিকুমার আরো বলেছেন যে, বাংলা দেশে তুর্কী-পূর্ব যুগেই কথাত্মক 'মঙ্গল' কাব্য এবং গানময় 'পদ'-এর প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টাব্দের নবম-দশম শতকে লেখা হয়েছিল বৌদ্ধ চর্যাপদ। মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলী, এই দুটি নহরেই, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান ঝোঁক বলতে যা বোঝায়, তা' দীর্ঘকাল বয়ে এসেছে। এ-দু'টিকে আমাদের সাহিত্যের দুটি বিশেষ 'প্রকার' বা 'শ্রেণী' বলা উচিত। খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকে লেখা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে এই দুই ধারার সমন্বয় অনুমান করে সুনীতিকুমার আরো জানিয়েছেন—'ইহা শ্রীকৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক উজ্জ্বল বা প্রেমরসের গীতিময় 'মঙ্গল'-ও বটে আবার এতে মধুর-কোমল-কান্ত 'পদাবলী'-ও নিহিত আছে।'

সংস্কৃতের প্রভাবে তো বটেই,—তা' ছাড়া আরো নানা রকম পরিবেশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার ফলে রূপ, ভঙ্গি, আদর্শ ইত্যাদি ব্যাপারেও বাংলা সাহিত্যে অনেক বৈচিত্র্য দেখা গেছে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে গদ্যের চর্চা দেখা দিয়েছে,—বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেই গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার আদর্শ দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু সাহিত্যের রাজ্যে কোনো বিশেষ রূপই অনন্ত স্থায়িত্বের পরোয়ানা নিয়ে আসে না।

বিশেষ কোনো কোনো কবিতা বা গল্প, নাটক বা উপন্যাস হয়তো দীর্ঘ সমাদরের আয়ু নিয়ে দেখা দেয়, কিন্তু পদাবলী বা মঙ্গলকাব্য,—যাত্রা বা পাঁচালী ইত্যাদি শাখাগুলি ঠিক সে অর্থে দীর্ঘস্থায়ী নয়। মন যে বারে-বারে নতুন পথ খুঁজতে থাকে। পুরোনো প্রথার বদল হয়। মধ্যযুগের মঙ্গলগানের পরে দেখা দেয় আধুনিক কালের গদ্যে লেখা কাহিনী। পশ্চিমের হাওয়াতে, বাংলা 'যাত্রা'র ক্ষেতে এইভাবেই হঠাৎ এক সময়ে নাটকের বীজ বোনা হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রবাহে পৃথিবীর বড়ো যে-ছুটি সাহিত্য-প্রবাহের খুবই বেশি প্রভাব পড়েছে, সেই সংস্কৃত আর ইংরেজী সাহিত্যের ধারা ছুটিরও মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। তা' ছাড়া, সাহিত্যের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে জড়িত বিশেষ কয়েকটি শব্দেরও মর্মার্থ জানা দরকার—যেমন 'ক্ল্যাসিক্যাল' এবং 'রোমান্টিক',—'বাচ্যার্থ' ও 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। তবে, এ সব কথা এলোমেলোভাবে তালিকাবদ্ধ করা ঠিক নয়। সংস্কৃতের অলঙ্কারশাস্ত্র বিপুল আয়তনময়,—এবং তার গভীরতাও কম নয়। পশ্চিমের পণ্ডিতসমাজও সাহিত্যের তত্ত্বকথার সন্ধানে পর্বে-পর্বে বহু পরিভাষা তৈরী করে গেছেন। 'ক্ল্যাসিক্যাল' এবং 'রোমান্টিক,'—'সাব্‌জেক্‌টিভ্‌' এবং 'অব্‌জেক্‌টিভ',—'মিষ্টিক্', 'মেটাফিজিক্যাল',—ট্র্যাজেডি', 'কমেডি', 'ক্যাথারসিস্', 'ক্লাইম্যাক্স' ইত্যাদি শব্দ এখন আমরা বাংলাতে প্রায় আত্মসাৎ করে নিয়েছি।

সাহিত্যের সংজ্ঞা বা সূত্রের কথা সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'বস্তুতঃ বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা-রচিত সেই চিত্র এবং গানই সাহিত্য।' সাহিত্যের মধ্যে চিত্রধর্ম এবং সংগীতধর্ম, ছুই-ই আছে। এই ছুটি গুণের কথা বিশেষভাবে আলোচ্য। চিত্রধর্মের সঙ্গে চোখে-দেখা ছবির সম্পর্কই শুধু নয়,—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কও ধর্তব্য। এ-কালে 'ইমেজ' ও 'ইমেজিজ্‌ম্' শব্দ ছুটি খুবই চলে থাকে। সাহিত্যের সেই 'ইমেজ'-প্রসঙ্গেই 'চিত্রধর্মের' বিশদ আলোচনা স্বীকার্য। আর, 'সংগীতধর্মের' কথা ছন্দের আলোচনাসূত্রেই গ্রাহ্য।

কিন্তু, সব কথার আগে রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি কথা মনে পড়ে। সংগীতধর্ম, চিত্রধর্ম এবং ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ের ভাষা—এই তিনের মিল ঘটলেই যে সাহিত্য হবে, তার কোনো মানে নেই। 'ও মা, তুমি আমাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলে···' বলে পর্দায়-পর্দায় কান্না ছড়িয়ে যাওয়ার নাম 'সাহিত্য' নয়! ব্যক্তিবিশেষের শোকভাব,—তাঁর কণ্ঠস্বরের 'সংগীত-ধর্ম'—এবং অকূলে ভেসে যাবার 'চিত্র'—এই তিন রকম উপকরণের সমাবেশ মাত্রের নাম সাহিত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই বলে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন যে, 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা,

ইহাই ললিতকলা।' সাহিত্যের এই সর্বজনীনতার দিকটি বিশেষভাবে মনে রাখা চাই। সেই আদি-সত্যটি মনে রেখে এইবার সাহিত্যের দৃগ্‌ভঙ্গি এবং দৃষ্টিবৈচিত্র্য বা জগৎ-নিরীক্ষায় সাহিত্যস্রষ্টার মর্জি, স্বভাব এবং অভিমুখিতার কথা বলা যাক্।

ইংরেজিতে Subjective এবং Objective কথা দু'টি সুপ্রচলিত। বাংলায় প্রথমটিকে 'আত্মলীন' এবং দ্বিতীয়টিকে 'বস্তুলীন' বলা হয়। সাহিত্যের পর্যালোচকরা এই দু'টি কথা নিত্যই ব্যবহার করে থাকেন। এই সংকেত দুটির মর্মার্থ বোঝা দরকার।

কবিরা তাঁদের চারদিকের জগৎ-ব্যাপারের বিচিত্র রূপ-গুণ-ঘটনার প্রবাহের মধ্যে বাস করে, জগতের অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা পেতে পেতে, তাঁদের নানান্ রচনা লিখে যান। অভিজ্ঞতার প্রভেদ অনুসারে এক-একজন কবির এক-একরকম মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে। মনে পড়ে, মেঘনাদবধ-কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শুরুতেই একটি সন্ধ্যার বর্ণনা আছে—

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখি পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হাম্বা-রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।

সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যা,—তারপর রাত্রি-সমাগমের এই যে ছবিটি মধুসূদন ফুটিয়ে তুলেছিলেন, এর মধ্যে তাঁর ভঙ্গিটি ছিল ভাবুক দর্শকোচিত! সূর্যাস্ত ঘট্‌তে দেখে, একজন ভাবুক দর্শক একে-একে প্রকৃতির উপকরণগুলি এখানে বলে গেছেন। দিনমণির অস্তলগ্নতা, গোধূলির আবির্ভাব, আকাশে সন্ধ্যাতারার একক অস্তিত্ব, সরোবরে পদ্মের সংকোচ, পাখিদের নীড়ে প্রত্যাগমন ইত্যাদি বাইরের ব্যাপারেই তাঁর দর্শকচিত্তের বিশেষ অভিনিবেশ দেখা যাচ্ছে। একে আমরা নৈর্ব্যক্তিক মনোযোগ বলতে পারি। তার্কিক মানুষ অবিশ্যি 'নৈর্ব্যক্তিক' কথাটায় ছল ধরবেন। ব্যক্তি-মনের অভিজ্ঞতা কখনো কি সম্পূর্ণ 'নৈর্ব্যক্তিক' হতে পারে? না, তা পারে না বটে—তবু এর ঝোঁকটা নৈর্ব্যক্তিকতার দিকেই। অর্থাৎ মধুসূদন এখানে সাধ্যানুসারে তাঁর আত্মমনের উচ্ছ্বাস উহ্য রেখেছিলেন। এই সঙ্গে আর-এক রকম বর্ণনা মিলিয়ে

দেখলে এ বিষয়ে সন্দেহ দূর হবে। 'কল্পনা'র 'আহ্বান'-কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা—
দিনের কল্লোল-'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে—
নাহি পায় সীমা।
নয়নপল্লব-'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান,
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম—
এখনো আহ্বান ?

ওপরের দুটি উদ্ধৃতিতেই সন্ধ্যার ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু শেষেরটিতে কবির নিজের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা যেন একটু বেশি বলা হয়েছে। আত্মলীন ভঙ্গির স্বভাবই তাই। বাইরের উপকরণ যে-রকমই হোক্ না কেন,—এই জাতের লেখার মধ্যে কবির মন যেন বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীর ওপরেই বেশি লগ্ন থাকে। 'ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম'—এই আত্মকথা বা আত্মমনোভাবই দ্বিতীয় ছবিটির প্রধান বিশেষত্ব,—যা প্রথমটিতে অনুপস্থিত। প্রথমটিতে বরং বিষয়-বর্ণনাই ছিল প্রধান ব্যাপার।

'বস্তুলীনতা'র নামান্তর হোলো 'তন্ময়তা'। বাংলায় একই অর্থে 'বিষয়মুখ' এবং 'বিষয়াশ্রিত' শব্দ দুটিও ব্যবহার করা হয়। তেমনি 'আত্মলীন' অর্থে 'আত্মমুখ' ও 'মন্ময়' শব্দেরও প্রচলন আছে। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এই ধরনের পরিভাষার মান নির্ধারিত হওয়া দরকার। অনেক শব্দের অবাঞ্ছিত ভিড়ে নির্দিষ্ট অর্থের অভিপ্রেত লক্ষ্যটুকু হারিয়ে না যায়, সেদিকে নজর থাকা চাই। যাই হোক্, সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, সাহিত্যে আত্মলীন মনোভঙ্গি দেখা দিয়েছে বস্তুলীন মনোভঙ্গির পরের পর্যায়ে। আদিম মানুষ তার চারদিকের দৃশ্যমান বস্তু এবং ঘটমান ঘটনা সম্বন্ধেই বেশি উৎসাহ বোধ করতো। ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে আপন মনোলোকে যা-কিছু সহজে পাওয়া যায়, তাতেই ছিল তার মুখ্য আগ্রহ ; ততোধিক গভীর কোনো-

রকম ভাবনা বা ততোধিক মন্ময় অভিজ্ঞতা তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ছিল। মহাকাব্যে, গাথাতে এবং নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে বিষয়মুখী মনোভঙ্গির প্রাধান্য দেখা যায়। কেবল এই তিন রকম রচনার মধ্যেই যে আদিম মানুষের কলমের ছোঁয়া লেগে আছে, তা নয়। তবে, বস্তুলীন ভঙ্গির উদাহরণ দিতে হলে এই তিনের কোনোটিকেই বাতিল করা যাবে না। তেমনি আত্মলীন মনোভঙ্গির উদাহরণ হিসেবে গীতিকবিতার নাম অবশ্য-স্মরণীয়।

কিন্তু 'বস্তুলীন' আর 'আত্মলীন',—'তন্ময়' এবং 'মন্ময়' এই সব গুণ ঠিক আলাদা আলাদা গণ্ডী নয়। মহাকাব্যের মধ্যেও মন্ময় অংশের অভাব নেই। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের অল্পবিস্তর আভাস তাঁর মেঘনাদবধ-কাব্যেও দুর্লভ নয়। সাহিত্যের রাজ্যে স্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা কখনো বহির্জগৎ সম্বন্ধে, কখনো বা মনের বিশেষ বিক্ষোভ, আলোড়ন, উদ্দীপনা ইত্যাদি আত্মগত উচ্ছ্বাসেই আকৃষ্ট হয়ে, ভাষার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং এক হিসাবে মানুষের প্রকাশমাত্রই আত্মপ্রকাশ,—সাহিত্য-মাত্রই আত্মময়!

অতএব মন্ময়তা এবং তন্ময়তা দুটিই হোলো মনের আপেক্ষিক দুই গুণ বা লক্ষণ। সাহিত্য একান্তভাবে যদি ব্যক্তিবিশেষেরই আত্মকথা হোতো, তাহলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ তা' পড়বার প্রয়োজন বোধ করতেন না। কারণ, মানুষ নিজেকে যাতে বা যে-জিনিসে তিলমাত্র সম্পর্কিত না দেখে, সে-জিনিসে তার কোনো অভিরুচি থাকে না।

এ বিষয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এর বেশী এগুলে তত্ত্বকথার বাড়াবাড়ি ঘটবে। সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা থেকে সাহিত্য-দর্শনের চোরাবালিতে এগিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—'সাহিত্য কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়টা সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে বাজে বিচার, যেমন এ বিশ্ব কি রকম হওয়া উচিত ছিল, সে-বিচারটা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে বাজে বিচার।' তিনি আরো স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন—'সাহিত্যের আলোচনা সাহিত্যের ফিলজফিতেই সহজে গড়িয়ে যায়।' এবং 'কাব্যবস্তু কি, আর দাশরথি রায়ের পাঁচালী সাহিত্য কি না, এ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন, কারণ প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ফিলজফারের কাছে, দ্বিতীয়ের আর্টিষ্টের কাছে।'

প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্যটি,—বিশেষ করে শেষেরটি একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার। কাব্যবস্তু কি, সে জিজ্ঞাসা সংস্কৃতের রসবাদীরা একভাবে দেখেছিলেন, অলঙ্কারবাদীরা অন্যভাবে। কিন্তু, সাহিত্যের গভীর সত্য পাঠকের বোধেতেই সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বিত হয়।

কবিরা সব সময়েই যে অন্তরের গভীর কোনো তাড়নার ফলে রচনায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন, তা' নয়। কোনো-কোনো লেখা যেমন লেখকের অকৃত্রিম হৃদয়-ব্যাকুলতার প্রকাশ, অন্যান্য লেখার মূলে তেমনি থাকে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ, সাময়িক কোনো ঘটনার তাগিদ কিংবা অন্যান্য বৈষয়িক নিমিত্ত। লেখকদের ব্যক্তিগত যশের ইচ্ছেও থাকতে পারে, টাকা-পয়সাব প্রয়োজন ঘটাও স্বাভাবিক। এবং এসব কারণেও যেসব লেখা দেখা দেয়, সেগুলি যে নিতান্তই অপদার্থ হবে, তার কোনো মানে নেই। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' বইখানিব কথা এই সূত্রে মনে পড়া স্বাভাবিক। ১৩৩৫ সালে তাঁর প্রেমের কবিতার একটি সংগ্রহ ছেপে বের করবার কথা হয়। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ লিখে জানিয়েছেন—'কথা হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল···।' এই ফরমাসেব ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছিলেন—'ফরমাস ব্যাপারটা মোটর গাড়ীর স্টার্টার-এর মতো। চলনটা শুরু করে দেয়, কিন্তু তারপরে মোটরটা চলে আপন মোটারিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়।'

অতএব ফরমাসের তাগিদে উঁচুদরের সাহিত্য যে একেবারেই না-লেখা যায়, তা' নয়। তবে, কবির নিজের মনে কোনো বিশেষ ফরমাসের পক্ষে বা অনুকূলে যদি আদৌ কোনো সমবেদনা না থাকে, তাহলে সে সম্ভাবনা আশা করা চলবে না। অর্থাৎ 'ফরমাস'ও ফলতঃ 'প্রেরণা' হতে পারে,—যদি লেখক তা চান!

'কণিকা'-তে, কিংবা 'লেখন'-এর মতন ছোটো ছোটো লেখাতেও রবীন্দ্রনাথেব সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয় আছে, আবার 'গল্পগুচ্ছ', 'ফাল্গুনী', 'গোরা' ইত্যাদি বড়ো আয়তনের রচনাব মধ্যেও, তাঁর সার্থক আত্মপ্রকাশের স্বাদ পাওয়া যায়। গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি ভাগগুলিকে সাহিত্যের 'প্রকার' বললে অসঙ্গত হয় না। 'গীতিকাব্য' এই রকম একটি 'প্রকার'। তার মধ্যে আবার এক-একটি কবিতার এক এক রকম 'রূপ'। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফর্ম',—বাংলায় 'রূপ' কথাটি তারই প্রতিশব্দ হিসেবে প্রযোজ্য। খুঁটিয়ে দেখলে প্রতিটি রচনার মধ্যে পৃথক-পৃথক 'রূপের' পার্থক্য দেখা যাবে। এই বইয়ের অন্যত্র বলা হয়েছে—'ইংরেজিতে Type আর Form কেউ-কেউ বেশী কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করেন।··· সাহিত্যের প্রকারকে Type না বলে Kind বলাই ভালো। কারণ, নৈয়ায়িকবা বস্তুর যে কোনো গুণ বা লক্ষণগত (accidental) বিভাগকে বলেছেন 'টাইপ'-গত বিভাগ; অপর পক্ষে,—বস্তুর ব্যাপকতর, অধিকতর, গুরুতর (essential) গুণ বা লক্ষণভেদ থেকেই যথার্থ প্রকারভেদের

(difference in kind) ভাবনা দেখা দেয়।' কবির বোধ অনুসারেই রচনাবিশেষের প্রকার, রূপ এবং গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 'গীতিকাব্য' হোলো সাহিত্যের বিশেষ এক 'প্রকার'; রবীন্দ্রনাথের 'জুতা-আবিষ্কার'ও গীতিকবিতা, 'বসুন্ধরা'ও গীতিকবিতা; কিন্তু দুটির 'রূপ' এক নয়—অর্থাৎ এদের মধ্যে ফর্মের পার্থক্য আছে।

কবিতার প্রকারভেদ সম্বন্ধে 'দৃশ্য' এবং 'শ্রব্য', এই দুটি বিভাগের কথা সুপরিচিত। মহাকাব্য এবং গীতিকাব্যের বিভাগও সকলেরই জানা। ইংরেজিতে লিরিক, ওড্, ইডিল, এলিজি, ব্যালাড্ ইত্যাদি বহুবিধ প্রকারভেদ দেখা যায়। এগুলিকে ঠিক একই অর্থে 'প্রকার' বলা সঙ্গত নয় বটে,—তবু অন্য অর্থে এরাও 'প্রকার' বই কি! সংস্কৃতের শ্রব্যকাব্য হোলো সেই বড়ো বিভাগ—যার মধ্যে এরা সকলেই জায়গা পেতে পারে।

কবিতাই হোক্, আর গদ্য-রচনাই হোক্, রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হিসেবে দুয়েরই নানা প্রকারভেদ আছে। উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি গদ্য-বিভাগের কথা কে না জানেন? সাহিত্যের প্রকারগত বিভিন্নতা যদি এতোই ব্যাপক হয়, তাহলে তার রূপগত বৈচিত্র্য যে আরো বেশি হবে, সেও স্বতঃসিদ্ধ।

হোমার-এর দু'খানি মহাকাব্য অবলম্বন করেই পশ্চিমের সাহিত্যে 'এপিক' সম্বন্ধে আলোচনার বিস্তার ঘটেছে। হোমারের সঙ্গে সঙ্গে ভার্জিলেরও নাম ছড়িয়েছে। এঁরা ছাড়া পশ্চিমে এপিক-কাব্যের আরো লেখক আছেন। তবে, অ্যারিস্টটল্ প্রধানতঃ হোমারের কাব্য পড়েই 'এপিক'-এর লক্ষণ এবং আদর্শ বিচার করেছিলেন। অ্যারিস্ট-টলের পরে, সেই মূল আলোচনার প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী পাঠকসমাজের ওপর। মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু, নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য উপকরণের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই। সেকালের প্রাচীন মহাকাব্যের ধারায় নতুন কালের নতুন অনুকরণ বা অনুসরণ দেখা গেছে। হোমারের পরে মিল্টন এসে, বাল্মীকির পরে মধুসূদন এসে এই ধরনের অনুসরণ দেখিয়ে গেছেন। আদি-মহাকাব্যের নাম 'Authentic Epic'; অনুকৃত মহাকাব্যের নাম 'Literary Epic'। বিদেশী সমালোচক বলেছেন,—প্রথম শ্রেণীর রচনাকে বলা যায় খাঁটি মাটির ফসল,—কোনো বিশেষ কালের বিশেষ শিক্ষার অধীন রসিক-সমাজের মধ্যেই তার আবেদন গণ্ডীবদ্ধ নয়; অপর পক্ষে, অনুকৃত মহাকাব্য এক-একজন বিশেষ লোকের রচনা,—দূর অতীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে লেখকরা তাতে যেন পুরানো কালের প্রতিলিপি বানিয়ে থাকেন।

ইংরেজী সাহিত্যে সুপ্রাচীন, খাঁটি মহাকাব্যের নমুনা হিসেবে কোনো কোনো সমালোচক Beowulf-এর নাম করেছেন; বাংলায় সেই ঝোঁকে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী-

মঙ্গল'-কে কিন্তু 'মহাকাব্য' বলা সঙ্গত হবে না। বিষয়ের বিস্তার পাত্র-পাত্রীর অসাধারণতা, রীতি বা স্টাইলের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি মহাকাব্যের নানান্ আবেদনের কথা খুঁটিয়ে দেখলে বাংলায় সত্যিকার 'আদি মহাকাব্য' যে একখানিও নেই, সে কথা মেনে নিতে আপত্তি হবে না। কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস ছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদক আরো ছিলেন বটে। কিন্তু সে অন্য কথা। মধুসূদনের আমলেই বাংলায় কয়েকখানি 'অনুকৃত-মহাকাব্যে'র উদাহরণ দেখা গিয়েছিল।

মহাকাব্য যেখানেই লেখা হোক্ না কেন,—সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের জগতে,—আঞ্চলিক ভেদ-বিভেদ সত্বেও তার মূল স্বভাবের ঐক্য বা সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতেই হোক্, আর হোমার, ভার্জিল, ট্যাসো প্রভৃতি বিদেশীদের রচনাতেই হোক্—সব ক্ষেত্রেই মহাকাব্যের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপকরণ বা লক্ষণের প্রকাশ ঘট্‌তে দেখা গেছে। মহাকাব্য সব ক্ষেত্রেই আখ্যানময় কাব্য হওয়া চাই,—তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে গঠনের সংগতি বা আদর্শ থাকা চাই,—সেই 'organic structure'-এর সঙ্গে বিষয়মাহাত্ম্য এবং রীতিবৈশিষ্ট্যের স্বাদটাও অবশ্যপ্রাপ্য এবং মূল বা প্রধান গল্পের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বা সমর্থনকারী আরো বহু গল্পের সমাবেশ ঘটাও আবশ্যক। সাহিত্যের অন্যান্য 'প্রকার' বা 'শ্রেণী'তে যেমন, মহাকাব্যের ব্যাপারেও তেমনি নির্দিষ্ট আদর্শ বা বিশেষ বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে চলাটাই শিল্পীর স্বভাব। কোনো ছাঁচই চূড়ান্ত নয়। ক্রোচে বলে গেছেন,—খাঁটি শিল্পসৃষ্টির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত আদর্শের লঙ্ঘন বা অতিক্রান্তির চিহ্ন চোখে পড়বে ("Every true work of art has violated some established class")। মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও সেই সাধারণ আইনের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন?

চিরন্তনী

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যাজ্‌লিট সাহেব তাঁর কাব্যবিষয়ক এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—'Man is a powerful animal'। কাব্য যে অলসের ভাববিলাসমাত্র নয়,—কাব্যের প্রয়োজনীয়তা যে অনিবার্য, এ-সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। তাই তিনি বলেছিলেন—ইতিহাসের অধ্যায়গুলো মানব-সংসারের নানা ঘটনার শূন্য পাত্র, আর কাব্য হোলো সেই সব ঘটনার অন্তরঙ্গ স্পন্দন। প্রতিভার যাদুস্পর্শে কবির মুখে যে বাঙ্‌নির্মিতি ঘটে থাকে, তারই নাম কাব্য। আর, প্রতিভা হোলো অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা।

কাব্য যে অপূর্ব বস্তু,—এ সম্বন্ধে কাব্যরসিকের মনে কোনো সন্দেহ জাগে না। কিন্তু কাব্যের এই অপূর্বত্ব-গুণটি কাব্যের কোনো বিশেষ উপাদানে আশ্রিত কি না,—তাই

নিয়ে পৃথিবীর সাহিত্য-প্রাজ্ঞেরা মাথা ঘামিয়েছেন। কাব্য যে একটি সর্বজনীন ব্যাপার—সুধীজনের আলোচনায় বারে বারে সেই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টায় পণ্ডিতেরা শারীরতত্ত্ব থেকে মনস্তত্ত্ব অবধি সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন। কারণ, শরীরের মাধ্যমেই জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে থাকে এবং দেহযন্ত্রলব্ধ নানাবিধ অভিজ্ঞতাই সাহিত্যের উপাদানরূপে গৃহীত হয়। রসশাস্ত্রে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি ন'টি স্থায়িভাবের উল্লেখ ছাড়া আরো অনেকগুলি সঞ্চারীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই সব স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবের ওপর মানুষমাত্রেরই অধিকার স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু কাব্য রচনায় মানুষমাত্রেই সিদ্ধ নয়। মানুষমাত্রেই কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো বা ভালোবাসে। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতির মার্কা-মারা এই সব অভিজ্ঞতার স্তূপ বাসি ফুল-পাতা-আবর্জনার সঙ্গে প্রতিদিনই স্মৃতির বারমহলে জমে, শুকিয়ে, পচে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দৈনন্দিন এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সীমানা অতিক্রম করে চিরন্তন ও সর্বজনীন আনন্দের ক্ষেত্রে উত্তরণ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এ রকম সিদ্ধি কদাচ ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাই সাহিত্যকে একবার বলেছেন 'দৈববাণী'; আবার অন্যত্র তাঁর Creative Unity বইখানির এক জায়গায় বলেছেন, 'to detach the individual idea from its enjoyment of everyday facts and to give its soaring wings the freedom of the universal, that is the function of poetry'। অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে মানুষকে লোভ জয় করবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপনিষৎ বলেছেন, মা গৃধঃ। যে অনুভূতি কেবল ব্যক্তিমাত্রিক,—ব্যক্তির ভোগেই তা জীর্ণ হয়ে যায়। নির্লিপ্তির প্রসাদে কবি-মানসের সংবেদন ঊর্ধ্বলোকে সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে। কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় নেমে শেলী তাই আমাদের সাবধান করে গেছেন—'Poetry and the principle of self are the God and Mammon of the world'।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। গোষ্ঠীবন্ধন তার স্বভাব। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে আদিকালের গোষ্ঠীকথা থেকেই সাহিত্যের জন্ম হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজাদের অক্ষশালার কথা প্রসিদ্ধ। এই সব অক্ষশালায় পাশাখেলাই যদিচ প্রধান আকর্ষণ ছিল, তবু বীণা, বাঁশী, শয্যা, সুরা এবং অন্যান্য বিবিধ আরামের উপকরণেও অক্ষশালাগুলি পূর্ণ থাকতো এবং প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি চমৎকার এক-একটি আড্ডা হিসেবে ব্যবহৃত হোতো। কৌটিল্যের সময়েও এরা যে লোপ পায়নি, সংস্কৃত সাহিত্যে তার বহু নজীর আছে। অতিথি-আগন্তুকবর্গকে খুশি রাখবার দায়িত্ব বহন করতে হোতো অক্ষশালার অধ্যক্ষকে। আমাদের কথকরাও এমনি দায়িত্ব বহন করে গেছেন। তাঁদের কথকতার গুণেই সে যুগে সর্বসাধারণের

কাছে সাহিত্য-পরিবেষণ সম্ভব হয়েছে। আমাদের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারতের শ্রোতা ছিলেন সপারিষদ রাজা জনমেজয়, বক্তা ছিলেন—বৈশম্পায়ন। হোমারও জনসমাজের জন্যেই তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ, শ্রোতা বা পাঠকের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে অবাধ ভাবে আত্মমগ্ন থাকা কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে কোনো যুগেই সম্ভব হয়নি। 'কাব্য দৈববাণী' একথা যাঁরা বলে গেছেন, 'কাব্য মানব সমাজের উদ্দিষ্ট বাণী',—এ কথাও তাঁদেরই। তবে, কবিদের সে 'দৈববাণী' শ্রবণ এবং গ্রহণ কববার জন্যে শ্রোতা বা গ্রহীতার কান-মন যে তৈরী রাখতে হয়, এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। স্বাদপরাঙ্‌মুখ পাঠকের জন্যে কাব্যপরিবেষণ সেই কারণেই নিষিদ্ধ হয়েছে।

তবে নিজেদেব বচনায় যথোচিত প্রসাদগুণ থাকা সত্ত্বেও যেসব দুর্ভাগা কবিকে তাঁদের সমসাময়িক পাঠকেব আদরে অল্পবিস্তর বঞ্চিত থাকতে হয়েছে, তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। হুইট্‌ম্যানের অপূর্ব কাব্য সমাদৃত হয়েছিলো তাঁর পরবর্তী পাঠককুলের আগ্রহে। বাংলা কবিতার ধারায় রবীন্দ্রনাথ যখন সার্থক রোমান্টিক্ ব্যাকুলতা সঞ্চার করেন, তখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিন্দকেরাই বেশি হাততালি পেয়েছিলেন। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের জন্যে আসর তৈরী রাখা সত্ত্বেও এ ব্যাপাব সম্ভব হয়েছিল!

ভাবের রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কবিরা সর্বসাধারণের নেতৃত্ব করে থাকেন। দেশের মনকে প্রাচীন অভ্যস্ত রাস্তার বাইরে টেনে আনবার যোগ্যতা আছে তাঁদেরই। তবে অনেকদিনের দৃঢ়মূল প্রবৃত্তি উৎপাটনের সময়ে ধুলোবালির কিছুকিছু ছিটেফোঁটা থেকেও গা-বাঁচানো চলে না। পূর্বোক্ত অনাদরের হেতু এই ব্যাপারেই নিহিত। যে-কাব্য নতুন যুগের অভ্যুত্থান সূচনা করে,—ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিকে, কৌশলে প্রাচীন আদর্শের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথেই তাকে বিচরণ করতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সব নতুনত্বেরই মূলে পাওয়া যায় সনাতন একই লক্ষ্য—সব কৌশলের পেছনে থাকে চিরন্তন একই দাবী—মানব-সমাজের কল্যাণ এবং মানব-চিত্তের বিনোদন!

সব দেশে এবং সব কালেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কিছু-না-কিছু নীতি-জ্ঞান প্রচার করেছে। জীবনের সার্থক অভিব্যক্তির পথনির্দেশ করাই এই নীতির লক্ষ্য। ম্যাথ্যু আর্নল্ড এই অর্থেই কাব্যকে বলেছেন 'মানবজীবনের ভাষ্য'। আনাতোল ফ্রাঁস বলতেন, সার্থক একখানি বই হোলো অদ্ভুত সেই যাদুসৃষ্টি—যেখান থেকে ঝরে পড়ে মানুষের মন পরিবর্তন করবার উপযোগী ভাবনা-বেদনার নির্ঝর! বঙ্কিমচন্দ্র আরো স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন, 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—

চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।'

মানবসভ্যতার প্রগতিতে আস্থা থাকলে সাহিত্যের অপমৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। কারণ, কাব্য মানবকল্যাণেরই চিরন্তন পথ নির্দেশনা। মেকলে বলেছিলেন বটে, সভ্যতার সমৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের উৎসও শুকিয়ে আসছে। কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় সে ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। এখন এই কথাই বরং স্বীকার্য যে, মানুষের সভ্যতার প্রসার মানুষেরই কাব্যে নব-নব প্রতিফলনে অভিব্যক্ত হবে। বিশ্বসাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক মোল্টন তো সেই কথাই বলেছেন,—বিশ্বসভ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং সার্থকতম অভিব্যক্তি ঘটেছে বিশ্বসাহিত্যে!

আমাদের মন সংসারের নানা সংস্কারের ক্রীতদাস। নানা মনিবের দেওয়া বিবিধ উর্দিতে তার সাজসজ্জা। সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনার উন্মত্ত আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে যুগে যুগে তাকে এগিয়ে চলতে হয়। তখন তাকে সংসারের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। স্থূল প্রয়োজনের, হাজার গোষ্ঠীর বিভাগে নিজেদের আমরা পৃথক্ করে রাখি, তারপর সাধারণের অলক্ষিতে ঈশান কোণে হঠাৎ যে কখন মেঘ জমে ওঠে! চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে,—'দুঃখের আঁধার রাত্রি' বারে বারে ভয় দেখিয়ে বিপর্যস্ত করে। দিন যায়, রাত্রি যায়,—মাস যায়, বর্ষ যায়,—কালের স্রোত চলে নিরন্তর! তারপর, সকলের অলক্ষিতেই আবার কখন প্রলয়ের মেঘ কেটে যায়। দিগন্তে নতুন সূর্য ওঠে। এই সব প্রাকৃতিক বৃহৎ ঘটনার পটভূমিকায় মানুষের অভ্যাস আর অচরণের বৈষম্য দূর হয়ে গিয়ে তার সনাতন, শাশ্বত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যে দেখা যায় তারই প্রতিফলন:

মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী
নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কি টানে
বাঁকিয়া যায়,
সে তার সহজ গতি,
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি।

এই 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন'ই হলো মানবচিত্তের স্বধর্ম। কাব্যে মানুষের এই অনাদি, অনন্ত সাধনার ইতিহাস সঞ্চিত আছে। কবিতার ধারা তাই চিরন্তনী! কাব্যবোধ মানুষের সহজবৃত্তি।

সৃষ্টি ও স্টাইল

সাহিত্যের সফলতার কথা ভাবতে-ভাবতে সৃষ্টি ব্যাপারটি যে পরম রহস্যময়, সেই ভাবনার মুখোমুখি হতে হয়। পল ভার্লেনের কথাপ্রসঙ্গে ভারি খুশি হয়ে একবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক'টি লাইন তুলে দেখিয়েছিলেন—

And I going
Born by blowing
Wind and grief
Flutter here and there
As on the air
The dying leaf.

এই উদ্ধৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, এর শেষের ক'টি ছত্রের ছন্দ আর সুর এত মধুর যে বারবার পড়লেও যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় না! অর্থাৎ কয়েকটি পদ এবং পদান্বয়ের মধ্যে এখানে এমন আশ্চর্য কিছু-একটা ঘটেছে যার অব্যবহিত ফল যে আনন্দ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শব্দে-সুরে, কিংবা রঙে-রেখায়, কিংবা অন্যান্য কৌশলে শিল্পীরা শিল্পানুরাগীর মনে এই যে বিস্ময়বোধ সঞ্চার করেন, এরই নাম আনন্দ। এই আনন্দ তাঁদের সৃষ্টিরই সাফল্য ঘোষণা করে থাকে।

আনন্দ আস্বাদনের বিষয়। যার বাসনা এবং রসনা আছে;—রুচিতে যার দৈন্য নেই এবং কল্পনায় যার ভাঁটা পড়েনি, তাকে এ-কথা বলে দিতে হয় না যে, সৃষ্টি এক অনির্বচনীয় ব্যাপার! তবু, সব জেনে-শুনেও বার বার সেই এক জিজ্ঞাসাতেই মন বার বার ফিরে যায়। সৃষ্টির মধ্য দিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। বাংলায় এই সূত্রে 'সৃষ্টিপ্রভা' কথাটা ব্যবহার করলে বোধ হয় ইংরেজী 'স্টাইল'-এর সামান্যার্থের কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনাশাস্ত্রে আজকাল 'স্টাইল' কথাটি নিত্যই ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতের 'রীতি' শব্দটিও বাংলায় style-এর প্রতিশব্দ হিসেবে হামেশাই চলে থাকে। সংস্কৃতের 'রীতি' কিন্তু সচরাচর পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি মাত্র বুঝিয়ে থাকে। গৌড়ী ভঙ্গি একরকম, বৈদর্ভী অন্যরকম। ভাষার বিশেষ ভঙ্গিরই নামান্তর হোলো 'রীতি'। অপর পক্ষে, ইংরেজী style কথাটি কিন্তু ভঙ্গির গভীর উৎসস্থলের আভাস দিয়ে থাকে। সেও ভঙ্গিমা, সন্দেহ নেই,—কিন্তু কেবলমাত্র পদরচনার ভঙ্গি বললেই তার সবটা বলা হয় না; ওয়াল্টার পেটার বলেছেন যে, স্টাইলের মধ্য দিয়ে কবির বিশেষ বোধপ্রকৃতিই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 'বোধপ্রকৃতি' কথাটি এখানে

খুবই সংক্ষেপে বলে নেওয়া গেল। সতর্ক বিদ্বজ্জনে এ-শব্দের গভীরতর মর্মার্থ অনুসন্ধান করবেন। মনস্তত্ত্ববিদ্ দেখবেন ব্যক্তিবিশেষের বোধের উৎস, উপাদান, সারল্য জটিলতা ইত্যাদি নানান্ প্রসঙ্গ। বিজ্ঞানীর নজরে কতো-না বৈচিত্র্যই ধরা পড়ে! কবিরাও তাঁদের গভীর ইশারার মধ্যে মাঝে-মাঝে এই ধরনের বৈচিত্র্যের আভাস দিয়ে গেছেন। হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে, একেবারে অন্য কোনো তর্ক বা জিজ্ঞাসা, অনুভূতি বা বিচিন্তা পরিবেষণ করতে গিয়েও কবিদের মধ্যে কারও-কারও কোনে-কোনো রচনায় এমন ইশারা দেখা দিয়েছে। 'পূরবীর' 'স্বপ্ন' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

তাঁর এই 'মন-ভরানো পাওয়া' কথাটা তাই এই সূত্রে বিশেষভাবে মনে আসে। কবিতাটির শেষ দু' লাইনে তিনি বলেছিলেন—

নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে—অসীম পথের পথ্য তাই ॥

কবির সৃষ্টি-সাফল্যের মূলে নিশ্চয়ই এই 'প্রাণ দিয়ে' রচনার গভীর এক সত্যভিত্তি আছে। লেখার 'স্টাইল'-এর কথা ভাবতে গেলে তাই লেখকের 'অন্তরের' কথা সহজেই মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ দিকের একটি বিখ্যাত কবিতায় বাংলার ভবিষ্যৎকালের লেখকসমাজকে শ্রদ্ধা এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, মানুষকে সত্যি করে জানতে হলে সমবেদনা অনুভব করা দরকার। 'অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়'; এবং 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।' অর্থাৎ চেষ্টা করলে অকৃত্রিম অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিটা কিছু পরিমাণে নকল করা যে দুঃসাধ্য নয়, সেকথা তাঁর অগোচর ছিল না। কিন্তু লেখকদের তিনি সেরকম নকলনবীশ হতে নিষেধ করে গেছেন। সমাজের বিশেষ কালের বিশেষ সুখ-দুঃখের কথাপ্রসঙ্গেই তাঁর এই বিখ্যাত কবিতাটির জন্ম হয়েছিল বটে, কিন্তু সকল কালের সকল দেশের সকল সাহিত্যসৃষ্টির সর্বস্বীকার্য সামান্য আদর্শ-ই এতে সূচিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। সৃষ্টি যে নির্মিতি নয়,

অনুকৃতি নয়, ছলনা নয়, অসার ভঙ্গিমাত্র নয়,—সেকথা তিনি খুবই জোর দিয়ে বলে গেছেন; অন্যান্য বহু রচনাতে তো বটেই, তাছাড়া তাঁর এই শেষদিকের প্রসিদ্ধ কবিতাটির মধ্যেও তাঁর সে বিশ্বাস অনুক্ত থাকেনি।

এসব পূর্ব-অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সৃষ্টি যে কী আশ্চর্য রহস্য, সে বিষয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। কাকে বলে 'সৃষ্টি'? 'স্টাইল'কে যদি সৃষ্টিপ্রভা বলতে হয়, তাহলে আগে জানতে হবে সৃষ্টির স্বরূপ কী, সৃষ্টির আসল বিশেষত্ব কী রকম! এ বিষয়ে খুব সোজাসুজি প্রথম যে প্রশ্নটি মনে দেখা দেয় সেটি এই যে—সৃষ্টিকর্ম কি ব্যাখ্যার অধিগম্য?

কেবল বাংলা সাহিত্যের এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে-প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম মনে পড়া স্বাভাবিক, তিনি হলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র! ভবভূতির উত্তরচরিতের সমালোচনাসূত্রে বঙ্কিম নানা কথার মধ্যে বলেছিলেন—'কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই।' পরের অনুচ্ছেদে কথাটি আর একটু বিশদ করে তিনি জানিয়েছিলেন যে, 'কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্ট না হইলে কোন প্রশংসা নাই।'

কিন্তু এ-জবাব দিয়ে তিনি নিজে যে সম্পূর্ণ খুশি হতে পারেন নি, তার নজীব আছে তাঁর ঐ প্রবন্ধের পরের অংশে। আবো ভাবতে হয়েছিল তাঁকে। এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছিলেন—'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধি-জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বাবা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।'

জগতের চিত্তশুদ্ধি ঘটানো চাই বইকি। সমাজের মঙ্গলসাধন করাই যে সাহিত্যের অন্যতম কাজ সে বিষয়ে তাঁর মতানৈক্য ছিল না। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যকে তিনি বলেছিলেন সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'সৌন্দর্যেব চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি'ই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতঃপর ঐ প্রবন্ধেরই আরো পরের অংশে তিনি বলেছিলেন—'যাহা সত্যের প্রতিকৃতিমাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বাভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।...কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন...।' উত্তরচরিতের মধ্যে ভবভূতিকে তিনি এই অর্থে খুব বড়ো স্রষ্টা বলে মনে করতে পারেন নি। তাঁর নিজের কথাগুলিই এইসূত্রে তুলে দেওয়া সমীচীন; তিনি বলেছিলেন, 'উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই।'

'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি'। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রিয় প্রসঙ্গটি একটিমাত্র প্রবন্ধের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় নি। 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' নামক গ্রন্থপরিচিতিমূলক ভিন্ন একটি প্রবন্ধে তিনি শিল্পসৃষ্টির মূলবর্তী 'সৌন্দর্যতৃষ্ণা'র কথা তুলেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, 'সৌন্দর্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন'; 'দ্বিতীয়তঃ তীব্রতায় এই সুখ সর্বাপেক্ষা গুরুতর'; 'তৃতীয়তঃ অন্যান্য সুখ, পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্যজনিত সুখ চিরনূতন এবং চিরপ্রীতিকর।' বাঙালীর সৌন্দর্যবোধের অভাব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেই তিনি কয়েকটি কটু সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ'-ই যে বহুপরিমাণে এই সৌন্দর্যনিস্পৃহার কারণ, সেকথা স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি হয় নি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজের সমকালীন শিক্ষিত বাঙালী-মনের এই বিশেষ স্বভাবদোষও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'সৌন্দর্যে তাহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই।' প্রবন্ধের শেষ মন্তব্যে বলা হয়েছিল—'সৌন্দর্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্যরসাস্বাদনসুখ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই।'

সৃষ্টি-ব্যাপারের মূলে সৌন্দর্যবোধ একটি আবশ্যিক শর্তরূপে ধর্তব্য; তাই সৃষ্টি-রহস্যের আলোচনা উপলক্ষে বঙ্কিম-নির্দেশিত বাঙালীর স্বভাব-দোষের এই প্রাসঙ্গিক উল্লেখটুকু স্বতঃই মনে এলো। অতঃপর আসল কথার দিকে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি নিয়মহীন নয়। 'কবির সৃষ্টি তাঁহাব স্বেচ্ছাধীন'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ থেকে আর-একটি মন্তব্যও মনে রাখা দরকার। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন—'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।...সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই...।...সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।' অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় হলেও সাহিত্যসৃষ্টির কোনো-না-কোনো আইন আছে। দেশ-কাল মর্জির বিশ্লেষণ করতে সৃজনতত্ত্বের অনাবিষ্কৃত বিধিবৈচিত্র্যের ধারণা পাওয়া যেতে পারে। সৃষ্টি এক অপরিসীম রহস্য বটে, কিন্তু সে রহস্য সত্যিই চূড়ান্তভাবে দুর্ভেদ্য মনে করতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী মনের সায় ছিল না।

তবু শেষ পর্যন্ত তিনি সৃষ্টির রহস্যভেদ করতে পারেন নি,—হয় তাঁর রুচি ছিলনা, ইচ্ছে ছিলনা,—নয়তো তিনি সময় করে উঠতে পারেন নি। তবে কবিপ্রতিভা যে বিপুল মনস্বিতার সঙ্গে জড়িত, সেকথা তিনি স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। বড়ো দরের

সাহিত্যের মধ্যে যে বিশেষ সৃষ্টিগুণ দেখা যায়, তা লক্ষ্য করে উত্তরচরিতের সমালোচনার মধ্যেই তিনি জানিয়েছিলেন—

'রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্তা এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।'

এই ধরনের কথা বহুবার বলা হয়েছে। বার বার বলার ফলে এ-উক্তির অভিপ্রেত স্বাদ ফুরিয়ে যায়। 'সত্য', 'ধর্ম', 'মুক্তি', 'অমৃত' ইত্যাদি উপলব্ধিবাচক শব্দ আজ যেমন লোকসমাজে কতকটা ধ্বনিসর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে—স্থূল সংসারের প্রগল্‌ভ রসনায় সেগুলি যেমন হাটে-ঘাটে সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে, কাব্যসৃষ্টির গভীর প্রজ্ঞাসত্যও তেমনি এযুগে অবহেলায় বিস্মৃত। অবিশ্যি সকলেই যে ভুলে গেছেন, তা নয়। কিন্তু বিস্মৃতির প্রতাপ আর যে-মহলেই দেখা দিক, কবিরা, স্রষ্টারা তাঁদের নিজেদের এই মহিমা এবং অধিকার যদি নিজেরাও ভুলে থাকেন, তা হলে অবস্থা খুবই শোচনীয় বলতে হবে।

জগতে যেসব ক্ষেত্রে সহজেই বেশি লোকের ভিড় জমে, সেইসব জনসমাবেশে শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। আদর্শ যেখানে বহুজনের বিচিত্র কামনা-বাসনার বৈচিত্র্যের তাড়নায় নিত্যই পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা, সেখানে আদর্শের বিশুদ্ধ রূপটি প্রায়ই লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরতে হয়। সাহিত্যের পথে বহু সাধকের নিরন্তর সমাবেশের কথা কে না জানেন? ব্যক্তিগত রুচির হস্তক্ষেপে, সামর্থ্যের সংকীর্ণতায়, বোধের স্থূলতাতে এবং বিশ্বাসের ভিন্নমুখিতায় পূর্বোক্ত মনস্বিতা ও প্রজ্ঞাবত্তার পরম দায়িত্বের কথা আমরা বার বার ভুলে যাই। ফলে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়, মনস্বিতার পরিবর্তে অহমিকার বাড়াবাড়ি ঘটে থাকে। তখন সাধক-সমাজের সামনে বিস্মৃত আদর্শের চেহারাটা নতুন করে তুলে ধরতে হয়। সৃষ্টিরহস্য ও সৌন্দর্যসাধনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ আলোচনার অনতিকাল পরেই তাই রবীন্দ্রনাথকে আবার পুরোনো কথা নতুন করে বলতে হয়েছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর নানান্ আলোচনার মধ্যে সে প্রয়াস অনেকবার দেখা গেছে। তারপর পরিণত বয়সে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলাভাষা পরিচয়' বইখানির মধ্যে তিনি খুবই স্পষ্টভাবে জানালেন—'সৃষ্টি বলতে বোঝায় সেই রচনা যার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ। মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে।...ভাষায় মানুষের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি সাহিত্য। এই সৃষ্টিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছে, তাকে যখন চরম বলেই মেনে নিই, তখন সে হয় আমার কাছে তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ বটগাছ।'

বিভূতিভূষণের লেখার মধ্যে পল ভার্লেনের রচনাংশের যে অনুবাদটুকু স্মরণ করা গেছে, তাতে তেমনি প্রত্যক্ষতা বিদ্যমান।

And I going
Born by blowing
Wind and grief
Flutter here and there
As on the air
The dying leaf.

এই শব্দ-স্বরের সমাবেশের মধ্য দিয়ে বাতাসে উড়ে-যাওয়া শুকনো পাতাটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বুকের মধ্যে কেমন যেন দীর্ঘশ্বাস দেখা দেয়! মানুষের জীবনের সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে, মানুষের বিপুল তুচ্ছতার সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির গাছ, পাতা, হাওয়ার যে সাদৃশ্যচিন্তা এখানে নিহিত রয়েছে, তার মূলে আছে লেখকের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, প্রজ্ঞা! কিন্তু সে সবই নিহিত, মসৃণ, স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের কথা একটু বদলে নিয়ে বলা যেতে পারে—দুঃখের বাতাসে বিক্ষিপ্ত মনুষ্যজীবনই এখানে, এই রচনার প্রসাদে, আমাদের প্রত্যক্ষ বোধের সামগ্রী হয়ে উঠেছে,—যেমন সত্য ঐ বায়ু-তাড়িত শুষ্কপত্র! এই বোধসত্য আছে বলেই এ রচনা সৃষ্টি হয়ে উঠেছে! এবং এর সৃষ্টিপ্রভা-ই এর 'স্টাইল'! স্টাইল তো শুধু বাক্‌ভঙ্গি নয়, শুধু কথা সাজাবার কারসাজি নয়,—স্টাইল আভরণ নয়, অলঙ্কার নয়, বহিরঙ্গপ্রসাধন নয়। স্টাইল-কে যাঁরা খুব একটা সজ্ঞান সাধনার ফুল বা ফল মনে করেন, তাঁদের পক্ষে আত্মসংশোধনের দায়িত্ব মনে রাখা দরকার! বাংলা গদ্যে বারোয়ারি রম্য-রীতির প্রাচুর্য এবং বাংলা কবিতায় তির্যক ভঙ্গির বাড়াবাড়ি দেখে পুরোনো কথা পুনরায় ভাবতে হোলো। সাহিত্যস্রষ্টার প্রজ্ঞা ও মনস্বিতার তারতম্যের সঙ্গে স্টাইলের বিচিত্রতা ও শ্রেণীভেদের প্রসঙ্গ অবশ্যই জড়িত। কিন্তু সে আলোচনা অল্প কথায় ফুরোবে না।

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ ও পরিভাষা

ধারাবর্ষণের মধ্যে রেলগাড়ির চাকায় একটি ছাগলের অপমৃত্যু ঘটতে দেখেছিলাম।

আমরা ট্রেইনে উঠেছিলাম চারজন—'চার-ইয়ার' নয়,—পরস্পরের অপরিচিত চারজন যাত্রী। কামরায় পা দেবার আগেই চোখে পড়েছিলো রক্তাক্ত দৃশ্য—ভিজে পাথরের ওপর ছিন্নমুণ্ড ছাগদেহটি তখনো থেকে-থেকে কেঁপে উঠছিলো।

গাড়ি ছাড়বার পরে সেই একটিমাত্র দৃশ্যের চার রকম আবেদন মর্মগত হোলো।

স্থূলোদর, বৃষস্কন্ধ সহযাত্রীটি বললেন: বর্ষার দিনে খিচুড়ির সঙ্গে জমতো ভালো, মশায়!—বলে তিনি তালু এবং জিভের সংঘর্ষে একটি শব্দ করলেন। পরম অতৃপ্তি-তাড়িত একটি অব্যয়!

অবগুন্ঠিতা যে-মহিলাটি তাঁর অভিভাবকের সঙ্গে নবদ্বীপ দর্শনে বেরিয়েছিলেন, তাঁর অবগুণ্ঠন কুণ্ঠিত হোলো। দক্ষিণ করপদ্মে মুখাবরণ সরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর রোষাবিষ্ট বাম দৃষ্টির তিরস্কার নিক্ষেপ করলেন বক্তার অভিমুখে। তাঁর অভিভাবক প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি গলাবন্ধ কোটের অন্তরালে নিজের কণ্ঠলগ্ন তুলসীর মালাটি সমাধিস্থ করে সঙ্গিনীকে বললেন, 'ছোকনের ছাগল—এই নিয়ে পর-পর তিনটে হোলো। তবু হুঁশ নেই। রেল-লাইনে চরতে পাঠানো কেন রে বাপু! ছোঃ!'

আরোহীদের মধ্যে একজোড়া মেডিক্যাল ছাত্র ছিলেন। দৃশ্যটি তাঁদের চোখেও পৌঁছেছিল। তাঁদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বললেন: 'cervical vertebrae-র চাকলা কি-রকম দেখলে বলো?'

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মুচকে হাসলেন।

এই চারটি মন্তব্যের আলম্বন ছিলো একই ঘটনা। কিন্তু চারজনের মনে এই একটি দৃশ্যের চার রকম উদ্দীপনা ঘটেছিলো। যিনি খিচুড়ির উল্লেখ করে অব্যয়-ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন, এই দৃশ্যের অব্যবহিত উদ্দীপন ছাগমাংসের স্বাদের অনুষঙ্গটিই ছিল তাঁর মনের মুখ্য ভাব;—অপমৃত্যুর সাক্ষী থাকার ফলে মহিলাটির মনে জেগেছিল অসহায়ের জন্যে সহানুভূতি; প্রথম ব্যক্তির ভোজ্যরসাগ্রহের আতিশয্যে তিনি সত্যিই বড়ো আহত হয়েছিলেন। তাঁর অভিভাবক ভদ্রলোক ছিলেন এই দৃশ্যের তৃতীয় দর্শক; তাঁর মনেও সহানুভূতি জেগেছিলো, কিন্তু মৃতের জন্যে ততোটা নয়, যতোটা মৃতের জীবিতাবস্থার মালিকের জন্যে। চতুর্থ সাক্ষী চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রটি দৃষ্ট ঘটনার সঙ্গে করুণ রসের অচ্ছেদ্য যোগ উপেক্ষা করে তাঁর নবার্জিত বিদ্যার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হিসেবেই সেই দ্বিখণ্ডিত ছাগদেহের সংবেদনকে আপন বুদ্ধিসাৎ করেছিলেন।

একই বস্তুর এই বিচিত্র রূপ,—একই ঘটনার বিভিন্ন সম্ভাবনা,—একই সংবেদকের অশেষ সংবেদনা,—যতো মত, ততো পথ,—যতো মন, ততো ধ্যান,—জগতে এ ব্যাপার নিত্যই চোখে পড়ছে! বিজ্ঞান দর্শন ব্যাপার থেকে দ্রষ্টার 'অহং'-কে বাদ দেবার দাবি জানায়। মরমীয়া অধ্যাত্মবাদীরা দর্শনীয়কে অহং-এর প্রসারণ ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতেই চান না। ভাববাদীরা বলেন আদিতে ভাব,—জড়বাদীরা বলেন, 'জড়োঽহং',—কোনো পক্ষ বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—অন্যপক্ষ বলেন, দুই-ই

সত্য,—বিশিষ্টাদ্বৈতপন্থী বলেন অচিৎ-ও অজ, চিৎ-ও শাশ্বত—দুই-ই অনাদি,—সমস্ত পরিবর্তনশীল বস্তুর উদ্ভাবন ঘটছে মৌল ঐশ্বরিক চেষ্টায়,—'ত্রিবৃত্তিকারণে'ই ঘটছে সৃষ্টি। এ সবই হোলো মননশীল মানুষের ভাবনা। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এইরকম ভাবনার বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। দেখা যায় দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা। তা থেকে ঘটে প্রযুক্তির বিভিন্নতা। Classicism, Romanticism, Idealism, Realism, Naturalism, Humanism,—Surrealism, Dadaism, Futurism, Cubism, Imagism—ইত্যাদি বিচিত্র-ism-এর মূলে আছে সর্বস্বীকার্য ঐ একই সত্য,—অর্থাৎ, দৃষ্টিকোণের এবং আঙ্গিক বা প্রযুক্তির বিভেদ। বাংলায় সাহিত্যিক পরিভাষায় এই নামগুলি একে একে চালু হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি নামের বঙ্গানুবাদের ফলে শব্দার্থের মূল ধারণা কোথাও কোথাও ঝাপসা হয়ে পড়েছে। ইংরেজী নামে এসব আমরা যতো সহজে বুঝি, বাংলা নামে ততো অবলীলায় নয়। যেমন, Idealism-এর প্রতিশব্দ 'ভাববাদ' এবং 'আদর্শবাদ' দুই-ই ;—দর্শনের ক্ষেত্রে প্রথমটি চলে ; সাহিত্যের আলোচনায় দ্বিতীয়টি প্রশস্ত। Classicism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'তন্ময়পন্থা' বা 'নৈরাত্মপন্থা' চলতে পারে কি ?

Naturalism-এর বাংলায় 'প্রকৃতিবাদ' অচল,—তবে 'প্রাকৃতবাদ' চলবে কি ? সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের দেওয়া 'যথাস্থিতবাদ' নামটি Naturalism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আরো ভালো মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'প্রকৃতিপন্থা' ('কবিতা' : আশ্বিন, ১৩৫৫)। সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 'স্বভাবোক্তি'। Supernaturalism-এর জন্যে তো 'অতিপ্রাকৃতবাদ' চলেছে। Humanism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'মানবিকতা'র ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু Humanitarianism আর Humanism যখন এক বস্তু নয়, তখন বাংলায় নবাগত 'মানবিকতা' শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন দুই অর্থে ব্যবহার করা অসমীচীন। শেষ অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মনুষ্যধর্ম'। ঐ সঙ্গে মনে পড়ে Anthropomorphism—যার লাগসই প্রতিশব্দ হোলো 'নরত্বারোপপ্রবণতা'। নলিনীকান্ত গুপ্ত Surrealism-এর বাংলা করেছিলেন 'পরাবাস্তবতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলে গেছেন, 'অতিবাস্তবতা'। Symbolism-এর প্রতিশব্দ হিসেবে চলছে 'প্রতীকবাদ'। ঐ অর্থে 'বিগ্রহ' শব্দটিকে প্রয়োজন মতো বিশেষণে রূপান্তরিত করে, তা'থেকে পুনরায় বিশেষ্যে রূপান্তরিত 'বিগ্রহাত্মকতা' কথাটিরও রেওয়াজ আছে। Futurism-এর অনুবাদে কি 'ভবিষ্যবাদ' চলবে ? বাংলা 'বাস্তবতা'-র মারফত যথেষ্ট মাত্রায় Realism-শব্দটির অর্থবোধ উদ্রিক্ত হতে পারে কি ? আমাদের সনাতন দেশী সাহিত্যানুভূতিতে Romanticism এমনই এক অচ্ছেদ্য লক্ষণ ছিলো যে, ঐ ধারণাটি বোঝাবার জন্যে যোগ্য কোনো

বাংলা শব্দ এখনো আমাদের মাথায় আসেনি—ও-কথাটার অনুবাদও সম্ভব হয়নি,—সরাসরি সশরীরে ওকে বাংলা ভাষার নিজস্ব এলাকায় প্রবেশ করতে দিতে হয়েছে। আত্ম-পরের ভেদ-বুদ্ধির চৌকিদারকে সাধ্যমতন ঘুষ দিয়ে কথাটিকে একটু পিটে নিয়ে আমরা বানিয়েছি, 'রোম্যান্টিকতা'। ঐ আদর্শে নির্ভর করে থাকলে Dadaism কি হবে 'ডাডাইষ্টিকতা'? সুখের বিষয়, পরিভাষার দেশাত্মবুদ্ধি যাঁদের অতি বেশি সজাগ, তাঁরাও এখনো ism-এর বাংলায় 'ইষ্টিকতা' চালু করবার প্রস্তাব পেশ করেন নি!

ছোটো বড়ো নানা ism-এর উল্লেখে-ব্যাখ্যানে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্র ক্রমশঃ কণ্টকিত হয়ে উঠছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে এ গুলির বিশ্লেষণ না করে,—সামগ্রিক ভাবে, কোনো মূল উপলব্ধির শাখা-প্রশাখা হিসেবে এগুলির ক্রমবিস্তারের ব্যাখ্যান সম্ভব কি না, বিচার্য। সেই লক্ষ্য মনে রেখে কাজে নামলে দেখা যায়, এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই-যে এক-একটি দৃষ্টিকোণ, তা নয়। Classicism, Idealism, Romanticism, Realism—এই চারটিকে যদি বলা হয় পৃথক পৃথক চারটি দৃষ্টিকোণ, তাহলে Symbolism, Imagism তো আর 'দৃষ্টিকোণ' নামে অভিহিত হতে পারে না। প্রথমগুলির সাহায্যে প্রধানতঃ দ্রষ্টার দৃষ্টি-প্রকৃতিই সূচিত হয়; কিন্তু শেষের দুটিতে বোঝায় সেই দৃষ্টির প্রভাবে নির্বাচিত শিল্প-ক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক বা প্রযুক্তি। সুধীন্দ্রনাথ Image-এর বাংলায় 'চিত্রকল্প' কথাটি চালু করেছিলেন; তা থেকে, প্রসঙ্গ অনুসারে Imagism হতে পারে 'চিত্রকল্পনিষ্ঠা', 'চিত্রকল্পিতা'। কিন্তু সে যাই হোক, 'চিত্রকল্প' প্রয়োগের তাগিদ বশতঃ কোনো কোনো লেখকের রচনায় 'চিত্রকল্পনিষ্ঠা' দেখা যেতে পারে বটে, কিন্তু 'চিত্রকল্প' প্রয়োগের তাগিদটা আসে যে দৃষ্টিকোণ থেকে, সেটি একদিকে যেমন 'রিয়ালিষ্টিক' হতে পারে,—অন্যদিকে তেমনি 'রোম্যান্টিক' হতেও তার পক্ষে কোনো বাধা নেই। এমনি আর একটি দৃষ্টান্ত হোলো Lyricism—বুদ্ধদেব বসু যার প্রতিশব্দ দিয়েছেন, 'গীতলতা'। 'গীতলতা' তো দৃষ্টিকোণ নয়; গীতলতা হোলো সাহিত্যিকের মননগত একটি আচরণ। অবিশ্যি আচরণেই দৃষ্টিকোণের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টির ফলেও সমশ্রেণীর প্রকরণ বা আচরণও যে ঘটতে পারে, তার প্রমাণ ক্ল্যাসিক দৃষ্টির গীতিকবিতা এবং রোম্যান্টিক দৃষ্টির গীতিকবিতা। 'গীতলতা' নামের মাধ্যমে কবির যে আচরণটি বোঝা যায়,—রোম্যান্টিক মন্ময় দৃষ্টিকোণও তার উৎস হতে পারে—আবার, তন্ময় ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টির ফলেও তা ঘটতে পারে। এবং এ থেকে আবার এসে পড়ে পরিভাষার প্রসঙ্গ। Classicism-এর ধারণা যদি 'তন্ময়ভঙ্গি' বা 'নৈরাত্মপন্থা' বা এইরকম আর কোনো শব্দের দ্বারা সুব্যক্ত বলে মনে হয়,—তাহলে

Romanticism-এর অনুবাদে 'আত্মমুখিতা' কি অসংগত হবে? রাজশেখর বসু অবিশ্যি Subjective-অর্থে 'আত্মমুখ' কথাটির নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু সেজন্যে তো আরো কয়েকটি শব্দ আছে—'আত্মলীন' এবং 'মন্ময়'—আজকাল দুটিই তো বেশ চালু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে পড়া স্বাভাবিক যে, বুদ্ধদেব বসু Romantic-এর প্রতিশব্দ দিয়েছেন—'আত্মপন্থী'।

অতএব সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় নিত্যব্যবহৃত ইজ্‌ম্‌-বৈচিত্র্যের শ্রেণী-বিভাগের প্রচেষ্টায় নেমে প্রধানতঃ দেখা গেলো দুটি শাখা। কতকগুলি 'ইজ্‌ম্‌' স্রষ্টার দৃষ্টিকোণেরই পরিচায়ক; অন্যগুলি তাঁর কলাকৌশলের সূচক,—তাঁর আঙ্গিকের অভিধা। এ ছাড়া এমন কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ আছে, যাদের মূলে কোনোরকম সৃজনী প্রেরণার প্রাধান্য নেই। সাহিত্যক্ষেত্রের নানা আচরণের সূচক সেগুলি। যেমন Plagiarism—কুম্ভিলকতা, Intellectualism—মনীষিকতা, Puritanism—অতি-নৈতিকতা, Extremism—আত্যন্তিকতা, Journalism—সাংবাদিকতা, Mannerism—মুদ্রাদোষ। আরো দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি আরো সহজবোধ্য হবে। কোনো একজন লেখকের মনের স্বভাবেই যদি আবেগের বাড়াবাড়ি থাকে, তাহলে, তাঁর লেখাতেও দেখা দেবে আবেগাতিরেক। ইংরেজী পরিভাষায় তারই নাম Emotionalism। তেমনি নীতি-প্রীতির আতিশয্যের ফলে অতিনৈতিকতা (Puritanism) ঘটতে পারে। মনের নানাচারিত্বের ফলে কোনো কোনো লেখা discursive হতে পারে,—আবার, লেখকের ভাবাতিরেকপ্রবণতার ফলে কোনো কোনো লেখায় ভাবালুতাও (Sentimentality) দেখা দিতে পারে!

Classicism, Romanticism, Idealism, Realism,—এগুলিকে কেবলমাত্র লেখকদের মেজাজ বা মর্জি (attitude) বলা সংগত নয়। মর্জি তো বটেই,—কিন্তু যার-তার মর্জি নয়, স্রষ্টার মর্জি। Puritanism-ও মর্জি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সৃজনী প্রেরণার সাহচর্য অসম্ভব না হলেও কষ্টকল্প্য। শিল্পের ক্ষেত্রে Cubism, Futurism, Surrealism প্রভৃতিকে Realism-এরই প্রসারণ বলা যেতে পারে। Moralism হয়তো Idealism-এর বংশধর! Idealism-এর সঙ্গে Classicism-এর আত্মীয়তা আছে, কিন্তু দুটির মধ্যে আত্মীয়তার ফল্গুধারা এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে গিয়ে দুটিকে কতকটা স্বতন্ত্র স্বরাজ্য দিয়েছে। তথাপি, ভেদজ্ঞান যাঁদের তীক্ষ্ণ, তাঁরা Idealism-কেও একটি পৃথক দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্য দিতে রাজি হবেন না। Idealism অবশ্য বস্তুনিষ্ঠার বিরোধী, কিন্তু রোম্যান্টিক এবং ক্ল্যাসিক্যাল—দুই পৃথক দৃষ্টিকোণেরই সহগামী। ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে লেখা মহাকাব্যেও Idealism প্রশস্ত, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও তা' স্পষ্ট, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের রোম্যান্সেও আদর্শবাদ অনুপস্থিত নয়। কিন্তু

Classical, Romantic এবং Realistic—এই তিনটি দৃষ্টিকোণের মধ্যে সেরকম গা-ঘেঁষাঘেঁষি নেই। অন্তহীন বৈসাদৃশ্যের মহাসাগরে এরা ভাসছে তিন পৃথক মহাদ্বীপের সীমাস্বাতন্ত্র্য নিয়ে!

এ জগতে দিন-রাত্রির বিভেদের মধ্যেও একটা মিলের সম্ভাবনা আছে। আমাদের কবি গেয়েছেন, 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে'। কিন্তু এরা যে পারাবারে ভাসমান, সে পারাবারে এই ত্রিবেণীসংগম অসম্ভব,—নৈরাত্মপন্থার সঙ্গে আত্মমুখিতার এবং আত্মমুখিতার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার বিভেদ সাহিত্যলোকের মানচিত্রে স্পষ্টরেখায় চিহ্নিত। তবে কি এরা চিরবিচ্ছিন্ন? সৃষ্টিতে চিরবিচ্ছেদের যন্ত্রণা অন্য সবাই পান,—পান না কেবল জ্ঞানী। তিনি জানেন, সকল রূপের উৎস হলেন 'অরূপ',—সকল উপাধির আশ্রয় হলেন 'নিরুপাধি',—সকল ব্যক্তের মূলে আছেন 'অব্যক্ত' রসস্বরূপ—একমেবাদ্বিতীয়ম্, শান্তম্, অনন্তম্! তিনি আনন্দস্বরূপ। সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্যাল, রোম্যান্টিক, রিয়ালিষ্টিক ইত্যাদি সকল পথের শেষে সেই তিনিই আছেন যিনি অনন্ত রসস্বরূপ!

কিন্তু আপাতত রসোপলব্ধির কথা স্থগিত থাক। বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষার তিনটি শাখা বিভাগের প্রস্তাব পেশ করে এই রচনার ছেদ টানা যাক। প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে Classicism, Romanticism, Realism,—এই তিনটি মৌল দৃষ্টিকোণ,—এবং এদেরই উৎসলীন কিংবা প্রসারণলব্ধ Idealism, Moralism, Mysticism প্রভৃতি অন্যান্য ধারণা,—এবং সেই সঙ্গে Platonism, Materialism, Socialism, ইত্যাদি সাহিত্যস্রষ্টার দৃষ্টিনিয়ামক অন্যান্য শব্দগুলি; দ্বিতীয় বিভাগে প্রকার-বাচক শব্দমালা যেমন, Tragedy, Short-Story ইত্যাদি, এবং সাহিত্যক্ষেত্রের আচরণ-বাচক অন্যান্য শব্দ যেমন Intellectualism, Lyricism প্রভৃতি; তৃতীয় বিভাগে সাহিত্য-পর্যালোচনায় প্রয়োজনীয় অন্যেতর যাবতীয় শব্দ,—যেমন, craft, scene, soliloquy, artifice, cliche ইত্যাদি একত্র তালিকাভুক্ত হোলে বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনার রাস্তা অনেকটা সুগম হবে। অবিশ্যি, তালিকা তৈরির সময়ে এই ত্রিশাখা-বিভাগের চুলচেরা বিচার অনাবশ্যক। আগে অভিধান গড়ে উঠুক,—তারপর শ্রেণীবিভাগ সহজ হবে।

সাহিত্যে সংকেতভাষণ

সাঁওতাল পরগণার রুক্ষ রাঙা মাটির বন্ধুর রাস্তা দিয়ে হেঁটে, নির্জন টিলার ওপর উঠে বসতেই বেলগাছের কাণ্ডটার দিকে চোখ পড়লো। দেখা গেল সারি সারি খোদাই-করা প্রায় আধ-ডজন বাঙালী নাম। এই শূন্য মন্দিরহীন, দেবতাহীন, শস্যহীন টিলার

ওপরেও যাত্রীসমাগম ঘটে থাকে! যাত্রীরা শুধু দেহাতি বেহারী কিংবা সাঁওতালী নয়,—অকৃত্রিম বাঙালী শিল্পীর ভোঁতা ছুরির স্বাদেও পাহাড়ী বেলগাছটা বঞ্চিত হয়নি দেখা গেল।

বছরে বছরে গাছের ছাল বদল হতে হতে আঁচড়গুলো ক্রমশঃ মসৃণ হয়ে উঠবে। হয়তো, কাঠঠোকরা আর কাঠবিড়ালীর ঠোঁটে-দাঁতে-নখে বিপর্যস্ত হয়েই সেগুলো পরিণত হবে কাঠের গুঁড়োতে,—ঝরে পড়বে কালো পাথরের বুকে,—যেখানে দুরন্ত শীতের হাওয়া নিত্যই ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে! প্রকৃতি,—প্রবীণা, লীলাময়ী প্রকৃতিই ওদের শেষ কৃত্যের ভার নেবেন।

মানুষের লিপির ইতিহাস অর্থহীন কতকগুলি রেখা রচনার প্রয়াসেই শুরু হয়েছিল। পাহাড়ের গায়ে আঁকা সেই সব আদিম রেখা বিচারের ভার পড়েছে একালের উত্তরাধিকারী মানব-সভ্যতার ওপর। বাঁ দিক থেকে ডাইনে,—ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওপর থেকে নিচুতে,—বৃত্তাকারে, বর্তুলাকারে যুগে যুগে মানুষের আত্ম-প্রকাশের ব্যাকুলতা অসীম যন্ত্রণায় কী অনিবার্য চাঞ্চল্যে কতো-যে বিচিত্র রেখাপাত করেছে, সে-তত্ত্বকথা হঠাৎ যেন অপূর্ব এক রসমূর্তি নিয়ে চেতনায় উদ্ভাসিত হোলো। চোখের সামনে যে আধ-ডজন নামের কাঠ খোদাই স্তব্ধ হয়ে আছে, তাদেরই নিহিত চাঞ্চল্য মেরুপ্রদেশের কঠিন জলতরঙ্গের মতো মনের মধ্যে কেমন যেন ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ ছড়িয়ে দিয়ে গেলো!

যাঁরা পথে বেরিয়েছেন, এমন সব স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। তাজমহলের পাথরে, ফতেপুরশিক্রীর লাল দেয়ালে, কুতুবমিনারের সিঁড়িতে, জাহাঙ্গীরের কুখ্যাত গ্রন্থশালার কোণে কোণে এমন কতো নাম আগাছার মতন ঋতুতে ঋতুতে জমে ওঠে,—ওষধির মতন বছরের পর বছর টিঁকে থাকে।

এক মনের অভিজ্ঞতা থেকে বহু মনের বোধগম্যতার অভিমুখেই আমাদের প্রকাশের স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পাথর বা ধাতুর ফলক দিয়ে,—চকখড়ি দিয়ে,—কালি-কলম, পিটুলি, তুলি-বুরুশ, হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই দিয়েই, মানুষ নিজের আকাঙ্ক্ষা আর অভিজ্ঞতার ছবি তুলে রেখেছে অন্য মানুষের জন্যে। বাংলার কলমীলতা, শঙ্খলতা, খুন্তীলতার আলপনা,—আফ্রিকার এবং মার্কিন মুলুকের 'টোটেম্' হোলো এই সর্বজনীন প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত। ক্রীট, মিশর, গ্রীস,—দুনিয়ার প্রাচীন আলোকস্তম্ভের মতো স্মৃতির সীমাহীন ধূসরতায় এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে-সব দেশ, এক সময়ে শঙ্খলতার মণ্ডন সে-সব দেশের শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাংলার নিভৃত শান্তিলোকে,—যশোরের মেয়েদের হাতেই এই

শৃঙ্খলতার রূপকল্প প্রথম লতিয়ে উঠেছিল। হয়তো বাংলার প্রসিদ্ধ ঢাকাই শাড়ীর পাড়ে লুকিয়েই সেই লতা কোনো সময়ে প্রাচীন গ্রীসে-মিশরে চালান গিয়ে থাকবে! প্রথম যে-মনে এই প্রকাশের প্রেরণাটি জেগেছিল,—হাতের শাঁখা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, পুকুরের কলমীলতার বনে উদাস, বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি মেলে রেখে, ঘরকন্নার প্রত্যক্ষ ঝামেলার ফাঁকে-ফাঁকে শাশুড়ী-ননদের, প্রিয়জন-গুরুজনের ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে প্রথম যে-মেয়েটি মনে মনে এই লীলা উপভোগ করে গেছে,—অনাবশ্যক আঁচড় কেটেছে ঘাটের পৈঠায়, আঙিনার মাটিতে,—সময়ের সম্মার্জনী তাকে অতি স্বাভাবিক দায়িত্ববোধেই চুপি চুপি বিদায় দিয়েছে। ইতিহাসে তার নাম নেই। পূর্ববঙ্গগীতিকার কোনো প্রত্যন্ত কোণেও সেই অন্তঃপুরিকার স্নান-প্রসাধনের সৌরভ সঞ্চিত নেই। কারণ, তার সেদিনকার আঁচড়ের মূলে প্রেরণা ছিল বটে, কিন্তু সে প্রেরণা তখনো আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত শিল্পকলা আয়ত্ত করেনি। তারপর, বাংলার কতো বৌ-ঝির কতো চাঁপাকলি আঙুলের যাদুতে সেই আঁচড় হোলো আলপনা,—কাকলী হোলো ভাষা!

ভাষা ভাবনার বাহন। বাহন এবং আরোহীর দাম এক নয়,—কোনো হবুচন্দ্র গবুচন্দ্রের রাজ্যেও অশ্ব এবং অশ্বারোহীকে সমান মর্যাদার অধিকারী বলে স্বীকার করা হয় না। অবিশ্যি, অশ্বের গুণে অশ্বারোহীর সম্মানে কম-বেশি ঘটতে পারে। ভাষার ক্ষেত্রেও কতকটা সেইরকম। তবে, ভাষার ঘোড়াতে মনের ভাবনা যখন আরোহী হয়, এই 'সাদৃশ্য' তখন হয়তো পুরোপুরি খাটে না। কারণ, প্রকৃত ভাবুকের পক্ষে ভাষা হোলো তাঁর সৎ-চিৎ-আনন্দ-প্রণোদিত সংকেত! সে-ক্ষেত্রে, আরোহী তাঁর যোগ্য বাহনটি স্বতঃই বেছে নিয়ে থাকেন। আরোহীর গলায় ঝোলানো তক্‌মার জোরে, অথবা, তার মাথায় ওড়ানো উষ্ণীষের ভয়ে ঘোড়া তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায় না,—ভাবুকের ভাবনার বল্গাতেই ঠিক ভাষাটিতে ঠিকভাবে টান পড়ে। ভাষা মাত্রেই সংকেত। সাধারণ লোকাচারের ভাষা বহু প্রচলনের ফলে আমাদের কাছে জলবৎ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শিল্প-সাহিত্যের ভাষা সব ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। সে ভাষা তির্যকতর সংকেত!

পরিণত শিল্পপদ্ধতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, গহন সংবেদনের সঙ্গে তদনুকূল প্রকাশরীতির ওতঃপ্রোত যোগ এই সব পথে স্বতঃই সাধিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন ওঠে,—শব্দার্থের এই 'সাহিত্য-সাধন' বা কাব্য-রসায়ন বা কবিকৃতির রহস্যটি কি? Wordsworth-কথিত বহুশ্রুত 'emotion recollected in tranquillity'-র সূত্রে শিল্পসৃষ্টির রহস্য-ব্যাখ্যান যদিচ প্রশস্ত, তথাপি, কাব্যের সর্বসংজ্ঞা-পরাজয়ী আনন্দস্বরূপের কথা স্মরণ করে কোনো কোনো রসিক ব্যক্তি দীর্ঘস্বীকৃত এই সংজ্ঞাতেও আপত্তি তুলেছেন। এই রকম এক প্রতিবাদী বলেছেন:

It will not do to talk of 'emotion recollected in tranquillity',

which is only one poet's account of his recollection of his own methods ; or to call it 'criticism of life', than which no phrase can sound more frigid to anyone who has felt the full surprise and elevation of a new experience of poetry.*

কবি ও পর্যালোচক এলিয়ট্ সাহেবের এ-মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। ওয়ার্ডস্বার্থ এবং ম্যাথু আর্নল্ড উভয়ের উক্তি সম্পর্কেই তাঁর কটাক্ষ সমান তীক্ষ্ণ। কবির যে-অভিজ্ঞতা থেকে কাব্যের জন্ম হয়, কেবলমাত্র সেই উৎসের বিশ্লেষণেই কাব্যের রহস্যোদ্ধার করা সম্ভব নয়,—এই হোলো তাঁর সিদ্ধান্ত। কাব্য কবির ইন্দ্রিয়বোধ এবং মননের লালনে, স্মৃতি ও শ্রুতির পরিচারণে বিকশিত হয় বটে,—কিন্তু কাব্যরহস্য বা কাব্যের বক্তব্য কখনোই ঠিক এইসব উপাদানের যোগফলের সমান নয়। অর্থাৎ, কাব্যবিশেষের আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাবের চৌহদ্দীর মধ্যে কাব্যরহস্যকে কোনো ক্ষেত্রেই বেঁধে রাখা যায় না। গঙ্গোত্রীর বর্ণনায় গঙ্গার স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়,—এই হোলো এলিয়টের অভিমত।

ক্রোচে বলেছেন, এ হোলো আবেগের যন্ত্রণা থেকে ধ্যানের স্থৈর্যমুখে অভিযান। বাংলায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইখানিতে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বহুমান্য বিদগ্ধজনের অভিমত তুলে দেখিয়েছেন যে, সেখানেও এই মূলমন্ত্র সম্বন্ধে মতানৈক্য নেই। Wordsworth-ও একই কথা বলতে চেয়েছিলেন। Wordsworth এবং Matthew Arnold প্রদত্ত পৃথক পৃথক সূত্রের বিরোধিতা করেও Eliot-সাহেব সেই একই কথা বলতে চেয়েছেন,—বলতে চেয়েছেন যে, কবিকৃতি রহস্যময়ী,—'কবিরে পাবে না তাঁহার জীবনচরিতে'।

Fancy এবং Imagination-এর পার্থক্য স্বীকার করে Imagination-এর যে কৌলীন্য সে যুগে Coleridge-এর লেখায় ঘোষিত হয়েছিল, সে-কৌলীন্যের হেতু সন্ধান করলেই পূর্ব-মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। পরস্পর-সংপৃক্ত বাগর্থের অর্ধনারীশ্বর-কল্পনায় কালিদাস সেই অলৌকিক শক্তির,—সেই 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা'রই ইঙ্গিত করে গেছেন। আবার একাদশ শতকের 'বক্রোক্তি'বাদী কুন্তক 'শব্দার্থ-সাহিত্যের' প্রসঙ্গে 'বিদগ্ধভঙ্গীভণিতি' কথাটি ব্যবহার করে কবিদের সেই চিররহস্যময়ী চমৎকারী শক্তিরই অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রাচীন গ্রীক মনীষীরা Esemplasis-তত্ত্বের সূত্রে-ভাষ্যে তারই বন্দনা লিখে গেছেন।

উনিশ শতকে ফ্রান্সে প্রতীকী-আন্দোলনের (symbolist movement) যখন সূত্রপাত হয়, তখন থেকে কবিকর্মের সাধনায় চির-উহ্য অথচ চিরস্বীকৃত বোধগম্যতার

*The Sacred Wood : T. S. Eliot

লক্ষ্য অস্বীকার করে কাব্যে কবির আত্মগত সংবেদনের প্রক্ষেপন-অভিপ্রায়ে এক শ্রেণীর লেখক খুবই মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ইংলণ্ডে রোমান্টিক কাব্যের 'ভোরের পাখি' ছিলেন কবি ব্লেক,—আমাদের বাংলা সাহিত্যে যেমন বিহারীলাল চক্রবর্তী। ব্লেক বলেছিলেন—

May God us keep
From single vision and Newton's sleep.

মনের বুদ্ধিজাগর অবস্থার জন্যে বৈজ্ঞানিক নিউটনকে দোষ দেওয়াটা অবিশ্যি সঙ্গত নয়। তার কারণ, Newton-এর অভিপ্রেত ক্ষেত্র ছিল প্রধানতঃ বুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতার দ্বারা বেষ্টনীবদ্ধ। তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে কার্যকারণাত্মক বস্তুজগতের বাইরে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্যের অভিসারে যেতে চান নি। তিনি যে-দৃষ্টির প্রসাদ পেয়েছিলেন, সে হোলো 'দ্বৈত-দর্শন'।

For double the vision my eyes do see,
And a double vision is always with me.

ব্লেকের এই 'দ্বৈত-দর্শনে'র ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিদগ্ধ এক সমালোচক লিখেছেন যে, তাঁর কাছে 'spiritual attitude is more real than thought'; অর্থাৎ, কার্যকারণদর্শী বুদ্ধির চেয়ে আত্মিক উপলব্ধিতেই তাঁর আস্থা বেশি ছিলো।

রসিক-সাধারণের বোধগম্য শিল্পের ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ এই attitude আর thought-এর,—অর্থাৎ মেজাজ আর মননের রাসায়নিক যোগ ঘটে থাকে। সর্বসাধারণের, অর্থাৎ বিদগ্ধ-সাধারণের পরিচিত ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার উল্লেখ-সূত্রেই কবিদের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির ইশারা ধ্বনিত হয়ে থাকে। কিন্তু, ব্লেক এই রকম কোনো সিঁড়ি ভেঙ্গে তাঁর পাঠকের কাছে পৌঁছতে হয়তো রাজী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন মেজাজের প্রাধান্য। ফরাসী সাহিত্যের প্রতীকী-আন্দোলনেও এই বুদ্ধি-নিরপেক্ষ মেজাজেরই উপাসনা ঘটেছে। মনের নিভৃত, গহন, ব্যক্তিগত সংবেদনার প্রত্যক্ষ প্রক্ষেপনের দিকেই এই প্রতীকবাদীদের লক্ষ্য ছিলো। এবং এই সূত্রে একথাও মনে পড়া স্বাভাবিক যে, প্লটিনাস, বের্গসঁ প্রভৃতি দার্শনিকরাও বুদ্ধিকে স্বজ্ঞা বা intuition-এর অধীনতায় অধীনস্থ রাখতেই উৎসাহী ছিলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে Zurich-এ আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের এক সভাতে Dadaism নামে যে নব্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সমাজতত্ত্ববিদ্ সাহিত্যালোচকেরা বলেছেন যে, সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকায় সে হোলো ধনতান্ত্রিকতার প্রতিবাদ; আর, শিল্প-ক্ষেত্রে তাকে বলা যেতে পারে অচেতন-অবচেতনের অভিষেক। বুদ্ধির সর্বময় নেতৃত্ব অস্বীকার করে শিল্পিমানসকে এঁরা অচেতন-অবচেতন লোকের সূক্ষ্ম

উপলব্ধির প্রবাহক্ষেত্র রূপেই গ্রহণ করলেন। তারপর ফ্রয়েডীয় মনোবিচার প্রচারিত হবার পরে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারিসে 'স্যুর-রিয়্যালিজমে'র নববোধন শোনা গিয়েছিল।

য়ুরোপে নব-যুগের গদ্য-লেখক জেমস্ জয়েস্ Zurich-এ এবং Paris-এ বহুদিন বাস করেছিলেন। 'স্যুর-রিয়্যালিজমের' হাওয়া লেগেছিল তাঁর মানস-কুঞ্জে। ফলে 'ইউলিসিস্'-এর জন্ম হয়। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে Virginia Woolf, কবিদের মধ্যে T. S. Eliot একদা এই একই দৃষ্টির প্রভাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জয়েসের গদ্যরীতির আলোচনা-প্রসঙ্গে এলিয়ট সাহেব Newman-এর এবং Walter Pater-এর প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া, অন্যত্র জয়েসের অরো ঋণ ছিল। তিনি ছিলেন 'সংকেত'-ভাষী।

গদ্যের ক্ষেত্রে, জয়েস্ প্রধান যে-জিনিসটি আনলেন, সেই 'সংকেতভাষণে'র উৎস কোথায়? জীবনের ঘৃণিত বাস্তব চিত্র পরিবেষণের অভিযানে সমসাময়িক গুণিজনের ভাষণে তিনি তিরস্কৃত হয়েছেন। বার্নাড শ' তাঁর বইখানা আগুনে আহুতি দিয়েছিলেন। ডি-এচ লরেন্স সে-বই সম্পর্কে যে সব কথা বলে গেছেন, তার মধ্যে সব চেয়ে মোলায়েম অংশ হোলো : James Joyce bores me stiff.।

স্বতঃস্ফূর্ত কথার এলোমেলো আঁচড়কে সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করবার আস্ফালনই হয়তো জেম্স্ জয়েসের অভিনব রীতিতে মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল! জয়েস্ নিজে বলে গেছেন যে, Edward Dujardin নামে এক প্রতীকবাদী ফরাসী লেখকের লেখা একটি ছোট উপন্যাস থেকেই তাঁর পক্ষে এই জাতীয় সংকেতভাষণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। দুজার্দাঁ তাঁর প্রবর্তিত এই অন্তর্মুখী রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—ও হোলো internal monologue-এর সমধর্মী। বিশদভাবে ব্যাকরণের শাসন মেনে চলা ওখানে অসম্ভব।

বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-রীতি নতুন জিনিস নয়। ডস্টয়েভস্কীর রচনায় আঁদ্রে জীদ্ এমন দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন। পূর্ববর্তী ইংরেজী সাহিত্যেও এ-জিনিস একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। 'স্যুর-রিয়্যালিজমের' প্রবর্তকদের কাছে শোনা গেছে যে, স্মৃতির উৎপাতমুক্ত শিল্পিমানসের অব্যবহিত প্রক্ষেপণই ছিল তাঁদের কাম্য এবং উপাস্য,—সাধ্য এবং লক্ষ্য। জেমস্ জয়েস্ তাই-ই করে গেছেন। তাঁর রচনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সে লেখাতে আছে—'immense geographies of dream and desire'।

এই জাতীয় 'আঁচড়ের' মূলে কবিমনের চিন্তাবিমুখ যে লীলাপ্রবণতা অভিব্যক্তি কামনা করে, তার সার্থকতার সম্ভাবনায় আস্থা রাখতে আপত্তি নেই। কিন্তু কেবল

চিন্তাবর্জিত অনুভূতি কোনো অবস্থাতেই শিল্পীর সার্থকতার একমাত্র শর্ত হতে পারে না। অর্থহীন আঁচড় মনের খেয়ালে উৎসারিত হয়,—পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার জন্যে তা মাথা ঘামায় না। 'সুর-রিয়্যালিজম্' আর 'সন্ধ্যা ভাষা'—এ দুই পদার্থই অর্থব্যাখ্যানকুণ্ঠ আঁচড়েরই রকমফের।* এবং সেই কারণে, সাধারণ রসগ্রাহীর কাছে এই দুই পদার্থ আজও দুর্বোধ্য। রস-পরিবেষণের কাজে পাত্র অনুচিত হোলে রসও অপচিত হয়। অর্থাৎ শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবের সার্থক, শিল্পোচিত 'সাধারণীকরণ' তখন আর সাধ্য হয় না।

রাজানক কুন্তক বলেছিলেন 'বক্রোক্তি কাব্যজীবিতম্'। তির্যক ভাষণেই শিল্পীর প্রকৃত কৌশল! কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, অতি-স্পষ্টতা যেমন অতি-বাস্তব, —অতি-তির্যকতা তেমনি অতি-অবাস্তব। 'বক্রোক্তি' এই দুই-এর মধ্যগা রীতি। কুন্তক তাঁর প্রবর্তিত বক্রোক্তিবাদের ব্যাখ্যানে পর্যায়ক্রমে ভঙ্গি-ভণিতি, বৈচিত্র্য, বিচ্ছিত্তি, বক্রত্ব ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে বলেছিলেন যে, 'বক্রোক্তি' মানে বাক্‌চাতুর্য নয়,—বক্রোক্তি হোলো কবি-কল্পনার সামগ্রিক প্রকাশ। কবিকল্পনার লালনে, শব্দ এবং অর্থের অদ্বৈত-সত্তা যে-উক্তির মধ্যে দীপ্তিমান হয়ে উঠে সহৃদয় বিদগ্ধজনের মনে লোকোত্তর-চমৎকারী অনুভূতি সৃষ্টি করে, তারই নাম বক্রোক্তি। অতএব, যে-আঁচড় বিদগ্ধচিত্তে আনন্দ সৃষ্টি করে না, সে-আঁচড় আর যাই হোক, সাহিত্যে বা শিল্পলোকে বরণীয় নয়। আবার, যে-কথা স্পষ্ট অর্থবহ হোলেও বেগহীন, বর্ণহীন, ব্যঞ্জনাহীন,—লোক-প্রচলন আর অভিধানের দ্বারা সমর্থিত হোলেও শিল্পবিচারে সে কথা শুধু আঁচড়-ই। তা হোলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে আপত্তি নেই যে, একদিকে পদ্যপাঠের পদ্য এবং অন্যদিকে বহুনিন্দিত আধুনিক কাব্যের 'হিং টিং ছট্' এই দুই জিনিসই আঁচড়, প্রথমটি অর্থসম্পন্ন এবং দ্বিতীয়টি অর্থহীন।

কবিতায় অস্পষ্টতা

আনন্দবর্ধন বলে গেছেন যে, সর্ববিদ্যার মূলে আছে ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ হোলো শব্দব্যুৎপত্তি-শাস্ত্র। শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভাষার নিয়ম, পদ-সাধনের পদ্ধতি, পদান্বয়ের প্রক্রিয়া—এইসব আয়ত্ত না হোলে কোনো বিদ্যাতেই প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। আধুনিক ভাষায় 'ব্যাকরণ' কথাটির অর্থ-প্রসারণ ঘটেছে। একালে ব্যাকরণের মধ্যে উচ্চারণ-শাস্ত্র (সংস্কৃতের 'শিক্ষাশাস্ত্র'), ছন্দোশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি ঢুকে পড়েছে। আনন্দবর্ধন

* 'সন্ধ্যা ভাষা' বানান অবিষ্টি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া। পরে এ-বানানে বদল দেখা গেছে। অনেকেই 'সন্ধা ভাষা' লিখে থাকেন। পরিবর্তিত নতুন বানানের সঙ্গে নতুন অর্থনির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে সে প্রসঙ্গ উহ্য থাক।

বোধ হয়, এতোসব শাস্ত্রের কথা মনে রেখে ও-কথা বলেন নি। তিনি হয়তো এই বলতে চেয়েছিলেন যে, শব্দের বাহনে যাঁদের চলাফেরা করতে হয়,—শব্দের আইন সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান থাকা দরকার। কথাটি এতোই সঙ্গত যে, মনে হয়, ও-কথা আবার ঘটা করে বলবার কি দরকার ছিল!

আনন্দবর্ধনের সময়ে ও-কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করবার কী যে দরকার ছিল, জানি না। তবে, আমাদের কালে, ভাষায় এবং জীবনে স্বতঃসিদ্ধের মতন এই সহজ কথাটি লাখ-কথার এক-কথা বলে মনে হয়। কারণ, এ-যুগে চিরাভ্যস্ত জীবনের ব্যাকরণেও যেমন গোল বেধেছে, ভাষার ব্যাকরণেও তেমনি শৈথিল্য ঢুকেছে। আর, ভাষার রাজ্যে সবচেয়ে যাঁরা বেশি অরাজকতার লক্ষণ দেখাচ্ছেন, তাঁরা বৈজ্ঞানিক নন, দার্শনিক নন, ঐতিহাসিক নন, সাধারণ মানুষও নন,—তাঁরা হলেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যরচয়িতা। অভ্যস্ত ব্যাকরণের যাঁরা বিরোধিতা করেন, কবিপ্রসিদ্ধির চিরাভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া উৎপাদনে যাঁদের ঝোঁক নেই, শব্দের সুপরিচিত স্বাদে যাঁদের আগ্রহ অল্প—সেইসব 'অনাচারী'র দল চান কি? তাঁরা কি বুদ্ধিহীন? পাঠকের এবং শ্রোতার আশু-অনাগ্রহ এবং ক্রমলভ্য বিস্মৃতি-ই কি তাঁদের কাম্য? ব্যাপারটি তলিয়ে দেখা দরকার। কারণ, এই দলে যাঁরা নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও সৎ লেখকের অভাব নেই, শাস্ত্রজ্ঞ অনেক আছেন,—'অন্যে পরে কা কথা',—আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেচে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।'*

সব মানুষের স্বভাব এক নয়। মনের সংস্কার, প্রাণের আশা, জীবনের প্রয়োজন—এইসব ব্যাপারে মানুষে-মানুষে ভেদ থাকার ফলে বিভিন্ন মানুষের আত্মপ্রকাশেরও ভেদ ঘটে থাকে। তবু, পরস্পরের মেলামেশার সুবিধার জন্যেই ভেদগুলো যথাসম্ভব দাবিয়ে রেখে, এক-একটি ভাষার মিলন-মণ্ডপে সর্বজনীন এক-একটি আশ্রয় গড়ে তুলতে হয়। সংসারের নিত্য-প্রয়োজনের ভাষায় তাই দেখা যায় সর্বজনীনত্ব। জীবনের সাধারণ দাবির ভাষা স্পষ্ট,—বিজ্ঞানের ভাষা সতর্ক,—বণিকের ভাষা বিনীত, কিন্তু বিনয়ে বেহুঁস নয়,—দর্শনের ভাষা শ্রমবোধ্য,—ইতিহাসের ভাষা সরল, কদাচ অলংকৃত,—কিন্তু কাব্যের ভাষা রমণীয় এবং অস্পষ্ট। অস্পষ্টতা কবিতার কলঙ্ক! অস্পষ্টতাই কাব্যের জ্যোৎস্না!

কাব্যের অস্পষ্টতার নানা কারণ। অস্পষ্টতা কখনো হয় শব্দগত, কখনো অন্বয়গত, কখনো অলংকারগত, কখনো আবার কবির উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যগত। মধুসূদন দত্ত

* আধুনিক কবিতা : রবীন্দ্রনাথ

একবার বলেছেন 'দম্ভোলি,' আবার বলেছেন, 'ইরম্মদ'—কিন্তু সাধারণ বাঙালীর কাছে সুপরিচিত 'বাজ' শব্দটা তিনি এড়িয়ে চলেন ; বেহুলার সঙ্গে রসিকতা করে, ভবানীর কাছে বকুনি খেয়ে নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' শিব বলেছেন, 'নাতি বৌহারি জানি চব্ব্ুট করিলাম আমি,' অর্থাৎ নাতবৌ-এর সঙ্গে ঠাট্টা করেছি—তাতে আবার দোষ হোলো কোথায় ? সে কালে নিশ্চয় 'চব্ব্ুট' কথাটা চলতি ছিলো—কিন্তু একালের বহু পাঠকের আগ্রহ 'চব্ব্ুটে'র ধাক্কায় হিম হয়ে যায়! এ রকম ভাষা অলস লোকের কাছে অস্পষ্ট বটে, কিন্তু, অভিধান খুলে দেখলেই ধোঁয়া কেটে যায়। কিন্তু প্রকৃত শব্দগত অস্পষ্টতা ঘটে সেইখানে—যেখানে শব্দটি হয় দেখা যায় পুরোপুরি অভিধান-বহির্ভূত,—নয়তো ব্যবহারকর্তার উদ্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দটির ঔচিত্যের যোগ ব্যবহারকর্তা ছাড়া আর কারও কাছেই যেখানে সুপ্রকাশিত নয়। পুরোপুরি অভিধান-বহির্ভূত শব্দের দৃষ্টান্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'গল্পসল্পে'র বাচস্পতি মহাশয়ের উদ্ভাবিত কথাটি হোলো 'পেডেণ্ডা',—সরস ভাবে পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং গাম্ভীর্য ব্যক্ত করতে যার জুড়ি মেলে না! বনফুলের 'জঙ্গমে' আছে 'লদকালদকি' ইত্যাদি শব্দ। এসব শব্দ এখনো অভিধানে ওঠেনি বটে,—কিন্তু বই থেকে মানুষের মুখে যদি এরা জায়গা পায়, তাহলে আরো অনেক বইয়ে ওদের ফিরে-ফিরে পাওয়া যাবে এবং ক্রমশঃ অভিধানেও ওদের জায়গা হয়ে যাবে। তখন আর এসব শব্দ অস্পষ্ট থাকবে না। কবিতায় শব্দগত অস্পষ্টতা এছাড়া আরো এক কারণে ঘটে থাকে,—বাংলায় যেমন ঘটেছে বিষ্ণু দে-র কাব্যে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সে কারণটি খুলে বলেছেন : 'বিষ্ণু দে-র শব্দনির্বাচন যে-পরিমাণে অনুষঙ্গবাহী, সে অনুপাতে অভিধানসম্মত নয়'।

তারপর আছে—অন্বয়গত এবং অলংকারগত অস্পষ্টতা। গদ্যে বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত পদ নিজেদের পারম্পর্যের বিধি যথারীতি মেনে চলে। তবে, বৈচিত্র্যের জন্যে মাঝে মাঝে এদের একটু-আধটু ঠাঁইবদল ঘটে থাকে। বাংলায় ক্রিয়াপদের প্রতিষ্ঠিত জায়গাটির দাবি রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই তাঁর অনেক বাক্যে উপেক্ষা করেছেন। ক্রিয়াপদের বাক্যান্তিক অবস্থান না মেনে বাংলা গদ্যকে তিনি একঘেয়েমির জড়তা থেকে বাঁচিয়েছেন। গদ্যে এরকম একটু-আধটু রদবদল চলে বটে,—কিন্তু বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের ব্যাকরণসম্মত পারম্পর্য সেখানে অধিক মাত্রায় উপেক্ষা করা চলে না। এ-রকম উপেক্ষা তিরস্কারের বস্তু। দূরান্বয় একটি দোষ। কবিতায় দূরান্বয় অবিশ্যি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। তাই কবিতার অন্বয় বোঝবার জন্যে, পাঠক স্বভাবতঃই গদ্যের তুলনায় একটু বেশি পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। দূরান্বয়ের সঙ্গে কষ্টকল্পনা দোষটিরও উল্লেখ করা দরকার। ইংরেজী অলংকার-

শাস্ত্রের strained metaphor, mixed metaphor একই পর্যায়ের দোষ। তবে, অধ্যবসায়ী পাঠক এসব বাধাও কাটিয়ে উঠতে পারেন। মিল্টনের কাব্যও শ্রমপাঠ্য, মধুসূদনের কাব্যও তাই—তথাপি এঁদের ভক্ত পাঠকের সংখ্যা অল্প নয়।

কবিতায় যে অস্পষ্টতা অন্ধকারতম, তার জন্মভূমি কিন্তু অন্যত্র। সে হোলো কবির উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যে আশ্রিত। কবির অভিনব কোনো ভাবনার সঙ্গে কবিতার চিরাভ্যস্ত ভাষার সার্থক সমীকরণ না ঘটলেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাগর্থ আর যাথার্থ্যের সম্পূর্ণ সমীকরণ অসাধ্য'। সে কথা মানতেই হয়। কিন্তু গণিতের হিসেবে নয়, রসনিষ্পত্তির হিসেবে ধরলে 'সম্পূর্ণ সমীকরণে' আপত্তি ওঠবার কথা নয়। 'সম্পূর্ণ সমীকরণে' না হোক্, তার বদলে 'সার্থক সমীকরণের' আবশ্যিকতায় বোধ হয় কেউই আপত্তি তুলবেন না? সম্পূর্ণতার কথা রসের দিক দিয়েই বিবেচ্য,—গাণিতিক বুদ্ধির জরীপে নয়। সার্থকতা মানেই সম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণতা মানেই সার্থকতা।

আধুনিক কালে যে-সব জ্ঞানী-গুণী লেখক কাব্যের ভাষায় 'সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে' চলছেন না,—তাঁদের চেষ্টাও এই 'সার্থক সমীকরণ' ঘটানোর দিকে। অতীতে যে ভাষায় 'সমীকরণ সম্ভব হয়েছে, একালের নতুন মনোভঙ্গি সে-পোশাকে সত্যিই আর ধরা দেয় না। পুরোনো আমলের পাঠ-নেওয়া পাঠক তাঁর অনভ্যাসের জন্যেই একালের নতুন পোশাককে রুচিসম্মত বলে ভাবতে পারছেন না। কেউ বলছেন এ-পোশাক উন্মাদের,—কেউ বা বলছেন এ সজ্জা অক্ষমের! অবিশ্যি উন্মত্ততা বিরল নয়, অক্ষমতাও সম্ভব। কিন্তু অক্ষমতা লেখকেরও একচেটে নয়, পাঠকেরও সর্বাঙ্গীণ নয়। দুটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

এধারে যাহার মাটির দম্ভ ওধারে মাটির মায়া
পদতলে যার অশ্রুর মত জল,
সে সেতু নহেক, বিবাহ দেয়নি এপারে ওপারে ভাই;
রাখিবন্ধন নহে শুধু শৃঙ্খল······ —প্রথমা: প্রেমেন্দ্র মিত্র

এই গেল প্রথম দৃষ্টান্ত। এইবার দ্বিতীয় উদাহরণ:

তবুও হংসীই আভা; হয়তো বা পতঞ্জলি জানে।
সোনায় নিটোল করা ডিম তার বিমর্ষ প্রসব।

—মহাপৃথিবী, পরিচায়ক: জীবনানন্দ দাশ

এই দু'টি দৃষ্টান্তে শব্দগত অস্পষ্টতা আদৌ নেই,—অন্বয়ের গোলমালও অনুপস্থিত,—পাঠকের কান ধ্বনিতে তৃপ্ত হয়, মন সম্পূর্ণরূপে না-বোঝা এক-একরকম স্বাদে তুষ্ট

হয়—তথাচ মনের মধ্যেই জিজ্ঞাসা ওঠে—প্রেমেন্দ্র কোন্ সেতুর কথা বলছেন? পতঙ্গগুলির সঙ্গে জীবনানন্দের আভাময়ী হংসীরই বা সম্পর্কটা কি?

শব্দের আছে তিন শক্তি। অভিধা-শক্তি মানে, সেই শক্তি—যার গুণে শব্দবিশেষের অভিধানগত অর্থটি মনে পড়ে। তাৎপর্য-শক্তির গুণে বাক্যে অবস্থিত বা পরস্পর-সংলগ্ন শব্দমালার পারস্পরিক সম্পর্কটি বোঝা যায়। আর, শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থের পরিবর্তে তৎসম্পর্কিত অন্য অর্থের উদ্রেক করে যে শক্তি, তারই নাম লক্ষণা-শক্তি। অভিধা-লক্ষণা-তাৎপর্যকে অতিক্রম করে রচনার যে বিশেষ গুণ এই তিনের অতিশায়ী চতুর্থ এক অর্থে শ্রোতার বা পাঠকের মনকে ন্যস্ত করে, তারই নাম ব্যঞ্জনাশক্তি। ব্যঞ্জনাই মহৎ কাব্যের লক্ষ্য। এ-রাজ্য বৈয়াকরণের তদারকির বাইরের এলাকা। ওপরের দু'টি দৃষ্টান্তেই কবিরা এই রাজ্যে পৌঁছুতে চেয়েছেন। কিন্তু পথে বাধা পড়েছে,—দেখা দিয়েছে অস্পষ্টতা। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে বাধা সামান্য,—কবিতাটির শেষ অবধি পৌঁছে শোনা যায়—'সেতু সে ব্যর্থতার'। তখন আর মনে বিশেষ অস্বস্তি থাকে না। শেষের দৃষ্টান্তটি কিন্তু উদ্ভট মননের পরাকাষ্ঠা! যে-অর্থে রবার্ট ব্রাউনিঙের অনেক কবিতা অস্পষ্ট, যে-অর্থে সপ্তদশ শতকের ইংরেজি অধ্যাত্ম-কাব্য (metaphysical poetry) দুর্বোধ্য,—জীবনানন্দের এই দুটি চরণ সে-অর্থে অস্পষ্ট নয়। এ অস্পষ্টতার কারণ—কবির একান্ত আত্মমগ্নতা! একেই বলে 'অন্তর্মুখী স্বগতোক্তি'—internal monologue। অপরের বোধগম্য করবার জন্যে ব্যাকরণাতীত যে ব্যাকরণের কাছে কবির বশ্যতা শাশ্বত,—জীবনানন্দ তাঁর এই কবিতায় সেই বশ্যতাই উপেক্ষা করেছেন। ফলে, তাঁর এ-কবিতায় নতুনত্ব ফুটেছে, কিন্তু শ্রী ফোটেনি,—অস্পষ্টতা ঘটেছে, কিন্তু কাব্য ঘটেনি।

হাল্‌কা পদ্য

উড়িষ্যার এক গ্রাম থেকে আঠারো উনিশ বছরের একটি কিশোর এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। সে প্রায় শতাধিক বছর আগেকার ঘটনা। আগন্তুক ছিলেন দীন-দরিদ্রের সন্তান। তাঁর বাপের নাম মুকুন্দ, জাতিতে করণ। কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে রাধামোহন সরকারের যাত্রার দলে প্রসিদ্ধ লেখক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নাকি 'সখী'র ভূমিকায় নামতেন। যাত্রা, খেউড়, হাফ-আখড়াই, কবিগানের তখন খুবই প্রতিপত্তি। হয়তো তদানীন্তন রুচির রঙ্ ধরেছিল নবীন আগন্তুকের মনে। শহরের পথে পথে তিনি তখন ফেরিওয়ালার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখে গেছেন—'একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফিরিওয়ালা 'চাঁপাকলা'

বিস্তার। বারো শ' ষাট সালের এগারোই ফাল্গুন তিনি হুগলী জেলার রাধানগর থেকে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। অণ্ডাল, রানীগঞ্জ পেরিয়ে,—গয়ার পথ ধরে, গয়াতীর্থে কয়েকদিন কাটিয়ে, গয়া থেকে বেরিয়ে অতঃপর তিনি সাসারাম প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে এসেছিলেন। কানপুর, লখনউ, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি নানা জায়গার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে গেছেন তিনি। কানপুরে তখন অনেক চাকুরে বাঙালী ছিলেন। সেখানে কালীবাড়ি দেখেছিলেন যদুনাথ। সেখান থেকে তিনি কানপুরের আট ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বিঠোরে গিয়েছিলেন।

বিঠোরে বাল্মীকির তপোবন ছিল বলে শোনা যায়। সে নাকি সীতার বনবাসের জায়গা, লব-কুশের জন্মভূমি। বিঠোর থেকে কান্যকুব্জের দূরত্ব যদুনাথের মতে ছ'ক্রোশ মাত্র। উত্তর-প্রদেশের ফরক্কাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত এই কান্যকুব্জেরই নামান্তর হোলো কনৌজ। খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াঙ এখানে বহু হিন্দু দেবমন্দির এবং বৌদ্ধ চৈত্য আর সঙ্ঘারাম দেখে গিয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় পাদের শেষ দিকে শেরশাহের সঙ্গে এই কনৌজ নগরেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন ভারত ছেড়ে পারস্যদেশে পালিয়েছিলেন। সে যাই হোক, আজ থেকে শ'খানেক বছর আগেকার এই ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় যদুনাথ লখনউ শহর সম্বন্ধে যা বলে গেছেন, সে কথা ভোলবার নয়। তাঁর মনে হয়েছিল যে লখনউ 'অরাজকের ন্যায় রাজ্য। যাহার বল আছে, তাহারই প্রভুত্ব, দুর্বলের বল কেহ নাই।' এবং তিনি আরো বলে গেছেন—'লক্ষ্ণৌশহর অতি উত্তম স্থান, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, এদেশের সকল মনুষ্য মহাবলপরাক্রমশালী, বড় উগ্রস্বভাব, অল্প কথায় বিবাদ হইলেও তরবারি চলে! সরকার কোম্পানী বাহাদুরের তরফে একজন রেসিডেণ্ট, দুই দল সৈন্য আছে।'

লখনউ থেকে অযোধ্যা দর্শন করে, সেকেন্দ্রায় রাত্রি যাপন করে, প্রথমে আগ্রা,—সেখান থেকে মিঠেপুর, শকুয়াবাদ—সেখান থেকে উশানী, খান্দানী হয়ে তিনি মথুরা-বৃন্দাবনে পৌছেছিলেন। তারপর আরো দেশ, আরো দৃশ্য! পুষ্কর, আজমীর—হরিদ্বার, হৃষীকেশ। হরিদ্বার থেকে বদরীনারায়ণের পথ ধরেছিলেন যদুনাথ। হৃষীকেশে লছমন-ঝোলা পেরিয়ে ওপারে ছ'ক্রোশ দূরে পেয়েছিলেন ফুলাড়ি গ্রাম। সেখানে তাঁরা বিশ্রাম করেছিলেন। তারপর—বিজলী, দেবপ্রয়াগ, রানীবাগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ।

বাংলাদেশের রাধানগর থেকে বেরিয়ে এই যে অনেক দূর দূর দেশে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, যদুনাথ এ অভিজ্ঞতা খুবই আগ্রহের সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন। তবে, সে বর্ণনাতে তাঁর নিজের যে স্বভাব ব যে ব্যক্তিত্বের ছায়া পড়েছিল, তাতে গভীরতা

ছিল না। তাঁর লেখাতে কোনো গভীর কল্পনাশক্তির পরিচয় খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে। খুবই সামান্য সম্বলের ওপর নির্ভর করে, অনেকটা দূরের পথে পাড়ি দেবার উৎসাহই সে ভ্রমণকাহিনীর প্রধান আবেদন। তিনি কোথায় কী জনশ্রুতি শুনেছিলেন, কোন্ গ্রামে কোন্ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করেছিলেন, অল্প মূল্যে কোন্ চটিতে বা ধর্মশালায় কী রকম আহার্য পেয়ে তিনি কতো সুখী হয়েছিলেন, যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থ-ভ্রমণে' সেই সব খবরই প্রধান খবর। খবরের এলাকা পেরিয়ে সাহিত্যের নিজস্ব এলাকায় নিজের অভিজ্ঞতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেবার সামর্থ্য ছিলনা তাঁর।

শরতের সূর্যালোকে প্লাবিত পরিপূর্ণ একটি ছুটির দিনে নিজের মনকে যদি কেউ বাংলায় লেখা ভ্রমণ-সাহিত্যেই উৎসর্গ করতে চান, তাহলে অবিশ্যি যদুনাথের এই 'তীর্থভ্রমণ' বা আরো অনেক আগেকার আমলের বাংলা পদ্য-রচনা—বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' পড়বার দরকার নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো তাঁর অজস্র ভ্রমণকাহিনী লিখে গেছেন! 'তীর্থমঙ্গল' বড়োই সেকেলে লেখা। সেটা পলাশীর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ের কথা। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' সেখান থেকে অনেক দূরের রাজ্য!

আঠারো শ' একাশি খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষ দিকে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। তার আগেই 'ভারতী'তে সে-সব পত্র ছাপা হয়েছিল। বছর দশেক পরে আঠারো শ' একানব্বই খ্রীষ্টাব্দে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী'র প্রথম খণ্ড বের হয়,—আঠারো শ' তিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল দ্বিতীয় খণ্ড। ইতিমধ্যে তাঁর ছোটো ছোটো আরো কিছু কিছু ভ্রমণ-কথা বেরিয়েছে। প্রধানতঃ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা তাঁর পত্রসংগ্রহ 'ছিন্নপত্র' বেরিয়েছিল 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে একই বছরে—উনিশ শ' বারো খ্রীষ্টাব্দে। এই দু'খানি বইয়েতেই ভ্রমণের আনন্দ-স্বাদ বর্তমান। তারপর উনিশ শ' উনিশ খ্রীষ্টাব্দে 'জাপান যাত্রী'—উনিশ শ' উনত্রিশে 'যাত্রী',—একত্রিশ সালে 'রাশিয়ার চিঠি',—ছত্রিশ সালে 'জাপান যাত্রী' সমেত তাঁর 'জাপানে পারস্যে',—উনিশ শ' আটত্রিশ সালে তাঁর পত্রসংকলন 'পথে ও পথের প্রান্তে' এবং তার পরের বছর 'পথের সঞ্চয়' ছাপা হয়। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' বা 'শান্তিনিকেতন' রচনাবলীতেও তো ভ্রমণেরই আনন্দ। মানুষের মনোরাজ্যের দেশ-দেশান্তরের ইশারা তাঁর প্রত্যেকটি লেখাতে। 'বিশ্বপরিচয়' কি কেবলই বিজ্ঞানের তথ্যবর্ণনা? 'সানাই' কি শুধুই কবিতা? একটু ব্যাপকভাবে দেখলে সাহিত্য মাত্রই যে একরকম ভ্রমণের সুযোগ, তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিশেষভাবে দেশ ভ্রমণের প্রসঙ্গ মনে রাখলে, সেকালের 'তীর্থমঙ্গল'-কেও বাংলা সাহিত্যে দূরযাত্রার বিবরণ হিসেবে মানতে হয়।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সে-বইখানিও ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। তের শ' বাইশ সালে সে সংস্করণ ছাপা হয়।

ইছামতীর তীরবর্তী নোনাগঞ্জের সন্নিহিত ভাজনঘাটে 'তীর্থমঙ্গল'-এর কবি বিজয়রাম সেনের নিবাস ছিল। জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের আশ্রিত ছিলেন তিনি। ঘোষাল মশায়ের কাশী ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে দিঘা-গ্রামের গদাধর এবং ইন্দ্রনারায়ণ নামে দু'জন ব্রাহ্মণ ছিলেন,—কবি বিজয়রাম সেনও ছিলেন। স্বপ্নলব্ধ কাব্য-প্রেরণা প্রচারের মধ্যযুগীয় প্রথাটি মেনে নিয়ে, বিজয়রাম তাঁর এই কাব্য-রচনার কারণ নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সে-সব কথা একালের পাঠকের কাছে খুবই কৌতুকপ্রদ মনে হবে। তিনি বলেছিলেন :

খিদিরপুরেতে ধাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নাম।
তাঁরে সদয় হৈলা কাশীনাথ।
একদিন নিশিশেষে বসিয়া ঘোষাল পাশে
স্বপনেতে কহিলেন বাত
তুমি মোর ভক্তজন কর মোরে প্রপূজন
তবে হবে সকল কল্যাণ।

এ কথা মধ্যযুগের সমস্ত মঙ্গলঠাকুরের কথা! বিজয়রাম সেই প্রথাই মেনে নিয়েছিলেন। তবে, তাঁর ঠাকুর কোনো মঙ্গলঠাকুর নন,—তিনি কাশীনাথ! এইটুকুই ব্যতিক্রম!

পলাশীর যুদ্ধ তার কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়েছিলেন। লর্ড ক্লাইভ ছিলেন সেই কোম্পানির সে-আমলের লাট। ১৭৬৭-র জানুয়ারি মাসে ক্লাইভ যখন বিলেতে যান, তখন তাঁর শূন্য পদ পূরণ করেন হ্যারি ভেরেলেষ্ট। ১৭৬৭-র ২৭-এ জানুয়ারি থেকে ১৭৬৯-এর ২৬-এ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানির অধীনে—সেকালের বাংলা দেশের শাসন-কর্তা ছিলেন ভেরেলেষ্ট। গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ছিলেন তাঁরই দেওয়ান। গোকুলচন্দ্রের বড়ো ভাইয়ের নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল। তাঁদের পিতার নাম কন্দর্প ঘোষাল। গোবিন্দপুর অঞ্চলে তিনিই প্রথম বাড়ি করেছিলেন ইংরেজের ফোর্ট-উইলিয়ম তৈরির সময় তিনি গোবিন্দপুর এলাকা থেকে গড়্যা-বেহালা অঞ্চলে,—সেখান থেকে আবার খিদিরপুর অঞ্চলে উঠে গিয়েছিলেন। কন্দর্প ঘোষালের বড়ো ছেলে কৃষ্ণচন্দ্রও অনেক টাকা উপায় করেছিলেন। এই ঘোষাল পরিবারেরই উল্লেখ দেখা যায় বিজয়রামের কবিতায় :

দেওয়ান গোকুল ঘোষাল বাঙ্গালাকা খামেদ
উস্কো ভাই কেষণচাঁদ নাহি ভেদাভেদ।

এ সবই সুদূর অতীতের কথা। দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশের গভীর এবং ব্যাপক কোনো কোনো বিশেষত্ব উপলব্ধির উদাহরণ দেখা যায় আরো আধুনিক ভ্রমণ-কাহিনীতে। দেবেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে আসে এই সূত্রে। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতের মধ্যে তাঁর অন্তর্মুখী এবং চির-ভ্রাম্যমাণ হৃদয়ের গভীর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবুকতা এবং অন্তর্দৃষ্টির কথাও মনে পড়ে যায়। তিনি হিন্দু দার্শনিক মনের এই বিশেষ স্বভাবটি লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁরা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যের দিকে যেতে যতোটা অভ্যস্ত, বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে সামান্য সত্যের দিকে এগিয়ে যাবার মনোধর্মে ততোটা সমৃদ্ধ নন। এ-অবস্থার দুটি কারণ তিনি নিজেই দেখিয়েছিলেন: 'প্রথমতঃ এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্তাধিক্য হেতু আমাদিগকে কর্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তাপ্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূর দেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। প্রাচীনকালে এদেশে যাঁরা সমুদ্রযাত্রায় বা দূর ভ্রমণে যেতেন, তাঁদের মধ্যে নাকি বণিকের সংখ্যাই বেশি ছিল। বণিকের বিবরণ 'অত্যুক্তিপূর্ণ ও কাল্পনিক'—বলে গেছেন বিবেকানন্দ। সেই সূত্রে স্বামীজীর এই নির্দেশটিও পাওয়া গিয়েছিল: 'আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে! আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে।'

কিন্তু বিবেকানন্দের ভ্রমণকথা শুধুই তত্ত্বকথা নয়। শিকাগো থেকে আঠারো শ' চুরানব্বই খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি যা বলেছিলেন, তারই কিঞ্চিৎ এখানে তাঁর নিজস্ব রীতির উদাহরণ হিসেবে তুলে দেওয়া যেতে পারে: 'এদেশে যেমন গরম, তেমনি শীত। গরমি কলকাতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু'হাত তিন হাত, কোথাও চার-পাঁচ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই। বরফ তো ছোটো জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর বত্রিশ থাকে, তখন বরফ পড়ে।...'এবং এই ধরনের শীত-গ্রীষ্ম বর্ণনার মধ্যেই তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল যে, আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করলে একথা মানতেই হয় যে,—'কোনও একটা নূতন জিনিস কোনও দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ নেই 'আর্য' বংশ!'

উনিশ শ' পনেরো খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' ও 'আমার বোম্বাই-প্রবাস'-এর মধ্যে বিশুদ্ধ ভ্রমণসুখই বরং প্রাধান্য পেয়েছিল। বাল্যকথাতে তিনি মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে ছেলেবেলায় কোনো এক দিন 'বোট্যানিক্যাল গার্ডেন'-এ বেড়াতে যাবার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে গেছেন। গঙ্গায় তাঁদের নৌকো উল্টে

গিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ সাঁতার জানতেন, কিন্তু, মনোমোহন জানতেন না। অনেক দুর্ভোগের পরে দু'জনে রক্ষা পেয়েছিলেন সেদিন!

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুদূর বিদেশে পৌঁছে,—আঠারো শ' বাষট্টি খ্রীষ্টাব্দে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। 'বাল্যকথা'র মধ্যে প্যারি, জেনেভা, লণ্ডনের খুবই ছোটো ছোটো রেখাচিত্র রেখে গেছেন তিনি। আর, 'বোম্বাই প্রবাস'-এর মধ্যে বোম্বাইয়ের ছবি তো আছেই,—তাছাড়া, আহমেদাবাদ, পুনা, সোলাপুর, বিজাপুর ইত্যাদি অঞ্চলেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে পুরোনো ইতিহাসের উল্লেখ,—বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সমাজ-পরিচয়—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার বর্ণনার দিকেও তাঁর ঝোঁক দেখা গেছে।

মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে এই সব বিভেদের প্রসঙ্গ থেকেই একেবারে হাল আমলের বই—সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'র কথা মনে পড়ে। তের শ' আটান্ন সালের আশ্বিন মাসে সে বই প্রথম প্রকাশিত হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর পরিদৃশ্যমান এই বহির্জগতে যে কোনো দুটি জায়গার মধ্যে বাইরের ব্যবধান বা স্থানগত দূরত্ব বেশি না থাকলেও মনোজগতের মানচিত্রে তারই মধ্যে যে সুদূর পার্থক্য ঘটতে পারে, সে কথা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: 'গোমড়ামুখো ইংলণ্ড থেকে এসে ফ্রান্সে পা দিলেই মনে হয় যে, একটা নূতন জগতে এসে পৌঁছেছি। ক্যালে-ডোভার-এর মধ্যে দূরত্ব মাইল বিশেক হবে। কিন্তু এই দুই জায়গার লোকের মনের গড়নে তফাৎ কলকাতা আর ত্রিবান্দ্রমের লোকের পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি।' সতীনাথ ফরাসী দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ! অবিশ্যি ফরাসীদের আত্মগৌরবের মধ্যে মাত্রাজ্ঞান খুঁজতে যাওয়া যে নিতান্তই পণ্ডশ্রম, সে-কথাও কবুল করেছেন তিনি। তারপর ইটালির প্রবাদ স্মরণ করেছেন: 'নেপলস দেখে তবে মরুন'! এবং ইটালি সম্বন্ধে তাঁর কথা এই যে—'দক্ষিণ ইটালির হাওয়ায় একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব আছে। বলে বুঝোনো যায় না, কিন্তু কেমন যেন কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শীতের দেশে যেমন খিদে বেশি পায়, এখানে তেমনি বেশি পায় অনির্দিষ্ট ভাবনা।'

বার বার এইরকম নানা চমকপ্রদ মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য এবং শিল্পের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ঘটতে দেখে, এই সূত্রে দেবেশ দাশের 'ইউরোপা'র কথা মনে পড়তে পারে। দেবেশ দাশের 'ইউরোপা' আরো আগেকার রচনা বটে,—তবে 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'র সঙ্গে সে লেখার মিল অনুভব করাও সত্যিই অনিবার্য। এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' থেকেই বোধ হয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের ভ্রমণ-কথা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে, রবীন্দ্র-রীতির প্রভাবেই এ-ধারা এগিয়ে চলেছে, সন্দেহ নেই। এবং সে-ধারায় অন্নদাশঙ্করই প্রথম আধুনিকতর লেখক।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিচিত্র ইতিহাস-ভূগোলের কথা বলতে ভালোবাসেন বটে, কিন্তু তাঁর রীতি অন্য রকম। তাঁর লেখার মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণ ভাবে বোধ হয় এ-কথা বললে অন্যায় হবে না যে, তিনি এ-রকম সরস কল্পনার ধার ধারেন না। যা বলেন, তা যেন বহুতথ্যাধিকারী একজন বিদ্বান মানুষের মতোই বলতে ভালোবাসেন। দিলীপকুমার রায়ের লেখা ভ্রমণ-সাহিত্যের পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে এঁদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের আলাদা আলাদা দু'রকম বিদ্যাবত্তার প্রভেদ বোঝা যাবে। যেমন তাঁর 'তীর্থংকর'-এ, তেমনি তাঁর 'দেশে দেশে চলি উড়ে' নামক ভ্রমণ-কাহিনীতে, দিলীপকুমার যেমন দৃশ্যের প্রেমিক, তেমনি আবার মনোরাজ্যের আবিষ্কারেও নিত্য-উন্মুখ। তাঁর চলা যতোটা বাইরের মাটি, জল, আকাশ ছুঁয়েছুঁয়ে,—ঠিক ততোটাই,—কিংবা হয়তো তারও বেশি তাঁর মনোজগতেরই পরিক্রমা!

•

বাংলা সাহিত্যে দূরযাত্রী মনের চিহ্ন গদ্যে-পদ্যে এইভাবে নানা লেখকের নানান্ রচনায় ছড়িয়ে আছে। সেকালের সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও যেমন, একালের প্রবোধকুমার সান্যাল কিংবা সৈয়দ মুজতবা আলীও তেমনি তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে পাঠকের মনকে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্তের অসামান্য এই পৃথিবীর সৌন্দর্য আস্বাদনের সুযোগ দিয়েছেন। গল্প-উপন্যাসের স্থান-কাল-সমাবেশের মধ্যেও এই দূর-বাসনার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-তে,—বনফুলের 'মৃগয়া'য় বা 'লক্ষ্মীর মর্তে আগমনে',—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশে',—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এ বা 'ইছামতী'তে—এবং নবীন প্রাচীন নানা লেখকের এই ধরনের আরো নানান্ গল্পে-উপন্যাসে পথে বেরিয়ে পড়বার আশ্চর্য তাগিদ অনুভব করা গেছে। আর বিশুদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীর কথাই যদি ধরতে হয়, তাহলে লেখকরা তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার খাদ মেশাবেন কি মেশাবেন না, সে-প্রশ্ন সত্যিই কতকটা অবান্তর বলে মনে হয়। জলধর সেনের 'হিমালয়' কিংবা প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' পড়বার সময়ে মন যে নিঃসন্দেহে ছুটির আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়, সেইটেই সর্বাধিক প্রাপ্তি।

বাংলা গল্পের প্রসঙ্গে

১৩৬১ সালে ৭ই শ্রাবণ তারিখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্ব-নির্বাচিত গল্প-সংগ্রহের ভূমিকা লিখেছিলেন। সেই ভূমিকার মধ্যে সাহিত্যিকের নিজের নিকট-কালের কথাও ছিল, আবার চিরকালের কথাও ছিল। আমাদের সাম্প্রতিক বাংলা

গল্পচর্চার নানান্ নমুনার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর সেই লেখাটির কথা মনে এলো। তাতে 'দেশের বিশেষ কোনো অবস্থার সূত্র ধরে' গল্প নির্বাচনের আধুনিক রেওয়াজের উল্লেখ ছিল এবং শুধু উল্লেখই নয়, তাতে একটু সমালোচনাও ছিল। ১৩৬১-তে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বাইশ-তেইশ বছর পূর্ণ হয়। এই সুদীর্ঘ বাইশ-তেইশ বছরের মধ্যে দেশের পটভূমি অনেকভাবে বদলেছে। সেই সত্যের উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন, 'কাল-প্রধান কাহিনী গল্প ইতিহাসের উপাদানের মূল্য ছাড়া অন্য সকল মূল্যই হারিয়ে বসে। সেকাল, একাল—অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড কাল নিয়ে চিরকাল বা মহাকাল। মহাকালের মধ্যে বা চিরকালের মধ্যে আছে একটি চিরন্তনীর সূত্র। সে সূত্র ইতিহাস নয়, ইতিহাস সূত্রে গাঁথা শুকনো ফুলের ঝরে যাওয়া পাপড়ি। সূত্রটি হচ্ছে জীবনের সুখ ও দুঃখের—হাসি ও কান্নার মধ্য দিয়ে চাওয়া ও পাওয়া, পাওয়া ও হারানো, হারানো ও খোঁজার, পাওয়ার মধ্যেও না পাওয়ার, না পাওয়ার মধ্যেও অনন্ত তৃপ্তির বিচিত্র কথার সূত্র। সে সূত্র ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না—অর্থাৎ তাকে হাজির করা যায় না চোখের সামনে কিন্তু উপলব্ধি করা যায়।' এই বলে তিনি তাঁরই প্রসিদ্ধ 'তারিণী মাঝি' গল্পটির নাম করেছিলেন। সে গল্পের পটভূমি ছিল সেকালের ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা হড়পা বান, কিন্তু তার প্রধান লক্ষ্য ছিল তারিণীর সুখ-দুঃখ রূপায়ণের দিকে। তাই তিনি লিখেছিলেন, 'তারিণী মাঝি গল্পের পটভূমি ময়ূরাক্ষীর বন্যার বর্ণনা আজ ইতিহাসের উপাদান হয়েছে। পরের কালের মানুষ ময়ূরাক্ষীর বন্যার বর্ণনার মধ্যে অনেক গরমিল দেখে বিস্মিত হবে। কিন্তু গল্পের মধ্যে তারিণী মাঝি এমনই প্রাণবান—তার সুখ-দুঃখ এমনই চিরকালের সুখ-দুঃখ, যে, তাকে অতি চেনা কাছের মানুষ বলে মনে হবে।'

কেবল 'তারিণী মাঝি'তেই নয়,—পটভূমি বা উপাদানবস্তুকে প্রাথিত এক-একরকম আবেদনের মধ্যে বিলীন হতে দেবার সাধনাই হোলো জগতের সমস্ত সার্থক গল্প-উপন্যাসের সাধনা।

তাঁর 'ময়দানব'-এর কথা মনে পড়ছে। বাংলার যেসব জেলা এখন বেহারের মধ্যে ঢুকেছে, সেইরকম এক কারখানা-প্রধান অঞ্চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯১৯-২০ সালে ফণী মিস্তিরি এক কলিয়ারির কামারশালায় হাতুড়ি পেটা কাজ শুরু করেছিল। চার বছর পরে মালিকের সুনজরে পড়ে সে হোলো ছোটো মিস্ত্রী। তারপর আরো দিন যায়, চারদিকের পটভূমি আরো বদলে যায়। সে সব কথা গল্পের মধ্যে খুবই বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। চাকরিতে ফণীর উন্নতির কথা,—তার অভিজ্ঞতার আরো নানা দিক,—মালিক, ম্যানেজার, বুড়ো এনায়েৎ মিস্তিরি,—রানীগঞ্জ যাওয়া-আসার খবর,—কারখানার যন্ত্রপাতির সঙ্গে তার আন্তরিক মমতার

যোগ,—এমনকি 'হোল্ডিং নাট বোল্ট'কে সে যে 'হরিনারান বল্টু' বলতো, হাতুড়িকে বলতো 'হাম্বার'—তার কাছে 'বেল্‌টিং'-এর প্রতিশব্দ যে 'ফিতা',—শ্যাফ্‌ট—শাপ্টু,—ট্রলি—টালি, ভাল্‌ভ—ভালবু, গেজ কর্ক—গজ কাক ইত্যাদি বিবরণ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তুগত নানা কথা সেখানে খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলা হয়েছিল। ১৯৩০ সালের স্বদেশী হাঙ্গামার সময়ে খদ্দর পরা,—দোকানে মদ কেনা বন্ধ হয়ে গেলে নদীর ধারে তার মদ চোলাইয়ের উল্লেখ—আরো পরে, সে-হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে কারখানায় ধর্মঘট শুরু হবার কালান্তর,—তারই নিজের হাতে গড়া ছোক্‌রা মিস্তিরি তুলু সিংগীর নতুন ধরনের কথাবার্তা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিচিত্র প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ কায়িক শক্তি থেকে বাষ্প-শক্তির আবির্ভাব এবং তা থেকে কারখানায় বিদ্যুৎ শক্তির প্রচলন-কালের দিকে এগিয়ে গেছে তাঁর সে গল্পের প্রবাহ। ফণী মিস্তিরির বয়স বেড়েছে এইসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই। গল্পের শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে দেখা যায় যে, তার সাহায্য না নিয়ে তারই পরিশ্রমে গড়া কারখানা বিদ্যুৎ-শক্তিতে দিব্যি চলছে দেখে প্রৌঢ় ফণীর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়। এবং গ্রাইণ্ডিং মেশিনের বড়ো বড়ো চাকার সুতীক্ষ্ণ দাঁতে বেধে গিয়ে ফণীর জীবনান্ত ঘটে যায়! গল্পটির ঘটনাংশ এইভাবে শেষ হবার পরেও গল্পকার বলে যান—'মেশিন চলছে স্বচ্ছন্দে, শব্দের মধ্যে কান পেতে শুনলে বোধ হয় ফণীর মোটা গলার গান শোনা যাচ্ছে।'

উপকরণ যতোই বিচিত্র হোক না কেন, পাঠকের মনে যতক্ষণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে বিধৃত আমাদের এই মানব-জীবন সম্বন্ধে অবিস্মরণীয় কোনো গান না জাগে, ততক্ষণ উপকরণের বিশেষ কোনো দাম নেই। গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে আমাদের তরুণতম, সাম্প্রতিকতম গল্পকারদের যেসব গল্প ছাপা হয়েছে, সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার এখনো সময় আসে নি। শোনা যায় যে, এইসব লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নতুনতর সার্থকতার লক্ষণ ইতিমধ্যেই কারো কারো নজরে পড়েছে। তাঁদের পরিণতি সম্বন্ধে পাঠকের প্রতীক্ষা এবং সমালোচকের আগ্রহ, দুইয়ের কোনটিই কম নয়। সকলেই নতুন ভালো গল্পের জন্যে আশা করে আছেন। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'উত্তরা' ইত্যাদি পত্রিকায় বছর তিরিশেক আগেকার যে-সব গল্পভঙ্গি দেখা গিয়েছিল, এ সময়ে সেই সব পুরোনো নমুনার কথা ভেবে দেখার প্রস্তাব অবান্তর নয়।

রবীন্দ্রনাথ এবং প্রভাতকুমারের প্রসাদে বাংলা সাহিত্যে প্রথম যে গল্প-উদ্দীপনার যুগ এসেছিল, তারপরে 'সবুজ পত্র' যদি আমাদের দ্বিতীয় উদ্দীপনায় পৌঁছে দিয়ে থাকে, তাহলে 'কল্লোল' এবং তৎ-সন্নিহিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকার গল্পকারদেরই তৃতীয় পর্বের ধারক-বাহক বলতে হবে। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, প্রবোধকুমার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি

সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃনামাবলীর পরে আরো এ কালের যেসব প্রতিষ্ঠিতের নাম মনে আসে, তাঁদেরও মতামত এবং প্রবণতা এখন মোটামুটি সুচিহ্নিত। ইতিমধ্যে নবীনতম, সাম্প্রতিকতম লেখকরা এসে আসরে প্রবেশ করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-পর্বের প্রথম গল্পলেখক বলে এঁরাই যথাকালে ইতিহাসে সূচিত হবেন। পটভূমি এবং বহির্ঘটনার অনেক রকম ভাঙা-গড়া বা রদ-বদল পেরিয়ে ছোটোগল্পের স্রোত এখন আমাদের প্রথম শতকার্ধ-সীমাও অতিক্রম করেছে। 'ভূতের গল্প', 'হাসির গল্প', এমন কি 'প্রেমের গল্প'ও আজকাল তেমন চোখে পড়ে না। চমকপ্রদ প্লটের আগ্রহও যেন কমে এসেছে। তবু, ব্যতিক্রম আছে বৈকি! তবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থানভূমির ওপরেই লেখকদের এখন নজর বেশি পড়ছে বলে মনে হয়। এ সময়ে অতীতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মনকে সজাগ রাখা দরকার। কারণ, অতীতই বর্তমানকে ভবিষ্যতের পথ দেখাতে পারে; তাই, ঐতিহ্যের কথা ভাবা দরকার।

বহির্জগতের ঘটনাস্রোত নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে। গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার, ইত্যাদি সব রকম সাহিত্য-প্রয়াসীর মধ্যে বেশির ভাগই ব্যস্ত আছেন এই পরিদৃশ্যমান পরিবেশের খবর সরবরাহের কাজে। অতি অল্পসংখ্যক লোকই গভীরের প্রত্যাশী। সত্যিকার বড়ো লেখকরাই সেই গভীরের সাধক! তাঁরা আমাদের চেনা-জানা সাধারণ মানুষদের মধ্য দিয়েই অচিনের সঙ্গে আমাদের যোগ ঘটিয়ে দেন। আদর্শকে যাঁরা কাছের পরিমণ্ডলে এনে, চেনা সাজসজ্জায় প্রকাশ করে, আমাদের সমবেদনার ঘনিষ্ঠ হতে দিতে পারেন, তাঁরাই নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর গল্পকার। গল্পের নানান ভঙ্গি, নানান রূপভেদ। প্রত্যেক যুগেই নতুন এক-একদল লেখক এসে কিছু-না-কিছু নতুন ভঙ্গি বা কৌশল বা মতামত প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে থাকেন। আমাদের এই গত পাঁচ-দশ বছরের মধ্যেও সে প্রয়াস ঘটেছে। 'কল্লোল' পর্বেও সেইরকম ঘটেছিল। তখনকার বিষয়, ভঙ্গি এবং বক্তব্যের সঙ্গে এখনকার পটভূমি-সচেতন আধুনিকতার বিস্তৃত তুলনার দরকার নেই। তবে পুরোনো অভিজ্ঞতা পাঠকদেরও মনে পড়ে, লেখকরাই কি সব কথা ভুলতে পারেন?

১৩৩৩ সালের বৈশাখ থেকে 'কালি-কলম' মাসিক পত্রিকা বেরুতে থাকে। ১৩৩৪-এর আশ্বিন সংখ্যার 'কালি-কলমে' শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পত্র-চিত্র' নামে যে লেখাটি ছাপা হয়েছিল, সেটিকে গল্পের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। পত্রিকার ৪১১ থেকে ৪১৪ পৃষ্ঠার মধ্যে, তিন পৃষ্ঠারও কম জায়গা নিয়ে তাঁর সে লেখাটি ছাপা হয়। তার আরম্ভটা ছিল এই রকম:

'কাল নিজেই পোষ্টাপিসে গিয়েছিলাম। রূপ-গাঁর সেই ছোট পোষ্টাপিসটি।

এখনও তেমনি আছে। পরিবর্তন বিশেষ কিছুই হয় নাই। তবে ভাঙা দেওয়ালটাকে আশ্রয় করিয়া লাউ গাছের একটি লতা উঠিয়াছে, আর পুরানো পোষ্টাপিসের ভাঙা ঘরখানি এখনও পড়িয়া যায় নাই—তালপাতার ছাউনি দিয়া কোন রকমে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। পিয়ন বলিল, 'যাবেন না ওদিক। মাষ্টার মশায়ের ফিমেল কোয়ার্টার'। কিন্তু অতদূর যাইবার প্রয়োজন হইল না; ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে স্পষ্ট দেখা গেল, মাষ্টার মশায়ের গৃহিণী উঠানে খাট পাতিয়া রোদে পড়িয়া আছেন, মাথায় একটা লাল রঙের গামছা বাঁধা। সম্ভবত জ্বর আসিয়াছে। আর তাহারই পাশে পাঁচ-ছ' বছরের ঘাঘরা পরা একটা মেয়ে ছোট একটা বাছুরের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।'

এই পোষ্টমাষ্টারের জীবন এবং তাঁর গৃহস্থালি সম্বন্ধেই গল্পকারের প্রধান আগ্রহ ছিল বলে প্রথমটা মনে হয় বটে। কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, হাতে গরুর দড়ি, দড়ির অন্যপ্রান্তে একটি গরু, কালো রঙের ভুঁড়িওয়ালা যে বেটে মানুষটির সঙ্গে গল্পের পাঠক এ রচনার প্রথম কয়েক লাইনের মধ্যেই পরিচিত হবার সুযোগ পেতে পারেন, গল্পটির আসল কথক কিন্তু পুরোপুরি সেই মানুষটির সম্বন্ধেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তিনি এই গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টার এবং তাঁর আপিসের আলকাতরা-মাখানো কপাট, দড়ির খাটিয়া ইত্যাদি সাজসজ্জা আসবাবপত্রের দিকে যদিচ চোখ রেখেছিলেন, তবু ভেতরে ভেতরে তাঁর মন পড়েছিল বিশেষ দুটি স্বার্থ-চিন্তার মধ্যে—'তোমার চিঠিখানি ছাড়া আমার আর কোনও চিঠিই ছিল না। কিন্তু রেজিষ্ট্রি দুটি যদি আজ না করিয়াই ফিরিয়া যাইতে হয়, সোমবার দিন আবার আমাকে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হইবে।' ডাকঘরে তিনি চিঠি নিতেও এসেছিলেন। চিঠি ডাকে দিতেও এসেছিলেন। শনিবার দুপুরের পরে আপিস বন্ধ হয়ে যাবার ফলেই এই আগন্তুক পোষ্টমাষ্টারের জীবন সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। সেই কারণেই এ গল্পে সেই মানুষটির ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পরিচয়ের দু-একটি তথ্য প্রবেশ করেছিল। পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রীর অসুখ, প্রতিবেশীর অ-প্রীতি,—তাঁর আত্মকথা সূত্রে: 'পুত্তু ছ'টি আর কন্যে ছ'টি',—'পঁচিশটি টাকা মাইনেয় আর কত চালাই বলুন',—'তুঁদুলের বাবুরা বড় ভাল লোক মশাই' ইত্যাদি নানা কথা এসে পড়েছিল। কিন্তু আগন্তুকের আসল আগ্রহ ছিল অন্যদিকে। সেই অন্য দিকটির ইশারা ফুটেছিল লেখাটির শেষ দিকে:

'তোমার চিঠিখানি পকেটে রাখিয়াছি কিনা দেখিয়াই উঠিয়া পড়িলাম।

সেইখানে দাঁড়াইয়াই চিঠিখানি পড়িতে পারিতাম, কিন্তু পারিলাম না—পাছে শেষ হইয়া যায়!'

গরীব গৃহস্থের দিকে অথবা সাধারণ মানুষের খুবই সামান্য অবস্থার দিকে তখন

আমাদের গল্প-লেখকদের আগ্রহ ফুটে উঠেছিল। তারাশঙ্কর বাবু যাকে 'পটভূমি' বলেছেন, সেকালের সেই আগ্রহও যে প্রধানতঃ আমাদের পটভূমিরই নতুনত্ব-সন্ধান, সেকথা বলতে এখন আর আপত্তি হবে কেন? একালেও পটভূমির খোঁজে কেউ যান নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলে, কেউ বা আন্দামানে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মার পটভূমি নিয়েছিলেন, সমরেশ বসু নিয়েছেন গঙ্গার। সমরেশ বসু, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় ইত্যাদি একালের প্রতিষ্ঠিতদের দেখাদেখি আরো অনেকেই যে আরো বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিত রচনার অভিপ্রায়ী হবেন, সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জেগুয়াব' গল্পটি মনে পড়ছে। তার আরম্ভটা এই—'যুদ্ধপূর্ব যুগে আন্দামান বলতে পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলের বিভীষিকার কথাই আমরা আগে বুঝতাম। কিন্তু আজ আর আন্দামান দ্বীপ বন্দীদের উপনিবেশ নয়। এখন সরকারী কাজে, জীবিকার খোঁজে বহুলোকের এখানে পদপাত ঘটেছে। আর এসেছে বাঙলার নিরাশ্রয়ী নরনারীর দল নিশ্চিত আশ্রয়ের খোঁজে।' সেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য জারুয়াদের কথাও তাঁর এ-গল্পের মধ্যে জায়গা পেয়েছে। বাঙালার ভাগ্য পরিবর্তনের ঐতিহাসিক এক সন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। পূর্ব-পশ্চিমের বিচ্ছেদ তো ঘটলোই, তাছাড়া বড়ো মাথার এবং বড়ো নেতৃত্বের দাবিও এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। এ সময়ে ভেতরের মনস্তরঙ্গ খুবই প্রবল হবার কথা। সাধারণ মানুষের মন যদিও সে-সব তরঙ্গ সম্বন্ধে তেমন সজাগ নয়, তবু শিল্পীর মন সে-বিষয়ে জাগ্রত থাকবে বলেই আশা করা উচিৎ। অবিশ্যি সব যুগেই কিছু কিছু অনুকরণ ঘটে থাকে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস—সব ক্ষেত্রেই তা দেখা যায়। 'কল্লোল' পর্বেও তা ঘটেছিল। কবিতার কথা মনে রেখেই একটু নমুনা দেখা যাক :

দূর দিগন্তে চলে গেছে কোথা খুশবোজী মুসাফের !
কোন সুদূরের তুরাণী প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে !
দীর্ঘ দিবস বয়ে গেছে যারা হাসি অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের রোজা !
আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয়নি যে হায় দেখা
পরাণে কখনো জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে এ লেখা নজরুল ইসলামের, কিন্তু এটি লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৩৩৩ সালের 'কালি-কলম'-এ প্রকাশিত এই কবিতার নাম ছিল 'শেষ শয্যায়'। কবিতায় তখন নজরুলের ব্যাপক অনুকরণের ঢেউ এসেছিল।

গল্পে তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', শৈলজানন্দের 'যুদ্ধের ইতিহাস' ইত্যাদি কথা-সাহিত্যের খ্যাতি; প্রবন্ধে সাহিত্য-কথা বলতে গিয়ে মহেন্দ্রচন্দ্র রায় লিখেছিলেন 'সাহিত্যে পতিতা',—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'নর-নারী'। সেই বছরের 'কালি-কলম' থেকেই এই লেখাগুলির উল্লেখ করা হোলো। সৌম্যেন্দ্রনাথ অবিশ্যি তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে কোনো তীব্র বিরাগ, বিদ্রোহ বা বিদ্বেষের কথা বলেন নি। তাতে অতিরিক্ত নীতিবোধের অসামঞ্জস্যও দেখা দেয়নি। উদার আধ্যাত্মিকতার সুরেই তিনি বলেছিলেন—'ভোগ করবো ভোগের অতীত কোনো লক্ষ্য নিয়ে। ত্যাগ করবো কেবলমাত্র ত্যাগকে একান্ত জেনে নয়, ত্যাগের দিক-চক্রবালের পশ্চাতে উষার নব অরুণোদয়কে মনে রেখে। এ যদি না সম্ভব হয় তাহলে ভোগই বলো আর ত্যাগই বলো সবই কলুষিত হয়ে ওঠে।' সে-সব ঘটনার সুদীর্ঘকাল পরে, অপেক্ষাকৃত হাল আমলে বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' বেরুলো। একালের প্রসিদ্ধ এই নামটি কিন্তু সেকালে প্রথম প্রেমেন্দ্র মিত্রই ব্যবহার করেছিলেন। ১৩৩৩-এর শ্রাবণের 'কালি-কলম'-এ প্রকাশিত তাঁর একটি গল্পের শিরোনাম ছিল এটি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সায়েব বিবি গোলাম'-এর বিষয়টা এই: চারু আর চারুর স্ত্রী শচী, এই দুটি মানুষের সংসারে তাদের ছোট মেয়েটির অসুখের সময়ে হঠাৎ ডাক্তার ডাকবার দায়ে রাস্তার লোক গণেশকেই অনুরোধ করতে হয়েছিল। সেই সূত্রে সে পরিবারে গণেশের প্রথম প্রবেশ। অতঃপর বছর কেটে গেছে এবং ইতিমধ্যে পালেদের সংসারে গণেশ বেশ সয়ে গেছে। কিন্তু দশ বছর পরে এমন কেলেঙ্কারি সে যে করে বসবে,—তা' কে জানত? সেদিন গণেশ তাঁদের খাওয়াবার আয়োজন করেছে। রান্নাঘরে বসে বৌদির কাছে লুচি বেলা শিখে নিচ্ছিল সে। 'জায়গা নেই, গায়ে গা ঠেকছিল। শচীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের একটা দিক উনুনের আঁচের আভায় লালচে দেখাচ্ছিল। লুচি বেলার সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশি-মাকড়ির ভেতরের তারা স্বল্পালোকে চিক্‌চিক্ করছিল।' বাইরে সেই নৈকট্য এবং ভেতরে গণেশের মনের দশ বছরের সুতীব্র আগ্রহ হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটিয়ে তুললো! গল্পের সেই অংশটুকু মূল থেকেই তুলে দেওয়া যাক:

'নির্জন নিস্তব্ধ ঘর! শচীর চুড়িগুলি শুধু হাতের দোলায় মৃদুভাবে বাজছিল রিন্ ঠিন্! অত্যন্ত নিকটে মাথার খোঁপা থেকে একটা অস্পষ্ট গন্ধ আসছিল। মনে হচ্ছিল দেহের স্পর্শটি যেন তরল সুরার মত সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

'হঠাৎ গণেশ দীর্ঘ কদাকার বাহু দিয়ে শচীকে সবলে বুকের ভেতর টেনে চেপে ধরল।

'ব্যাপারটা অত্যন্ত আকস্মিক! শচী কিছুক্ষণ তার আলিঙ্গনের মাঝে নিস্পন্দভাবে হতভম্বের মত চেয়ে রইল। তারপর তার মুখটা দুহাতে সবলে ঠেলে দিয়ে মুক্ত হয়ে সজোরে বেলুনটা তার কপালে বসিয়ে দিলে।'

'সায়েব বিবি গোলাম' এইখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র আরো চমকপ্রদ স্বাভাবিকতার দিকে গল্পটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। গণেশ চলে গিয়েছিলো। তার লাঞ্ছনার পরিসীমা ছিল না। কিন্তু সেই গণেশকেই আবার বেশ কিছুদিন পরে ফিরিয়ে এনেছিল শচী। অতঃপর চারুও সে প্রত্যাবর্তন মেনে নিয়েছিল। প্রকৃতির দুর্দম প্রতিবাদও যেমন সত্য, তার মার্জনাও তেমনি স্বাভাবিক। গল্পের শচী-চরিত্রে সেই আবেদনই প্রধান হয়ে উঠেছিল!

যথার্থ সামর্থ্য অর্জনের জন্যেই অতীতের সঙ্গে নিজেদের নিকট-কালের রুচি, অভ্যাস, আগ্রহ ইত্যাদি মিলিয়ে দেখাটা লেখকদের আবশ্যিক কর্তব্য। বিদেশের দিকে নজর সেকালেও ছিল, একালেও আছে। সেই সঙ্গে স্বদেশের পূর্বগামী যাঁরা,তাঁদের কীর্তিকলাপও নতুন কালে নতুন ভাবে চোখে পড়তে পারে। সে দিক থেকে বাদানুবাদ বা আলাপ-আলোচনা চলতে দেওয়াটা আমাদের সমকালীন সাহিত্যপত্র-সম্পাদকদের করণীয়। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার এই রকম একটি ঘটনার কথা এইসূত্রে মনে আসছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প সম্বন্ধে তখনকার নবীনরা কথা কাটাকাটি করেছিলেন। ১৩৩৪ সালের ভাদ্র-সংখ্যার 'কল্লোল' পত্রিকায় বাংলা গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু এই সংশয় প্রকাশ করেন যে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে স্থায়িত্বের দাবি হয়তো সত্যিই কম! তার উত্তরে জগদীশ গুপ্ত পৌষ সংখ্যার 'কালি-কলম'-এ লিখেছিলেন—'তাঁহার গল্পগুলিতে যে শান্তশ্রী এবং সরসতা আছে তাহা চিরকাল রসগ্রাহীর উপভোগ্য হইয়া থাকিবে। ··গভীর উদ্দেশ্য লইয়া নিজেকে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া কিংবা কোন অন্তরগত কি ব্যবহারগত সমস্যা লইয়া তিনি অকুতোভয়ে গল্প লেখেন নাই; মানুষের স্বাভাবিক আত্মস্থ অবস্থাটা যাহা চায় তাহাই তিনি তার মনের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। বিশ্ব-সাহিত্য হইতে দান গ্রহণের সার্থকতা আছে; কিন্তু তাহার ভাণ্ডারে দান করিতেছি মনে করিয়া লেখনী চালনার কোন সার্থকতা নাই।'

জগদীশ গুপ্ত সে-সময়ের 'উগ্র আধুনিক'দের কথা মনে রেখেই আরো লিখেছিলেন—'নরনারীর যৌন সমস্যা যে স্বল্প ক্ষেত্রেও এত জটিল এবং পাত্র-পাত্রীর দৈহিক সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ ও বিবাহ-নিরপেক্ষ, তাহা তখনকার দিনে প্রভাতবাবু কল্পলোকে ফুটিতে দেখেন নাই, অথবা দেখিলেও দেখান আবশ্যক মনে করেন নাই। ঐ অপরাধে যদি তাহাকে সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবার প্রস্তাব কেহ কখনো করেন, তবে সাহিত্যের প্রতিই নিদারুণ অবিচার করা হইবে।'

জগদীশ বাবু নিজেও সে-পর্বের 'আধুনিক' ছিলেন। তবু প্রভাতকুমারের গল্প সম্বন্ধে তাঁর এই শ্রদ্ধা দেখে একসঙ্গে দুটি স্মরণীয় বিশেষত্বের কথা মনে আসে। প্রথমতঃ

'কল্লোল'-'কালি কলম' পর্বের বিশিষ্ট, উৎসাহী গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও প্রভাতকুমারের গল্প সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ফুরিয়ে যায়নি; দ্বিতীয়তঃ তাঁর রচনার সন্দেহাতীত বিশিষ্টতা। জগদীশ গুপ্ত সেই বিশিষ্টতার দিকটি ব্যাখ্যা করে, সংক্ষেপে অথচ অকৃপণ-ভাবে জানিয়েছিলেন: 'প্রভাতকুমারের গল্পগুলিতে অবাধ স্রোত আছে, স্বচ্ছন্দ গতি আছে, কৌতুকরসের সুরসাল ফল্গুধারা আছে, আদিতে ও সমাপ্তিতে অপূর্ব সামঞ্জস্য আছে, তাহাদের ছন্দালঙ্কার আর সুরঝঙ্কার আছে, সেগুলি পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি আসে না, ঔৎসুক্য পঙ্গু হইয়া পড়ে না; এবং তাঁহার মানুষগুলি অসাধারণ না হইলেও জীবন্ত।'

জগদীশ গুপ্তের এই মন্তব্যটি কোনো কালেই অচল হবার কথা নয়। গল্পের অবাধ স্রোত একটি আবশ্যিক বিশেষত্ব। আমাদের মনের গ্রাহিকাশক্তির দিকে লেখকরা যদি নজর না রেখেই লিখতে বসেন, তাহলে অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষার নমুনাতেই আমাদের আধুনিক গল্প-সম্ভার নিঃশেষিত হবে। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যার 'বিচিত্রা' তে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের 'জমা-খরচ' গল্পটি ছাপা হয়। 'কালি-কলম'-এর মণিবজ্র ভারতী সে সময়কার বৈচিত্র্যহীন, মৌলিকতাবর্জিত বাংলা গল্প-বন্যার মধ্যে সেটিকে 'আস্ত-আসল প্রাণপূর্ণ লেখা' বলে প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর ২০-এ মাঘ, ১৩৩৪ তারিখের 'পত্র' শুধু এই লেখাটির উল্লেখের জন্যেই নয়, সেকালের সাধারণ বাংলা গল্পের প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়াস হিসেবেও স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন—সেকালের 'বেশির ভাগ গল্পের থিমটা চাকরি খুঁজে বেড়ান',—দ্বিতীয়তঃ 'সেক্স সমস্যার অপ্রাসঙ্গিক এবং আকস্মিক অবতারণা'র দিকেই একদল লেখকের তখন বিশেষ ঝোঁক ছিল; তৃতীয়তঃ মনুষ্য-চরিত্রের তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা'র দিকে অনেকের একটু বেশি রকম উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে তিনি এই কথাই বিশ্বাস করতেন যে, 'আমাদের সাহিত্যের কি গল্প, কি উপন্যাসগুলির কাঠামো, একশোর মধ্যে আশি ত' বটেই—বিদেশী গল্প উপন্যাসের—হয় অনুকরণ, নয় ধার, না হয় চুরি।' সাহিত্যে আত্মস্বতা রক্ষার দায়িত্বের দিক থেকে এ-অভিযোগ সত্যিই ভাববার কথা!

সমপ্রকৃতির বিষয়বস্তু যে গল্পের ইতিহাসে বার বার ফিরে ফিরে দেখা দিতে চায়, এইবার সে রকম একটি নমুনা তোলা যেতে পারে। কালীঘাটের কুমারী-প্রসঙ্গ নিয়ে অবধূতের 'কলিতীর্থ কালীঘাট' লেখা হয়েছে একালে। ১৯৩০-এর কাছাকাছি আমলেও এরকম বিষয়বস্তু লেখকদের নজরের বহির্ভূত ছিলো না। ১৩৩৩ এর 'কালি-কলম'-এ প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নীপুদা' বেরিয়েছিল। কালীঘাটের এক মেসে কোনো এক সুধীরবাবুর খোঁজ করতে এসেছিলেন নীপুদা। এই নীপুদার বিদ্যে ছিল ইস্কুলের ফিফ্‌থ ক্লাস পর্যন্ত,—তার উচ্চকণ্ঠে ছিল সরল আন্তরিকতা,—'জাত বেজাতের মড়া পুড়িয়ে, অস্পৃশ্য-রুগীর সেবা করে, ন'শ নিরানব্বই বছরের কড়ারে টাকা

ধার দিয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াত' এই নীপুদা। সেই নীপুদা 'একদিন কালীঘাটে গিয়ে একপাল দুরন্ত অসভ্য দরিদ্র কুমারী মেয়ের' দল থেকে একটি মেয়েকে বেছে নিয়েছিল। 'নীপুদা সন্ধান নিয়ে জেনেছিল, মেয়েটির বাপ নেই ; ভাইয়ের তথাকথিত আশ্রয়ে মা মেয়েটিকে নিয়ে থাকে। কালীঘাটের পেছনে, সুড়ঙ্গের মতন অন্ধকার ও নোংরা যে গলিগুলি শ্যাওলা ও নোনা ধরা পুরাতন ইঁটের জমাট জটলার ভেতর দিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে ইতস্তত: গেছে, তারই একটির পাশে পায়রার খোপের মত সঙ্কীর্ণ মুমূর্ষু ঢু'কুঠুরীওয়ালা একটি কোঠা বাড়িতে তাদের বাস।' সেই মেয়েটিকে উদ্ধার করেছিল, নীপুদা। তার ভিক্ষায় বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছিল,—'মেয়েটি উপযুক্ত হলে নীপুদা তার বিয়ে দিয়েছিল ও তার সঙ্গে কন্যা সম্বন্ধ পাতিয়েছিল।' এইভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র নীপুদার রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন। অবধূতের উৎকট দিকটা আমাদের সেকালের লেখকদের পটভূমি-বাসনার মধ্যে ঢুকতে পারেনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেদিকটা ছুঁতে রাজী ছিলেন না বোধ হয়। তিনি এবং তাঁর সমকালীন শক্তিমানের দল পারিপার্শ্বিক বস্তু-সত্যের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে সজাগ তো ছিলেনই, উপরন্তু অন্তরের বেদনা এবং বিস্ময়ের বিষয়েও খুবই পিপাসা বোধ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন এক-একটি রসিক মনকে সমকালীন জীবন-বিচিত্রার যতটুকু দেখতে সুযোগ দেয়, তাঁরা সে-সুযোগের অপচয় ঘটতে দেননি। বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ সে পর্বেও অনেক ঘটেছে। কিন্তু সেই ব্যাপক অনুকরণের মধ্যেও সত্যিকার একটি আদর্শবোধ ছিল। একালের প্রান্ত থেকে সেকালের কথা-প্রসঙ্গে এসব স্মৃতির এই উল্লেখ এ-কালকে খাটো করবার জন্য নয় —একাল আরো সত্য হয়ে উঠুক, এই হোলো পাঠকের একান্ত কামনা। সেই আগ্রহের তাড়নায় একে একে অনেক কথা এসে গেল। এইবার শেষ প্রসঙ্গটির নমুনা দিয়ে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

ঘাটশীলা থেকে লেখা ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ তারিখের একখানি চিঠির মধ্যে প্রেমেন্দ্র বলেছিলেন—'জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাক তাতে দোষ কি ? এতদিন ত সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের বড় বেশি সম্পর্ক ছিল না। জীবনকে দেখবার দৃষ্টিই ছিল যে দুর্লভ।' কথাটি আরো বিশদ করে পত্রলেখক জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের আগেকার আমলে নাকি 'গল্প উপন্যাস সবই ছিল Theorem। শেষকালে একটা Q. E. D. পর্যন্ত থাকতো।' কিন্তু 'গোর্কি হ্যামসুনের জগতে এলে ইউক্লিডের চেলারা ফাঁপরে পড়ে। এ যে একেবারে মগের মুলুক! এ যে জীবনের জটিল দুর্বোধ্য জগৎ। এখানে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে একটি সিধে পাকা সড়ক একটি সুস্পষ্ট সমাপ্তিতে পৌছে দেয় না।—কেবলই মোড়,কেবলই বাঁক, কেবলই জীবনের বিচিত্র গোলক ধাঁধা—এখানে জীবনের বিভিন্ন ধারা কেবলই বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে

ফেনিয়ে রঙীন হয়ে উঠছে। তাই ওরা জিজ্ঞাসা করে,—মানে কি ?' প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই বিশ্লেষণের মধ্যেই সেই নবীন লেখকগোষ্ঠীর লক্ষ্য এবং আদর্শের ইশারা ছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—'আমরা হ্যামসুন গোর্কি নই, তাঁদের পায়ের কাছে বসবার যোগ্যও নই, তবে আমাদের এইটুকু গর্ব, আমরা জীবনের পাঠ তাঁদের কাছে গ্রহণ করেছি।' এবং তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সেই নব্য আদর্শ গ্রহণের ফলেই 'বাংলাদেশে 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা—' লেখা সম্ভব হয়েছে, বাংলার গল্প-উপন্যাসে জীবন্ত মানুষের সমাগম হয়েছে।'

আধুনিক বাংলা গল্পে হাস্যরস

আমাদের শতাব্দের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্যঙ্গ-কৌতুক'-এর মধ্যে গোকুলনাথ দত্তের স্বর্গপ্রাপ্তির গল্প শুনিয়েছিলেন। সে ছিলো ১৩০১ সালের ঘটনা। সে-ঘটনার বছর তিরিশেক পরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আমরা কি ও কে' বইখানি ছাপা হয়। কালাচাঁদ খুড়ো চল্লিশ বছর আগেকার বিডন স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে প্রসিদ্ধ বক্তা বিশ্বেস মশাইয়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন: 'প্রসব বটে'—অর্থাৎ Admirable delivery!' বক্তা তখন জোর গলায় বলছিলেন—'আমরা সেই ভীমার্জ্জুনের বংশ···যদিও আমরা বহুদূরে এসে পড়েছি, কিন্তু আদি যে আমাদের সেই ভীমার্জ্জুন,—মাঝে মাঝে বাঁধন দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়,—রাজা গণেশ, সীতারাম, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, আশানন্দ, রঘু ডাকাত, মোহনলাল প্রভৃতি। জেনো কিছু হারায়নি।···তোমরা যাই খাও না কেন,—সকলে এক-এক মুঠো ভিজে ছোলা খেতে ভুলো না। তোমাদের কাছে আজ আমার এই শেষ অনুরোধ।'

খুড়ো ছিলেন শ্রীরামপুরের ডেলিপ্যাসেঞ্জার। তিনি যে গাড়িতে উঠতেন, সে গাড়িতে লোক ধরত না—কেবল তাঁর দুটো কথা শুনতে। বিডন স্কোয়ারের সেই বক্তৃতা শুনে বক্তার ইংরেজি-বিদ্যার প্রশংসা করেছিলেন অনেকেই। তবে, খুড়ো সেদিন বক্তৃতার ভাষার কথা না তুলে বক্তার বক্তব্যের কথাটাই ভাবতে বলেছিলেন। কারণ, ছোলা যদিও ভাল জিনিস, তবু তাঁর মতে—'ধাত আর জাত বুঝে বাত্'। 'তোতাগুলোও ঘোড়ার মতই ভিজে-ছোলা খায়, আর বড় বড় বুলি আওড়ায়, কই পায়ের শিকলটাও তো ছিঁড়তে পারে না!' এমন সময়ে আকাশের পশ্চিম কোণে পাহাড়প্রমাণ মেঘ উঠেছিল। খুড়ো-কে দুহাত জোড় করে শূন্যে নমস্কার করতে দেখে ছোকরা নরেন জিগেস করেছিল, 'ওটা কি হোলো ?' তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'ঐটেই চাকরির মূলধন বাবাজি;—ওতে মেজাজটা একটু নোরমে দেয়,—ওটা ময়দানবের ময়েন!'

অতঃপর হাবড়া স্টেশনে পৌছবার আগেই আকাশ-ভরা মেঘ এসে পড়েছিলো রণচণ্ডিকার মূর্তি ধরে। কেদার বাঁড়ুজ্যের নিজের কথায়—'কিন্তু বাড়িমুখো ভীমের বংশের ভ্রূক্ষেপ নেই। গর্তে মুখ ঢোকালে সাপকে যেমন টেনে বার করা যায় না, এই প্রলয়ঙ্করীও এদের পোল থেকে পাছু হটাতে পারলেন না।·· এটা আমাদের দেহের শক্তি, কি মনের বল, ঠিক বোঝা গেল না ;—সেই ট্রেনে বাড়ি যেতেই হবে!' ইতিমধ্যে হাবড়া পোলের মাঝামাঝি এক জায়গায় সেই বৃষ্টির মধ্যেই সুন্দর বলিষ্ঠ এক যুবককে মূর্চ্ছাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার 'দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে, কস্ বেয়ে দু'চার ফোঁটা রক্তও গড়াচ্ছে।' 'খুড়ো সকলের দিকে চেয়ে বল্লেন ট্রেনে ত প্রায়ই দেখতে পাই,—কেউ চেন হ্যা? শুনেই অর্ধেক লোক সোজা পাড়ি দিলে, বাদবাকির মধ্যে একজন আমতা-আমতা করে বললে—'হ্যাঁ তা ও আমাদের কেউ নয়,—ও কোন্নগরের কিশোরী!' 'দলে দলে লোক ঝোঁকে,—উঁকি মারে আর চলে যায়। এদের অনেকেই বিডন স্কোয়ারের ফেরৎ। কেউ বা বলে—'এস হে—আমরা আর কি কোরবো?'

শুনে খুড়ো বললেন—'সে কি! আমরা সেই ভীমের ডাইলিউটেড্ ডিম,—ছোলা চালালেই ফুটবো, নিজেকে চিনতে পারবো!'

সবাই চলে গেল। খুড়োর খাতিরে মাত্র তিনজন ডেলি প্যাসেঞ্জার সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। চারজনে মিলে কিশোরীকে ফুটপাথ ঘেঁষে সরিয়ে রাখবার পরে খুড়ো বলেছিলেন, 'কিচ্ছু ভেবনা বাবা, ও জার্ডিনের বাড়ির কেরানি—যমের অধিকার নেই। কেরানি মরে না,—সাহেবের স্যাংশান চাই!'

রবীন্দ্রনাথের গোকুলনাথ চরিত্র অথবা কেদারনাথের কালাচাঁদ খুড়ো জীবনের নানা অসঙ্গতির কথা যেমন সোজাসুজি দেখিয়ে দেন, পরশুরামের রীতিও কতকটা সেই ধরনের। তবে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে বই কি! আমাদের নৈষ্কর্ম্য এবং অন্ধ ঐতিহ্যগর্ব,—ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মহীনতা,—গুরুবাদের আতিশয্য ইত্যাদি চারিত্রিক অসংগতিগুলি এঁরা সকলেই অপেক্ষাকৃত সোজাসুজি বা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা গল্পে হাস্য-রসের আর এক বিশিষ্ট বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর লেখার মধ্যে,—সৃষ্টি আর সমালোচনা-পদ্ধতির অন্বয়ে বা যৌগপদ্যে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কিংবা প্রভাতকিরণ বসুর কথা ভাবলে কেদার বাঁড়ুয্যের কথাই বেশি মনে পড়ে। 'দিল্লীর লাড্ডু'র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো সেই রকম। তিনিও প্রমথ চৌধুরী-ধারার নন!

শিবরাম চক্রবর্তীর পথ স্বতন্ত্র। লীলা মজুমদারের আসর-জমানো ঘরোয়া ভঙ্গির মধ্যে আবার আর-এক রকম হাস্য-পরিহাস। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোদের গল্পে

শিবরামেরই কতকটা যেন প্রতিধ্বনি। কিন্তু ছোটোদের রাজ্য বলতে মনের যে এলাকাটি বোঝায়, তাতে হয়তো খুব গভীর, খুব সূক্ষ্ম, খুব বেশি কারুকার্যময় অথবা চিন্তাপ্রসূত হাসির স্টাইল দেখাবার অবকাশ নেই। প্রমথনাথ বিশী যেমন। বড়োদের মনেই তাঁর পরিক্রমা। ছোটোদের কাছে তাঁর 'গুরুমারা চেলা' ('ধনে পাতা'-র অন্তর্ভুক্ত) হয়তো ঠিক পরিবেষণীয় নয়, যদিও সাবালক পাঠকের পক্ষে এইসব গল্প খুবই উপাদেয়। আবার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভল্লুসর্দার'-এর মতন লেখা ছোটোরা পড়লেও কিছু যে আনন্দ পাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কেবল বয়স বাড়লেই লোকে অবশ্য সাবালক হয় না। চাতুর্য সাবালকের অধিগম্যও হতে পারে, আবার নাবালকের পাতেও তা আর-এক ভাবে দেওয়া যায়। সে যাই হোক, এসব কথার চেয়ে বড়ো কথা হোলো—সাহিত্যে ব্যক্তি-ভেদে রুচিভেদ এবং লক্ষ্যের তারতম্য অনুসারে ভঙ্গির প্রভেদ দেখা দিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পরশুরাম, কেদারনাথ, প্রমথ চৌধুরী—এঁরা প্রত্যেকেই হাস্যরসের নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন। আধুনিক বাংলা গল্পে হাস্যরসের ধারা ফুরিয়ে যায়নি। এবং তার স্বরূপের পরিচয় দিতে হলে কিছু কিছু উদাহরণ দেখানো দরকার হয়।

পরশুরামের লেখার প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—'তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন সময় গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।' প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'পরশুরামের ছবি আঁকবার হাত অতি পরিষ্কার, তিনি দু'চারটি টানে এক একটি লোককে খাড়া করে দেন।' চরিত্র রচনাতে তো বটেই, তাছাড়া চরিত্র রূপায়ণের আনুষঙ্গিক এবং অন্তবর্তী বর্ণনা বা ব্যাখ্যার জায়গাগুলিতেও তিনি আশ্চর্য হাসির ঢেউ বজায় রাখতে সিদ্ধহস্ত। পেনেটির শিবু আর তার স্ত্রী নৃত্যকালীর কথা ভোলবার নয়। একঠোঙা তেলেভাজা, আধসের দই আর আধসের অমৃতি উদরস্থ করে, সারাদিন কলকাতায় ঘুয়ে, দিনান্তে বিডন স্ট্রীটের 'হোটেল ডি-অর্থোডক্সে' এক প্লেট কারি, দু প্লেট রোস্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল সহযোগে পুনরায় জলযোগ করে, সমস্ত রাত থিয়েটার দেখে, শিবু ভোরবেলায় পেনেটিতে ফিরে ওলাউঠায় দেহত্যাগ করবার পরে সূক্ষ্মদেহী হোলো! গ্রামে আর তার মন টি'কলো না। পেনেটির আড়পার কোন্নগর। সেখান থেকে সোজা ভূশণ্ডীর মাঠে পৌঁছে এক তালগাছের সন্নিহিত নেড়া এক বেলগাছে উঠে শিবুর ব্রহ্মদৈত্য-জীবন শুরু হয়। মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যে শিবুকে ইহলোক থেকে পরলোকে বদলি করে দিয়ে পরশুরাম অতঃপর প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাটুকু যোগ করেছিলেন—'যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজম্ বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না, তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয়, সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক,

পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাহারা মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমতঃ একটি বড ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গ এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন।' তাঁর সেকালের লেখাতে যেমন, একালের গল্পগুলিতেও তেমনি গল্প এবং হাসি দু'য়েরই মসৃণতা বজায় আছে। তবে কালের প্রভাব দুরপনেয়। একালে পরশুরাম সেইটুকুই কেবল বদলেছেন। তার বেশি নয়।

প্রমথ চৌধুরীর ধরন কিন্তু অন্য রকম। তাঁর 'ফরমায়েসী গল্প' এবং 'চার-ইয়ারী কথা' যথাক্রমে প্রাচীন এবং নব্য ঢঙের আসর জমানো গল্প। প্রথমটিতে মকদমপুরের জমিদার রায়মশাই সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, সিকিভরি আফিম সেবন করে, তাঁর বিদূষক ঘোষালকে গল্প শোনাবার হুকুম দিয়েছেন। দ্বিতীয় গল্পে সীতেশ, সোমনাথ ইত্যাদি চার-ইয়ার এক ঝড়ের রাতে, ক্লাবে বসে, পেগ সহযোগে পরস্পরকে গল্প শুনিয়েছেন! প্রেমের গল্পের ফরমাস পেয়ে, ঘোষাল তো দেবমন্দিরে প্রণয়-সঞ্চার ঘটাতে উদ্যোগী হয়ে শ্রাবণ মাসের বর্ষণময়ী এক অমাবস্যার রাত্রে আশ্রয়প্রার্থী এক ব্রাহ্মণ যুবককে বিজন এক মন্দিরে এনে ফেলেছিল! কিন্তু রায়মশাইয়ের বা তার অন্যান্য ইয়ারদের প্রশ্নের ধাক্কা উড়িয়ে দিয়ে গল্পের ধারা এগিয়ে নিয়ে চলা সহজ নয়। শ্রোতাদের জেরায় পড়ে ঘোষাল তার উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, ঐ যুবকটি একজন সন্ন্যাসী এবং সে নাকি 'বৈদান্তিক শাক্ত'! মন্দিরে ঢোকবার পরে, সেই বৈদান্তিক শাক্তের চোখে পড়েছিল অপরূপ সুন্দরী এক নারীমূর্তি! অতঃপর লেখকের নিজের ভাষা ধরেই আর-একটু এগিয়ে যাওয়া যাক—'ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠলো। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল, সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগলো আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে শুরু হোলো, যেন তার পাঁজরা সব ধ্বসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া জ্বর আসবার সময়ে মানুষের যে অবস্থা হয়, তার ঠিক সেই অবস্থা হোলো। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে, তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে'!

হাসির যে স্তরে ভাঁড়ামি, প্রমথ চৌধুরী সে অঞ্চলেও যে সহজে বিচরণ করতেন,

এ তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর কলমের গুণে ভাঁড়ামি আর ভাঁড়ামি থাকে না। বৈদগ্ধ্যে, চাতুর্যে, বাক্‌সংযমে এবং অনির্বচনীয় এক ঔচিত্যের গুণে ফলতঃ যা উৎপন্ন হয়েছে, তারই নাম বীরবলী দক্ষতা! 'বড়বাবুর বড়দিন'-এর মতন সেকালের গল্পেও তাই, আবার তাঁর শেষ পর্বের লেখাগুলির মধ্যেও তাই-ই!

তাঁর 'বৈদান্তিক শাক্তের' কথা ভাবলে পরশুরামের 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' মনে পড়ে। 'নিস্যন্দিনী' পত্রিকার কবি শংকরী দেবী পরশুরামের আপন হাতে গড়া। তাঁর 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' এক সরস গল্পে আশ্রিত কবিতা। একটু নমুনা দেখা যাক্‌:

ও বিদেশী পাখতুনিস্তানবাসী।
তাগড়া জাক্কাখেল, আমি তোমায় ভালবাসি।
নর্ডিক নীল তোমার সুর্মা পরা চোখ
সেমেটিক নাকের নীচে মোটা ছাঁটা গোঁফ···, ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরস ঠিক এতটা 'তাগড়া জাক্কাখেল' জাতীয় নয়। বাংলা গল্পের সাম্প্রতিকতম পর্বে সে সূক্ষ্মতার চর্চা সত্যিই আর চোখে পড়ে না।

'ধুস্তুরী মায়া'র কথা

প্রবাদ আছে: 'হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা।'

মুখমণ্ডলের স্নায়ু-পেশী-ত্বকের সাময়িক প্রসার বা সংকোচ ঘটানোর ব্যাপারে হাসির কিছুটা কর্তৃত্ব আছে বটে। ফলে, হাসির ঝোঁক দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একরকম যন্ত্রণাও ঘটতে পারে। কপালে ত্বকের টান ধরতে পারে। তবে সে টানের বিস্তারও বেশি নয়,—তার আয়ুও অমিত নয়। হাসির ঝাপ্‌টা বৃষ্টির পশ্‌লার মতোই কিছুক্ষণ থেকে, থিতিয়ে, ক্ষান্ত হয়। তেমনি হলেই ভালো লাগে। মন হালকা লাগে, শরীর শক্তি পায়,—জীবন হাস্যবর্ষণে রৌদ্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পরশুরামের 'ধুস্তুরী মায়া' (গ্রন্থ প্রকাশ ১৩৫৯) কপাল-ব্যথা-করা হাসির বই নয়। তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'—সব ক'খানিই হোলো হাসির নির্ঝর—স্বাস্থ্যকর এবং তৃপ্তিকর। ১৩৩২-এ বেরিয়েছিল 'গড্ডলিকা',—১৩৩৫-এ তাঁর 'কজ্জলী',—তার কিছুকাল পরে 'হনুমানের স্বপ্ন',—আরো কিছু পরে ১৩৫৭ সালে তাঁর নতুন দশটি গল্পের সংগ্রহ 'গল্পকল্প'—এবং ১৩৫৯ সালে তাঁর বারোটি হাসির গল্প-সংগ্রহ—প্রথম গল্পের নাম অনুসারে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ধুস্তুরী মায়া'।

'ধুস্তুরী মায়া'-র কথা ভাবতে ভাবতে মোহিতলালের একটি উক্তি মনে পড়লো। মোহিতলাল লিখে গেছেন: 'আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিশালী লেখকের নাম করা

যাইতে পারে—ইনি 'গড্ডলিকা'-প্রণেতা পরশুরাম। ইহার রচনায় যে হাস্যরস আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে wit এবং fun থাকিলেও তাহা অতি স্নিগ্ধ সংযত satire; তাঁহার সেই fun-এর অন্তরালে একটা অতিশয় প্রচ্ছন্ন cynical laughter আছে।' মোহিতলাল পরশুরামের 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' এবং 'ভূষণ্ডীর মাঠ' গল্প দুটির উল্লেখ করে এই অভিমত জানিয়েছিলেন যে,—প্রথমতঃ, এ ধরনের হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে নতুন; দ্বিতীয়তঃ, তবু এসব রচনায় 'লেখকের attitude খাঁটি 'হিউমার'-এর attitude নয়—কারণ, এই হাস্যরসের অন্তরালে, মানুষের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে একটি সহৃদয় রস-কল্পনার যে নির্লিপ্ত প্রসন্নতা, তাহা অপেক্ষা বিদ্রূপের ভঙ্গিই প্রবল; তৃতীয়তঃ, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'হাস্যরসে যে উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার হাস্যরসসৃষ্টির মূলে এক ধরনের poetic reason বা কবি-বুদ্ধি আছে, পরশুরামের হাস্যরসে তাহা নাই।'

কিন্তু সমালোচকের এই ধরনের খোঁচায় হাসির চারুমূর্তি বিদীর্ণ হয়ে তত্ত্বের হাড় বেরিয়ে পড়ে! তাৎপর্যের ওজন বুঝতে বসে স্বতঃসিদ্ধের খুশি হারাতে হয়! তবু, সমালোচকরা বরণীয়। কারণ, তাঁরাই প্রাকৃত বুদ্ধিকে মার্জিত করে রুচি-সৃষ্টির আনুকূল্য করে থাকেন। অতএব, পরশুরাম সম্পর্কে এই মন্তব্যগুলির পুনর্বিবেচনা আবশ্যক। 'ধুস্তুরী মায়া' প্রকাশিত হওয়ার ফলে এ কাজে অগ্রসর হবার একটি উপলক্ষ্য পাওয়া গেল।

উদ্ধব পাল আর জগবন্ধু গাঙ্গুলী,—দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুরই বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। উদ্ধব হলেন ইমারতী রঙের ব্যবসায়ী—বেঁটে, মোটা, শ্যামবর্ণ, মাথায় টাক, কাঁচাপাকা ছাঁটা গোঁফ; জগবন্ধু লম্বা, রোগা, ফরসা, গোঁফ দাড়ি নেই,—জামরুলতলা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। জগবন্ধু মৃতদার; উদ্ধব স্বল্পশিক্ষিত, বহুবিত্ত, পত্নীসেবিত এবং এতৎসত্ত্বেও অসুখী! উদ্ধব তাঁর বন্ধুর সঙ্গে স্বপনপুরী-সিনেমায় সম্প্রতি 'লুটে নিল মন' দেখেছেন। জগবন্ধুকে বলেছেন: 'দেখা ইস্তক মনটা খিঁচড়ে আছে। জীবনের যা সব চাইতে বড় সুখ—প্রেম, তাই আমার ভোগ হল না।'

তাতে জগবন্ধু জবাব দিয়েছেন: 'অবাক করলে তুমি। বাড়িতে সতীলক্ষ্মী গৃহিণী আছেন, তবু বলছ প্রেম হয়নি······!' ঢাকুরে-লেকের ধারে একটা বড় শিমুল গাছের তলায় বসে আলাপ হচ্ছিল। সেই গাছে থাকতো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী। উদ্ধব-জগবন্ধুর আলাপের মূল কথাটা সমঝে নিয়ে ব্যাঙ্গমা কি করলো? পরশুরামের নিজের কথা দিয়েই দেখা যাক:

'বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরেছে। এই বলে ব্যাঙ্গমা তার সায়ংকালীন কোষ্ঠশুদ্ধি করলে। উদ্ধব আর জগবন্ধু রুমাল দিয়ে মাথা মুছে একটু সরে বসলেন।'

'ব্যাঙ্গমী বললে, তোমার তো নানারকম বিদ্যে আছে, একটা উপায় বাতলে দাও না। আহা, বুড়ো বেচারার মনে বড় দুঃখু, যাতে তার শখ মেটে তার ব্যবস্থা কর।'

ব্যাঙ্গমা তখন 'ধুস্তুরী ছোলার' রহস্য বলে দিলো। এক এক ধুস্তুরী ছোলার গুণে দশ-দশ বছর বয়স কমে যাবে।

'উদ্ধব ফিস ফিস করে বললেন, নোট করে নাও হে, নোট করে নাও। জগবন্ধু তাঁর নোটবুকে লিখতে লাগলেন।' অতঃপর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হোলো। উদ্ধব ধুস্তুরী-ছোলা খেয়ে তরুণ হলেন। 'প্রেমের' ক্ষুধায় 'কাঁচা বয়সের সোয়াদ' চাখবার জন্যে ব্যগ্র বন্ধুকে জগবন্ধু অবিশ্যি বলেছিলেন—'উদ্ধব ভাই, আমার কথা শোন, আলেয়ার পিছনে ছুটো না, ঘরে ফিরে চল। বেশ আছ, সুখে থাকতে কেন ভূতের কিল খাবে।'

কিন্তু ভূতের কিল না-খাওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি কোথায়? তাই রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরাণী এবং তাঁর সম্পর্কে-দাদা বার-অ্যাট-ল মকর রায়ের তর্জন-গর্জনের ওপর তুড়ি মেরে জেগে রইলেন উদ্ধবের অভ্যাস-সংস্কার-প্রবৃত্তিময় প্রবীণ সত্তা! মনে পড়লো গৃহলক্ষ্মী কালিদাসীর হাতের রান্না, মনে পড়লো সুদীর্ঘ, সুঅভ্যস্ত, বহু-নির্ভর-নিশ্চিত দাম্পত্য। উনিশে বৈশাখ, বুধবার অমাবস্যা তিথিতে ধুস্তুরী ছোলা খেয়ে উদ্ধব-জগবন্ধু তরুণ হয়েছিলেন। জগবন্ধু অবিশ্যি সাংখ্যের পুরুষের মতোই সাক্ষী মাত্র হয়ে উদ্ধবের সঙ্গী ছিলেন। তারপর কালিদাসীর মহিমা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু পূর্ণিমার রাত্রে দক্ষিণেশ্বর ঘাটে এসে তিনটি বেলপাতা চিবিয়ে পুনরায় মন্ত্র পাঠ করলেন :

বম মহাদেব সকল বস্তু
আগের মতন আবার অস্তু।

তখন সকল বস্তু আবার পূর্বাবস্থায় ফিরলো। শুধু তাই নয়, বোঝা গেল যে উনিশে বৈশাখ বুধবার আদৌ অতিক্রান্ত হয়নি। সবই ধুস্তুরী মায়ার মোহ। মনের অমাবস্যা কেটে গিয়ে পূর্ণিমা দেখা দিয়েছে। এই মাত্র!

মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। সে কাহিনীতে প্রবীণ জমিদার ভক্তপ্রসাদকে দেখা গিয়েছিল। ভক্তপ্রসাদ একই সঙ্গে অর্থলোভে এবং লাম্পট্যলোভে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে অর্থ এবং কাম—চতুর্বর্গের এই দুটি বর্গ পাশাপাশি বিদ্যমান। হানিফের যুবতী স্ত্রীকে কামনা করে ভক্তপ্রসাদ ভেবেছিলেন—'মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?' অবশেষে 'দীনবন্ধো, তুমিই যা কর'—বলে ভক্তপ্রসাদ তাঁর লক্ষ্য স্থির করেছিলেন।

পরশুরামের 'ধুস্তুরী মায়া'র উদ্ধব পালও অর্থবান, কৃতী, কামাতুর ব্যক্তি। ভক্তপ্রসাদ ইংরেজি জানতেন না, ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর স্বভাবের বিরোধিতা ছিল। পরশুরামের উদ্ধব পাল কিন্তু ঈষৎ অন্য প্রকৃতির মানুষ। তিনি বলেছেন: 'আজকাল অ্যাং ব্যাং চ্যাং সবাই বিলেত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসছে। আমারও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইংরেজি বলতে পারি না, হ্যাট-কোট-পায়জামা-আচকান পরতে পারি না, কাঁটা চামচ দিয়ে খেলে পেট ভরে না, কাজেই যাবার জো নেই।'

ভক্তপ্রসাদ এবং উদ্ধব পাল চরিত্র দুটির মধ্যে অবস্থা এবং স্বভাবের কিছু সাদৃশ্য যে চোখে পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে উনিশ শতকের অর্থ কৌলীন্য-লালিত লাম্পট্যের সঙ্গে বিশ শতকের বিত্তসামর্থ্য-লালিত লাম্পট্যের কিছু সাদৃশ্য থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

পরশুরামের এই কাহিনীতে এবং 'ধুস্তুরি মায়া' গল্পসংগ্রহের অন্যান্য গল্পে মোহিতলাল-কথিত wit, fun, satire—সবই আছে। তবে কাহিনী শেষ করে যে হাসিটি উপভোগ করা যায়, সে-হাসি ঠিক cynical কি অন্য কিছু, তা নিয়ে বিতর্ক জমতে পারে।

Hazlitt বলেছেন: 'wit is the salt of conversation, not the food।' পরশুরামের লেখাতেও wit-এর তাদৃশ ব্যবহারই ঘটেছে। তিনি Swift-এর সতর্ক-বাণী মনে রেখে কলম ধরেছেন বলে মনে হয়। Swift-ই তো বলেছিলেন: 'Perpetual aiming at wit is a very bad part of conversation.' 'Wit-ব্যাপারটা কি? Locke অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন: 'wit consists in assembling and putting together with quickness, ideas in which can be found resemblance and congruity, by which to make up pleasant pictures and agreeable visons in the fancy.'

পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্নে'র শেষ গল্প 'তৃতীয় দ্যূতসভা'র শেষ উক্তিতে চমৎকার wit-এর নমুনা আছে—এবং সে কেবল wit-ই নয়। মোহিতলাল যাকে বলেছেন 'cynical laughter'—কতকটা তেমনি হাসিই যেন সেই উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। সেই উক্তিটি এখানে তুলে দেখা যাক:

'বলরাম বললেন, 'মৎকুনি, তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমার সঙ্গে দ্বারকায় চল। সেখানে অহিংস সাধুগণের একটি আশ্রম আছে, তাতে অসংখ্য উৎকুণ-মৎকুণ-মশক-মূষিকাদির নিত্য সেবা হয়। তোমাকে তার অধ্যক্ষ করে দেব, তুমি নব নব গবেষণায় সুখে কালযাপন করতে পারবে।'

এখানে উৎকুণ মৎকুণ-সংযোগটি চমকপ্রদ এবং হাস্যকর এবং অহিংস সাধুগণের

আশ্রমে মৃত্যুভয়ভীত সুবলনন্দন মৎকুণির স্বার্থসন্ধানমূলক গবেষণার প্রস্তাবটি শুধু হাস্যকর নয়,—সে যেন কুটিল ভবিতব্যের নির্মম সহাস্য জৃম্ভণ!

'ধুস্তুরী মায়া' গল্পমালার হাস্যপ্রকৃতি কিন্তু এতোটা নৈরাশ্যতাড়িত নয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক—'প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি মুচুকুন্দ, ভারতজ্যোতি বঙ্গচন্দ্র কলিকাতাভূষণ মুচুকুন্দ' একই কালে কংগ্রেসে, হিন্দু মহাসভাতে, মুসলিম লীগে আর গভর্নমেণ্টে (ব্রিটিশ) —এই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ('লক্ষ্মীর বাহন' দ্রষ্টব্য)। 'ইহকাল আর পরকাল দুদিকেই তাঁর সমান নজর আছে, তবে ধর্মকর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজে মাথা ঘামান না, তাঁর পত্নীর আজ্ঞাই পালন করেন।' 'মুচুকুন্দ-গৃহিণী মাতঙ্গী দেবী লম্বা-চওড়া বিরাট মহিলা (হিংসুটে মেয়েরা বলে একখানা একগাড়ি মহিলা)।' এই মুচুকুন্দর জীবনে অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা ঘটলো। তহবিল-তছরূপ, জালিয়াতি, ফেরেব-বাজি প্রভৃতির দায়ে তাঁকে জেলে যেতে হোলো। সাত বছর কারাবাসের পরে তিনি সস্ত্রীক বারাণসী যাত্রা করলেন। এই গল্পটির সূচনায় পরশুরাম লিখে গেছেন:

'এ দেশের অসংখ্য কৃতকর্মা চতুর লোকের যে নীতি মুচুকুন্দরও তাই ছিল। যুধিষ্ঠির বোধ হয় একেই মহাজনের পন্থা বলেছেন। এঁদের একটি অলিখিত ধর্মশাস্ত্র আছে; তাতে বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন সংসর্গদোষ হয় না, তেমনি বৃহৎ বা বহুজনের ব্যাপারে অনাচার করলে অধর্ম হয় না। রাম, শ্যাম, যদুকে ঠকানো অন্যায় হতে পারে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে বা জনসাধারণকে ঠকালে সাধুতার হানি হয় না। যদিই বা কিঞ্চিৎ অপরাধ হয়, তবে ধর্মকর্ম আর লোকহিতার্থে কিছু দান করলে সহজেই তা খণ্ডন করা যেতে পারে। বণিকের একটি নাম সাধু, পাকা ব্যবসাদার মাত্রেই পাকা সাধু। মুচুকুন্দর দুর্ভাগ্য এই যে তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি, দৈব তাঁর পিছনে লেগেছিল।'

কল্যাণময় দৈবের অঘটনঘটন সামর্থ্যে যিনি বিশ্বাস করেন,—অনাচারের Nemesis এ অথবা অপরাধীর স্বখাতসমাধিতে যাঁর বিশ্বাস অটুট, তাঁকে নৈরাশ্যবাদী 'সিনিক' বলা অসঙ্গত। অতএব মোহিতলালের 'cynical laughter' সম্পর্কিত মন্তব্যটি পরশুরামের সব রচনার প্রসঙ্গে সমর্থনযোগ্য নয়।

George Santayana একদা humour সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা লিখেছেলেন। তার বঙ্গানুবাদ করলে মন্তব্যটা এই রকম দাঁড়ায়:

—এই দুনিয়া যেন নিত্য নিজেকেই ব্যঙ্গ করছে। প্রতি মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে, আদর্শ লুটিয়ে পড়ছে প্রতি দিনের আদর্শবিরোধিতার গ্লানিতে। তবু সর্বদা জাগ্রত আছে আত্মশোধনের বলবতী ইচ্ছা। ভাঙ্গনের পরমুহূর্তেই গঠনের কাজ শুরু হচ্ছে। অনর্জিত মর্যাদা অর্জনের স্পৃহা সজাগ আছে, সক্রিয় আছে। ভুল, ত্রুটি, ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা শোধন

করবার প্রয়াস আছে মৃত্যুহীন। অতীতের ছায়ামূর্তিটাকে যেখানে যেখানে অসঙ্গত মনে হয়েছে,—সেখানে সেখানে সংস্কারেব কাজ চলছে। এইভাবে খণ্ডতায়—পূর্ণপ্রেক্ষায় সমন্বিত একাকার সত্যস্বরূপের ওপরে মানুষের মন থেকে উৎসারিত তথাকথিত এক আদর্শ ছুনিয়ার ছায়া পড়ছে। মানব-জীবনের স্তবে স্তরে সেই ছায়া-জগৎটারই প্রাধান্য মেনে নেওয়া হচ্ছে। কায়াতে-ছায়াতে এই যে ব্যবধান,—humour এই ব্যবধানকেই রসিকের উপভোগ ও উপলব্ধির সামগ্রী করে তোলে।

পরশুরামের 'ধুস্তরী মায়া' আমাদের বর্তমান এই দেশকালের পূর্বকথিত 'ছায়া' এবং 'কায়া',—ছু'টিকে একই সঙ্গে পাশাপাশি উদ্‌ঘাটিত কবেছে এবং এ-বইয়ে তাঁব পূর্বস্বভাবের বিশেষ কোনো বদলও হয়নি। মধুসূদন দত্তেব মতোই স্বদেশের পুরাণপ্রসঙ্গে তাঁর মনোজগৎ পরিপূর্ণ। পাত্রপাত্রীর সংলাপে রামায়ণ-মহাভারতের নানা কথাব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। শুধু তাই নয়, পুরাণের লুপ্ত কথা পুনরুদ্ধারের খেলা খেলতে তাঁর বিশেষ ভালো লাগে। 'কজ্জলী'-র 'জাবালি',—'গল্পকল্পের' 'ভীমগীতা' —এবং 'ধুস্তরী মায়া'-র 'অগস্ত্যদ্বার' কিংবা 'গন্ধমাদনবৈঠক' একই প্রকৃতির হাস্যপ্রযুক্তি মনে করা অসঙ্গত নয়। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমা' প্রভৃতি পুবাণস্মব গম্ভীর কাব্য লিখেছিলেন বটে,—কিন্তু গুরুগম্ভীর পুরাকাহিনীকে অতি-সত্য বর্তমানের আসবে টেনে নামিয়ে খোসগল্প জমাতে ইচ্ছে করেন নি। মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখে গেছেন—

—এ কি হেরি সর্বনাশ!
রাম তুই হবি বনবাস—
এ কি হেরি সর্বনাশ।
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে,
সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে,
ভাল এক জোড়া পাশা আর ঐ (ওরে)
ভাল ছু জোড়া তাস।
—এ কি হেরি সবনাশ!

—কিন্তু পরশুরামের পুবাণপ্রকল্পনার মৌলিকতার পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্রও তুচ্ছ, ছুর্বাসাও যেন অপোগণ্ড! 'বাল্মীকি রামায়ণ' এবং 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস'-মহাভারতেব বঙ্গানুবাদকার পুরাণবিজ্ঞ রাজশেখর বসুর ছদ্মনামটিও যে পুরাণসিন্ধু থেকেই আহবণ করা হয়েছে, এ ব্যাপারটি সতর্ক সাহিত্য-পাঠক ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করতে বাধ্য হন। পরশুরাম বিষ্ণুর অবতার—তিনি কুঠারপাণি, কিন্তু কল্যাণকাম। বাংলা সাহিত্যের করুণগম্ভীর, ছায়াচ্ছন্ন, প্রেম-ভক্তি-বৈরাগ্য-মৃত্যুভাবনামথিত রসতীর্থে এই দেবর্ষির নাম আত্মসাৎ করে বছর তিরিশেক আগে যে লেখক একদা 'গড্ডলিকা' লিখেছিলেন, 'ধুস্তরী মায়া'র মধ্যে আবার তাঁকেই দেখা গেল—এবং দেখে পুনর্বার ভালো লাগলো!

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠারোর শতকের ইংরেজি সাহিত্যে ড্রাইডেন এবং পোপের লেখাতে হোরেস এবং জুভেনালের প্রভাব পড়েছিল। 'প্রভাব' কথাটার অর্থ সম্বন্ধে চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন নেই। মোটামুটি এ-মন্তব্যে কারও আপত্তি হবার কথা নয় যে, পোপ ছিলেন হোরেসের ভক্ত; এবং ড্রাইডেন ছিলেন জুভেনালের। হোরেস খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ের লোক; জুভেনাল তাঁর পরবর্তী। তাঁরা উভয়েই ল্যাটিন ভাষায় কাব্য লিখেছিলেন। ড্রাইডেন এবং পোপ-এর সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের মধ্যে এই সূত্রে স্যামুয়েল জন্‌সন্‌, জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ এবং আরো কারো-কারো নাম মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপাততঃ সে কথা থাক্‌।

বাংলা সাহিত্যে আঠারোর শতকের প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরও তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাক্‌-চাতুর্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ভারতচন্দ্রের পরে কবিওয়ালারাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং হাস্য-কটাক্ষের সঙ্গে-সঙ্গে কথার বাহাদুরি দেখাবার অনেক চেষ্টা করেছেন। তারপর উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে এবং দেশে শাসন-ব্যবস্থার নানা সংস্কার, ধর্মচিন্তার বিভিন্ন আন্দোলন, শিক্ষণব্যবস্থার বিচিত্র রদ-বদল ইত্যাদির ফলে বাঙালী সাহিত্যিকের মন উত্তরোত্তর গম্ভীর হয়ে উঠেছে। দীনবন্ধু এবং মধুসূদনের দেখাদেখি,—তাছাড়া টেকচাঁদ এবং হুতোমের অল্প-বিস্তর অনুকরণের ফলেও বাংলায় প্রহসনের হিড়িক চলেছিল অনেকদিন। শতাব্দীর প্রথম দিকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাবু'-কাহিনী এবং 'বিবি'-বৃত্তান্ত কিছু রসিকতা জুগিয়ে গেছে। তারপর, মাঝামাঝি সময়ে, বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার-আন্দোলন দেশের সর্বত্র কথা-কাটাকাটির প্রচুর খোরাক জুগিয়েছে। সেই সঙ্গে কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজের বিষয়েও বেশ কিছু সাহিত্যিক রসিকতা জমে উঠেছিল।

তারপর এই বর্তমান শতকের প্রথমার্ধ পার হয়ে উনিশ-শ' ষাটের দিকে এগুতে এগুতে সেই পুরোনো আমলের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত হাল আমলের মনোভঙ্গির তুলনা মনে জাগে। আজ থেকে একশ' বছর আগে এখনকার তুলনায় আমাদের পাঠকসংখ্যা যে অনেক কম ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সময় বদ্‌লেছে বটে! এখন পাঠকের সংখ্যাও বেড়েছে, সাহিত্যের বৈচিত্র্যও বেড়েছে। মনে হয়, সমাজের টুকিটাকি ঘরোয়া খবরের চেয়ে বাজারদর, রাজনীতি এবং জীবিকার কথাই একালে আমাদের বেশি মনোযোগ দাবি করছে বললে অন্যায় হবে না। খবর-কাগজের সংখ্যা এবং প্রচার দুইই বহু পরিমাণে বেড়ে গেছে। তাছাড়া, আজকাল রেডিও মারফত দেশ-বিদেশের খবর তাড়াতাড়ি, সরাসরি জানবার সুযোগ বেড়েছে। ফলে, বৈষয়িক এবং অবৈষয়িক

নানান্ তর্ক-বিতর্ক আজকালকার সাধারণ মানুষের মনে নিত্যই দেখা দিচ্ছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা হাস্য-পরিহাসের বিষয়ের মন্দা ঘটেনি, বরং বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সে অনুপাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-হাসি-তামাসার উৎসাহ বেড়েছে কি?

যুগান্তরের 'এককলমী' বা আনন্দবাজারের 'কমলাকান্ত' একালে অন্তত খবর-কাগজের মারফত দেশের মনের কতক অংশের ভার লাঘব করছেন। প্রতি দিনের নগদ হিসেবের খাতায় তারা সাধ্যানুসারে হাসির জোগান দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা দু'চারজনে কতোটুকুই বা করতে পারেন? ছোটদের সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তী অবিশ্যি একাই অনেক অভাব মিটিয়েছেন। তবু বৈষয়িক ভাবনাকে হালকা হাসির প্রাচুর্যে আরো বসিয়ে নিতে পারলে মন্দ হোতো না। ঢাকার জন্মাষ্টমীর সঙ, শান্তিপুরের রাসের মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানে, আগে যে-ধরনের হাসি-ঠাট্টার রেওয়াজ ছিল, সে সব প্রসঙ্গ না তুলে কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলে মনে হয় যে, আমাদের হাল আমলের বাংলা সাহিত্যে হাসির স্বল্পতা সত্যিই চোখে পড়বার মতন শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। রজনীকান্ত সেনের মতন নয়,—'প্রহাসিনী'র রাবীন্দ্রিক হাসিও নয়,—দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে যে বিশেষ ভঙ্গির সূচনা দেখা গিয়েছিল,—প্রমথ চৌধুরীর সংহত বাক্‌চাতুর্যে যার ততোধিক পরিণতি দেখা গিয়েছিল,—যে-হাস্যাচার আদি-কাল হয়তো মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র অবধি প্রায় দুশ' বছরের বিস্তারে,—যার প্রথম অবক্ষয়দশা গেছে কবির লড়াইয়ে এবং পুনরুত্থান ঘটেছিল ঈশ্বর গুপ্তের কোনো কোনো লেখাতে, হাসির সেই বিশেষ মূর্তিটি মধুসূদনের মতন বিদ্বান মানুষও উপেক্ষা করতে পারেন নি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতন গম্ভীর ভাবুকও এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। তাতে স্থূলতা ছিল বলে বঙ্কিম মাঝে-মাঝে তিরস্কার করেছেন বটে, কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবন কি সম্পূর্ণ স্থূলতা-বর্জিত ব্যাপার? আঘাত-প্রত্যাঘাতময় স্থূল জীবন সম্পর্কের মধ্যে স্থূলতা নিবারণের আদর্শটা মাত্রাবোধের শাসন অস্বীকার করে বেড়ে উঠলে সেটা শুচিবায়ুতে পরিণত হয়। উনিশ শতকের ধীমানরা তা জানতেন। তাই 'বঙ্গদর্শনে' প্রহসনের তারল্য এবং হুতোমের অশ্লীলতা সম্বন্ধে বহু তিরস্কার প্রকাশিত হলেও বঙ্কিম নিজে, এবং তাঁর বন্ধু দীনবন্ধুও সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে নেমে হাস্যরসিকের ভূমিকাটি মোটেই উপেক্ষা করেন নি।

গদ্যের যুগে সাহিত্যের কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায়। আমাদের মধ্যযুগের হিসেব ধরা হয় খ্রীষ্টাব্দের ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। সেই মধ্যযুগের অবসানে, ১৮০০ থেকে শুরু হয়ে ক্রমে বঙ্কিমের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ গদ্য-যুগের ব্যস্ততার সঙ্গে সাহিত্যগুণের সমৃদ্ধি যুক্ত হয়েছে। তারপর, একে-একে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিচিত্র সাহিত্যশাখার পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যলেখকদেরও উৎসাহ বেড়েছে,—

পদ্যের, এবং গভীরতর কবিতার রাজ্যেও অভূতপূর্ব সম্পদ দেখা দিয়েছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র—বাংলা সাহিত্যের গত একশ' বছরের ইতিহাসে এই চারটি মনের প্রতাপে, সম্পদে এবং ব্যাকুলতায় অভাবিতপূর্ব কীর্তি গড়ে উঠেছে!

মন যখন নিত্য নতুন আবিষ্কারে মত্ত থাকে, তখন হয় উচ্ছ্বসিত ভাবে, না-হয় শাণিত বেগে সে আত্মপ্রকাশ করে। তখন প্রাণের প্রাচুর্য দেখা দেয়। বিচিত্রের সমাবেশ ঘটে। যে কলমে 'কমলাকান্তের দপ্তর' বা 'লোকরহস্য' লেখা হয়, সেই কলমেই 'বিষবৃক্ষ' দেখা দেয়,—আবার তাতেই 'কৃষ্ণচরিত্র' লেখা হয়েছে! মাত্র বছর কুড়ির মধ্যে বঙ্কিমের প্রাণবন্ত মন নানা নহরে উপ্‌চে পড়েছিল। তাই, সাহিত্যের সৃষ্টিস্রোতে যখন ভাঁটা ধরে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় কথার চতুরালি কেবল প্রাণাবেগের সেই নেতি-লক্ষণেরই সহযাত্রী মনে করতে মন ওঠে না। বঙ্কিমের আমলে বিদ্যাসাগর এবং কেশব সেনের বিষয়ে বাংলার সাময়িক সাহিত্যে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ দেখা দিয়েছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮৭২-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ছাপা হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' তার-বছর দশেক পরের রচনা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই আমলের ব্যঙ্গ-গুরু। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁরই শিষ্য ছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু লেখক সে যুগে একই সঙ্গে বঙ্কিম এবং ইন্দ্রনাথ, উভয়েরই অনুকরণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় সে-সব কথার আলোচনা করেছেন।

ইন্দ্রনাথ হয়তো খুব বড়ো দরের লেখক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব বড়োই চিত্তাকর্ষক মনে হয়; এবং ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করলেও ঈশ্বর গুপ্তের চিত্ত-প্রকৃতির কোনো-কোনো বিশেষত্ব তাঁর মধ্যে অনুবাহিত হয়েছিল বলেই বোধ হয়। ১৮৬৯-এ তিনি বি-এ পাস করেন, ১৮৭১-এ বি-এল্। তাঁর বিবাহ হয়েছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই—বাংলা ১২৬৬ সালে। ছাত্রজীবনে তিনি প্রায় যাযাবর ছিলেন। তাঁর পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ণিয়ার উকিল। সেখানকার ইস্কুলে ইন্দ্রনাথ যখন নিচু ক্লাসে পড়েন, তখনই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তারপর কৃষ্ণনগরে, বীরভূমে, ভাগলপুরে নানা ইস্কুলে কাটিয়ে ১৮৬৩-তে তিনি প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হলেন। কলেজে ঢুকেও তাঁর ভ্রাম্যমাণ অবস্থার বদল হয়নি। জীবিকার ক্ষেত্রেও তিনি একাধিক আদালতে ওকালতি করেছেন—পূর্ণিয়ায়, দিনাজপুরে এবং কলকাতা হাইকোর্টে। ১৮৮১-র পরে হাইকোর্ট ছেড়ে তিনি তাঁর আপন জেলা বর্ধমানে ফিরেছিলেন। বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছাকাছি গঙ্গাটিকুরি-ই তাঁর স্বগ্রাম।

'স্বর্ণলতা'-র প্রসিদ্ধ লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার দিনাজপুরে যান। সেটা

বাংলা ১২৭৯-৮০ সালের কথা। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' তখন 'স্বর্ণলতা' ছাপা আরম্ভ হয়েছে। ইন্দ্রনাথ তাঁরই অনুরোধে তাঁর 'বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস' 'কল্পতরু' লিখেছিলেন। ব্রহ্মনিন্দার জন্যে 'কল্পতরু' জ্ঞানাঙ্কুরে ছাপা হয়নি। ১২৮১ সালে ইন্দ্রনাথ নিজের খরচে বইখানি ছেপে বার করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম সে বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনার মধ্যে লিখেছিলেন—'বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালায় প্রধান লোকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।' হুতোমের রুচিবিকার এবং টেকচাঁদের নীতি-পূজার বাড়াবাড়ি, 'কল্পতরু'-তে দু'য়ের কোনোটিই ছিল না বলে বঙ্কিম মনে করেছিলেন। 'কল্পতরু'-র পরে 'ভারত-উদ্ধার' ব্যঙ্গ-কাব্যের মধ্যেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদনকে বলেছিলেন—'সমিল-পদসূদন শ্রীমধুসূদন'! কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁর শিষ্যস্থানীয় বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মতন বহুমুখী রচনাশক্তি ছিলনা তাঁর। এই বহুমুখিতাই ইন্দ্রনাথের দোষ, বহুমুখিতাই তাঁর গুণ। কথাটা একটু বিস্তৃতভাবেই বলা দরকার।

বাংলা ১২৭৭ সালে শ্রাবণ মাসে ইন্দ্রনাথের প্রথম বই 'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্' ছাপা হয়। তখন তাঁর ছাত্রাবস্থা। কম বয়সের অপরিণত মনের উৎপাতই 'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্'-এর মূল প্রেরণা। তিনি নিজে লিখে গেছেন যে, গুপ্তপ্রেসে সে সময়ে একখানি বাংলা নাটক ছাপা হচ্ছিল। 'সেই নাটক দেখিয়াই একটুকু ব্যঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইল; অতি ক্ষুদ্রকায় এক কবিতা পুস্তক লিখিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম—'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্'···পুস্তকের মূল্য করিয়াছিলাম ১২॥ সাড়ে বারো গণ্ডা, অর্থাৎ আড়াই পয়সা, তাহাতে ভারি রঙ্গ হইল, প্রত্যেক ক্রেতাকেই অন্যস্থান হইতে আধলা ভাঙ্গাইয়া আনিতে হইয়াছিল; কেননা কেহ তিন পয়সা দিতে আসিলে তাহা লওয়া হইত না।" এই রঙ্গ-স্বভাবই ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ! ১৮৭০-এর 'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্'-এ তাঁর যে-মন আত্মপ্রকাশ করেছিল,—পরে 'কল্পতরু','ভারত-উদ্ধার' ইত্যাদি রচনার মধ্যে এবং আরো পরে ১৮৮০-র কাছাকাছি সময়ে যখন 'পঞ্চানন্দ' লেখা শুরু হয়, তাতেও সেই রঙ্গপটু, হালকা মনেরই অভিব্যক্তি দেখা গেছে। সে হালকা ভাব প্রায় ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত। 'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্' বইখানির প্রথম পৃষ্ঠার (মোট ২৪ পৃষ্ঠার বই) দিকে নজর দিলেই সে ভাঁড়ামির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। বইয়ের নামের নিচে ছাপা হয়েছিল—"শ্রীমতা গ্রন্থকর্ত্রা এণ্ড কোঙা বিরচিতং",—তার নিচে ছিল "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। পাতা উল্টে গেলে পরের যে পৃষ্ঠাটি নজরে পড়ে, তাতে প্রথমে 'ঈশ্ তাহার'-শিরোনামে, এবং পরে 'লুটীশ'-শিরোনামে কয়েক ছত্র বিজ্ঞপ্তি আছে। 'ইস্তাহার' এবং 'নোটিস'-এর ব্যঙ্গময় অপভ্রংশ বানিয়ে বালক ইন্দ্রনাথ যেসব মন্তব্য লিখেছিলেন, সেগুলি কিন্তু বালকোচিত সারল্যের নমুনা নয়! তারপর 'মুখবন্ধ'। তাতে আর এক দফা ভাঁড়ামি ছাপা

হয়েছিল। 'উৎকৃষ্ট-কাব্যম্'-এর না ছিল কাব্যমূল্য, না ছিল উঁচু দরের হাস্যমূল্য। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে প্রগল্‌ভ অর্বাচীনের উৎকট বাচালতার যেসব নমুনা পাওয়া যায়,—মানীর মান হরণের যেসব উদাহরণে অবিবেকী পাঠকের মন সহজ ফুর্তি অনুভব করে থাকে, ইন্দ্রনাথের ঐ ব্যঙ্গকাব্যের প্রথম কবিতাটিতেই সেই রকম কিছু কণ্ডূয়ন ছিল। মধুসূদনের নামধাতুর ঝোঁক এবং তাঁর বন্ধনী-চিহ্নের অতি-প্রয়োগ,—এই দুটি স্বভাবের সমালোচনা লিখে ইন্দ্রনাথ তাঁর ঐ কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ'। রবীন্দ্রনাথ তখনো অবিশ্যি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন নি। তবু, রাম না আসতেই রামায়ণ শুরু হয়েছিল বলে বোধ হয়। বঙ্গভাষাকে নয়নের জলে ভাসতে নিষেধ করে ইন্দ্রনাথ তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে—

সন্ত জনমিলা, অমনি
কবিতাইলা, কত কবি-সুত তব; তীক্ষ্ণবুদ্ধি-রূপ
সুতা যোগে যারা গাঁথিয়া গৌড়ীয়া গড়্যা
(যার অর্থ মালা) (বেলফুল দলে যেন
নূতন বাজারে কত মালী) পরাইলা তব গলে,
বালে! বয়স এখন তোর কাঁচা, ওলো ধনি!

সেদিনের বঙ্গভাষার 'কাঁচা বয়সের' উল্লেখ লক্ষ্য করে আজ এতোদিন পরে, এ-যুগেও ইন্দ্রনাথের রসিক-স্বভাবের তারিফ করতে ইচ্ছে হয়। যাই হোক্‌, তারপর তিনি বলেছিলেন—

এর মধ্যে দত্ত-দত্ত অমিত্রে, তোমার কণ্টক
পদ্যের মিল দেখ পরিষ্কৃত; মিউনিসিপালিটির
গুণে দেখ যথা জঙ্গল। —মুছিয়া দেখ আঁখির
সলিল, অদূরে সুকাব্য-রবি উদি, আলোকিবে
ভাল তব; দূরাইবে মিলের বারিদে!

—অর্থাৎ সুকাব্যের সূর্যোদয়ের ফলে মিলের মেঘ-দুর্যোগ অচিরে অন্তর্হিত হবে! 'রবি'-শব্দটিতে কবি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ ধরলে চলবে না। ১৮৭০-এ রবীন্দ্রনাথ মাত্র ন'বছরের বালক ছিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁর কথা বলেন নি নিশ্চয়। এবং ঐ কবিতার শেষ দুই ছত্রে যা বলেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় রূপকের দিকে ব্যঙ্গ-কটাক্ষ ছিল বলে পুনরায় ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। ইন্দ্রনাথ কাঁচা বয়সের সুন্দরী বঙ্গভাষার গলায় তাঁর নিজের কাব্যমালিকা উপহার দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

এই নাও! আমিও দি একগাছী মালা
সস্তা বলি ঠেলি ফেলি দিওনা লাথিয়া।

'একগাছি মালা' কথাটা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কথামালার অন্যতম। ! তাই বলছিলাম, রাম না আসতেই রামায়ণ শুরু হয়েছিল বোধ হয়।

প্রথম কবিতাটিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিল-বর্জিত স্বাধীন সৌন্দর্যের ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়ে যে সান্ত্বনার কথা শোনানো হয়েছিল, দ্বিতীয় রচনায় সেই ভাবনারই অনুবৃত্তি চলেছে। এগুলি তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ 'উদ্গার' নামে অভিহিত করেছিলেন। মিল বর্জনের ফলে—

স্বাধীনতা কাল হল
কত রঙ্গ দেখাইল
হায়! প্রেয়সীর হাত
যে সে এসে ধরে রে!
কবিতা কোমল বধূ
ছিল তা আমার শুধু
শত্রু তার করে ধরে
দেখে ভয় করে রে!

ভারতচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত ইত্যাদি সবাই দেহরক্ষা করেছেন ভেবে ইন্দ্রনাথ তখন অতিক্রান্ত অতীতের জন্যে মনের কষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর তৃতীয় উদ্গারে 'বই লেখা'-র বিষয়ে তিনি জানিয়েছিলেন:

মানস গোলাপ ফুলে 'বইলেখা' পোকা
কি কুক্ষণে পশিয়াছে, তাই ভেবে বোকা
হইলেন বঙ্গদেশ, আমি একা নই।

প্রসঙ্গতঃ ইংরেজি 'নভেল'-এর একটি প্রতিশব্দ বানিয়েছিলেন তিনি। বঙ্কিমের মতন 'নভেল' কিংবা দীনবন্ধুর মতন নাটক ক'জন লিখতে পারে? তবু লেখবার সাধ হয়। সে অবস্থায় বেশির ভাগ লেখকই নকল করে থাকেন। এইসব কথার সূত্রে ইন্দ্রনাথ আরো চড়া ভাষায় বলেছিলেন:

বঙ্কিমের মত নাই কলমের জোর,
নবাখ্যা লেখা হল না, এ রাত্তি ত ভোর।
ওই দেখ দীনবন্ধু! তোমায় দেখিয়া
নাটক লিখিতে যান কত কত মিয়া!
শিকায় তুলিয়া মান, কানকাটা যত
দুই গালে চূণ-কালি লেপি অবিরত,
লেখনী সিঁধের কাটি হাতে, চুরি করি,
বই না বাহির হতে হয় ধরাধরি।

উপন্যাসের ঐন্দ্রনাথীয় প্রতিশব্দ 'নবাখ্যা' কথাটা বাংলা সমালোচনার পরিভাষায় গৃহীত হয়নি। তাঁর উপদেশও বেশি লোকের চোখে পড়েনি। তিনি বলেছিলেন :

নাটক লিখিয়া কেন খাটিব ফাটক ?
মজা করে কাব্য করি নাহিক আটক।

বোধ হয়, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর (১৮৬০) দিকে লক্ষ্য রেখেই 'ফাটক' খাটবার কথা তুলেছিলেন তিনি। আর ইন্দ্রনাথ নিজে মিত্রাক্ষরে লিখবেন, না-কি অমিত্রাক্ষরে লিখবেন, এই দোটানায় পড়ে (সবটাই ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে) বলেছিলেন যে, মিল-সমৃদ্ধ কবিতা বটতলার ছাপাখানা থেকে ছেপে নিতে বাধা নেই,—আর অমিল অমিত্রাক্ষরে লিখলে বউবাজারের ঈশ্বরচন্দ্র বসুর যে স্ট্যানহোপ-প্রেসে সে সময়ে মধুসূদনের বই ছাপা হোতো, সেখান থেকে ছেপে বের করা যেতে পারে! উত্তেজনা ছড়িয়েই যদি নাম করতে হয়, তাহলে কেশব সেনের পথ ধরলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হবে! আর, বই লিখে খ্যাতি কুড়োবারই যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে সে-পথও দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর এই সব কথার মধ্যে আঠারোর শতকের পোপের কিঞ্চিৎ স্বাদ রয়ে গেছে। এবং এই কারণেই আরো কয়েক ছত্র এখানে তুলে দিতে হোলো—

কোন বর্ণ যদি মিলে, বটতলা আছে।
না মিলিল, বয়ে গেল, বসুজার কাছে।
বড় পরিচয় দিতে সাধ যদি চিতে,
গোল কর, কেশব হইবে আচম্বিতে।
শুধু যদি বই লিখে বড় হতে চাও,
ছোট আড়া কাগজেতে চৌদ্দ আঁক দাও।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মাত্র কুড়ি বছরের বালকের পক্ষে (নবযুবক বলতেও আপত্তি নেই) এরকম চতুরালি প্রকাশ করা সত্যিই শক্তির পরিচায়ক। প্রায় চল্লিশ বছর পরে প্রমথ চৌধুরী প্রায় একই ভাষায়, একই সুরে কাব্যতত্ত্বের ভিন্নকালীন আদর্শ প্রকাশ করেছিলেন অনুরূপ ব্যঙ্গের রীতিতে। তিনি লিখেছিলেন :

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,—
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা।

এবং তথাকথিত 'বড়ো কবি' হতে হলে চাই—'দরকারি ভাব আর সরকারী ভাষা'! প্রমথ চৌধুরীর ফরাসীয়ানার কথা নিত্য শোনা যায়। তাঁর ভারতচন্দ্র-

বন্দনাও সর্ববিদিত। সেই সঙ্গে ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও ভেবে দেখা সঙ্গত। এখানে সে প্রয়োজনের কথাটা প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা গেল।

ইন্দ্রনাথের গদ্যে ভাঁড়ামির স্বাদটাই মুখ্য। কিন্তু তাঁর প্রথম বয়সের ত্বরায় উৎপন্ন এই মুষ্টিমেয় পদ্যের মধ্যেই প্রকৃত রুচিসম্মত চাতুর্যের নমুনা আছে। খবর-কাগজের সম্পর্ক তিনি যদি আর একটু এড়িয়ে থাকতে পারতেন, তাহলে 'সবুজ পত্রের' প্রমথ চৌধুরীর অনেক আগেই আমরা 'বীরবলী' পদ্যের প্রথম দৃষ্টান্ত পেতাম তারই প্রসাদে। তবে, সাহিত্যের শিল্প-প্রসাধনে তাঁর খেয়াল ছিল না,—আঙ্গিক বা কলাবৈচিত্র্য নিয়েও তিনি আদৌ ভাবিত ছিলেন না। তাঁর লেখাতে লাবণ্য নেই,—আছে চটক, মজা, ফুর্তি! সে-সবই কিন্তু সহজ সঞ্চার; সে সবই যেন অশিক্ষিত পটুতার উদাহরণ! গদ্যে, পদ্যে,—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। ভাওয়ালের গোবিন্দ দাসের মতন তিনিও স্বভাব-কবির দলে পড়বেন। কিন্তু তার স্বভাব-প্রগল্‌ভতার মধ্যেই একরকম সহজ বৈদগ্ধ্যের চিহ্ন থেকে গেছে। যেমন—

মহাদেব গাইলেন পঞ্চ রসনায়
ধরণীর কথা; আহা! সেই মহাদেব,
যিনি শূলপাণি শিব, ভূত মোসাহেব,
শ্মশাননিবাসী—(হেন কত বিশেষণ
আছে, তাহা দিয়া ফল বল কি এখন ?)
যাউক সে কথা—আর দেখ যে অনন্ত
কতেক ধরিল ফণা, মুখে কত দন্ত!
—(পদ্য অনুরোধে মাত্র এ কথাটি বলা।)
আরো দেখ, গগনের চাঁদ ষোলকলা।

কিংবা—

সকলে দেখেছে মোরে, কেহ নাহি চিনে,
বয়সের সঙ্গে বিদ্যা বাড়ে দিনে দিনে।
গ্রন্থ লিখিবারে পারি, লেখাও হয়েছে,
কিন্তু না বিকায় কভু, দোকানে রয়েছে;
তাই এইবার পুনঃ লিখিলাম বই।
কর্ণরূপ মুখে খাব যশোরূপ দই।

—ইত্যাদি বাক্‌পটুতার উদাহরণ প্রমথ চৌধুরীর কথাই বার বার মনে আনে। দ্বিজেন্দ্রলাল আরো উচ্ছ্বসিত,—আরো অসংযত। রজনীকান্তের মধ্যে মননময়, বাগ্‌ভঙ্গির হাস্যচ্ছটা খুবই বিরল। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা চলে, এমন কোন স্মরণীয় নাম মনে

করতে হলে, বিজয়চন্দ্রেরই কথা বলতে হয়। ১৯১১-তে তিনি মারা গেছেন। মননময় হাসির কবিতা লিখে তিনিও বেশ নাম করেছিলেন। ইন্দ্রনাথের কাছে বোধ হয় তাঁরও কিছু ঋণ ছিল;—প্রেরণার ঋণ! একালে বিজয়চন্দ্রের নামও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে! মহাকাল বড়ো খেয়ালী! সাহিত্যের খ্যাতি সেই খেয়ালী অদৃষ্টেরই দান!

ইন্দ্রনাথ প্রধানত গদ্যের রাস্তা ধরেই সেকালের পাঠকের মনোলোকে পৌঁছেছিলেন। তবে, তিনি পদ্যচর্চাও কিছু কম করেন নি। কিন্তু বঙ্কিমের প্রশংসা সত্ত্বেও একালের পাঠক সত্যিই কি ইন্দ্রনাথের কথা ভেবে দেখেছেন? ইন্দ্রনাথের রচনা তো আলমারিতে তুলে রাখবার 'প্রাচীন সাহিত্য' নয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ক্ল্যাসিক্‌সের পর্যায়ে পড়ে। পঞ্চানন্দের লেখক পাঁচু ঠাকুরের কোনো লেখাই কিন্তু সেরকম নয়। তিনি প্রতিদিনের স্থূল সংসারের সাহিত্যিক। গদ্যে-পদ্যে, সংযমে-অসংযমে, বহুমিশ্র, বহুবিচিত্র সেইসব লেখার মধ্যে ১৮৮০-র কাছাকাছি থেকে শুরু করে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর এদিক্‌কার,—অর্থাৎ আমাদের শতকের প্রথম কয়েক বছর অবধি যেসব ঘটনা এবং ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেই যাবতীয় বৈচিত্র্যেরই সরস প্রতিফলন ঘটেছে। ইন্দ্রনাথের কথা সেই সূত্রেই মনে এলো। এবং যেমন তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে,—তেমনি তাঁর সমালোচনা সম্বন্ধেও এই কথাটাই সর্বাধিক মনোযোগ দাবি করে, যে, তাঁর অজস্রতার মধ্যে সত্যিই আহরণযোগ্য পদার্থ আছে। ইন্দ্রনাথের বিচিত্র লেখার সুনির্বাচিত একটি সংকলন ছাপা হলে ভালো হয়।

বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রবন্ধ

'প্রবন্ধ' যে প্রকৃষ্ট বন্ধ,—অর্থাৎ তাতে বলবার কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বলে ফেলাটাই যে স্বীকার্য রীতি, সে-বিষয়ে মতান্তর নেই। তবু তারই মধ্যে তারতম্য আছে। লেখকের মনের ভঙ্গি বা চাল, কোনোটাই কোনো-একমাত্র আদর্শ মেনে চলে না। কেউ কেউ বক্তব্য বিষয়টাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা সোজাসুজি তথ্য সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেসব লেখাতে বিশ্লেষণ, বিতর্ক এবং প্রমাণের দিকেই নজর বেশি দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যিক-প্রবন্ধের জাত আলাদা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধে তর্ক-বিতর্ক বা প্রমাণ সিদ্ধান্তের সংকল্প থাকা যে দোষের, বা তা যে একেবারেই না থাকে, সে-কথা নয়। তবে, লেখকের বিশেষ বক্তব্য, এসব ক্ষেত্রে তাঁরই নিজের মনের প্রীতি-অপ্রীতি বা আবেগের ওঠা-নামার সঙ্গে জড়িত হয়ে দেখা দেয়। অনেকদিন আগে, সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনী', 'পালামৌ' এবং 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' সমালোচনা করতে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসু এই বিশেষ মনোভঙ্গির কথাই কিঞ্চিৎ

বিশদভাবে জানিয়েছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানতঃ তাঁর 'পালামৌ' লেখাটির জন্তেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সেই ভ্রমণ-কাহিনীই বোধ হয়, তাঁর সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুকেও অভিভূত করেছিল। সেকালে চন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের মনোভঙ্গির কথা বলতে গিয়ে হয়তো সেই কারণেই লিখেছিলেন: 'একস্থান হইতে আর একস্থানে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই যতদূর সম্ভব সোজা গিয়া থাকে। যেখানে না দাঁড়াইলে চলে না, কেবল সেইখানে এক একবার দাঁড়ায়। কিন্তু সঞ্জীববাবু তেমন করিয়া পথ চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান…।…কখনও বা পথ ছাড়িয়া একটু এদিকে একটু ওদিকেও যান। তাঁহার কণ্ঠমালা ও মাধবীলতাতে তাঁহাকে এইরূপ চলা ফেরা করিতে দেখিতে পাই।'

সঞ্জীবচন্দ্রের এসব বই উপন্যাস। উপন্যাসের রীতি, শুধু সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষেত্রে কেন, —অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর থেমে-থেমে, ঘুরে-ঘুরে চলারই অনুকূলে। তবে মূল কাহিনী ছেড়ে দিয়ে বেশিক্ষণ বেশি দূরে বিচরণের স্বভাব উপন্যাসও বরদাস্ত করে না। প্রবন্ধ-রূপের মধ্যেও সে রকম অতিঅবান্তরতার প্রশ্রয় নেই।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'-এর মধ্যে থেমে-থেমে, দেখে দেখে চলবার রীতিটিতে তাঁর স্বকীয়তা যে গভীর ভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, সে-কথা জানাতে গিয়ে চন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'এ প্রণালীর অর্থ—সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, বা যেরূপে দেখে না, তাহাই দেখা বা সেইরূপ দেখা।'

প্রবন্ধের পাত্রে সৃজনশীল মনের স্বকীয়তা এবং এইরকম পর্যবেক্ষণ-সামর্থ্যের ভূরি-পরিমাণ উদাহরণ দেখা গেছে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলীর মধ্যে। সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৭-১৮৮৯) মৃত্যুর ঠিক দশ বছর পরে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর কথা ভাবতে গেলে,—অন্ততঃ মৃত্যুকালের হিসেবে, সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নৈকট্যের কথাটা প্রথমেই মনে পড়ে।

আঠারো শ' সত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের ছ' তারিখে বীরেন্দ্রনাথের পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। আর শতাব্দের শেষ বছর,—আঠারো শ' নিরানব্বুইয়ের বিশে আগস্ট, মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যে তাঁর তিনখানি মাত্র বই বেরিয়েছিল—নিবন্ধসংগ্রহ 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪) এবং কাব্যগ্রন্থ 'মাধবিকা' (১৮৯৬) আর 'শ্রাবণী' (১৮৯৭)। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর আট বছর পরে উনিশ শ' সাত সালের আগস্ট মাসে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা-সংবলিত তাঁর গ্রন্থাবলী ছাপা হয়। কিন্তু সে-সংগ্রহ সম্পূর্ণও নয়,—আর, তাতে কালানুক্রমে তাঁর লেখাগুলি সাজিয়ে দেবার চেষ্টাও ছিল না। ফলে, সে সংকলন থেকে বলেন্দ্রনাথের শক্তির এবং তাঁর মতামতের ক্রমপরিণতি বোঝবার উপায় ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই সে কথা বলে গেছেন।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তেরশ' ছয় সালের আশ্বিন-কার্তিকের 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রিয়নাথ সেন তাঁর গদ্য-পদ্য সবরকম রচনার 'স্বাতন্ত্র্য' সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করেন। বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের খুবই সন্নিহিত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলেন্দ্রনাথ যে নিজের 'স্বাতন্ত্র্য' রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তার প্রধান কারণ এই যে, তাঁর নিজের সত্যিকার কিছু 'মূলধন' ছিল। তাঁর এই 'মূলধন'-প্রদর্শনও প্রিয়নাথেরই কৃতিত্বে! শুধু তাই নয়, প্রিয়নাথ লিখেছিলেন : 'তিনি জন্মকবি—আজন্ম রচনা-রসিক (Stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়ই তাঁহার নিজস্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, পদ্যে তাহা পারেন নাই।...'

বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং জাঠতুতো ভাই ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়নাথের সেই প্রবন্ধ পড়ে বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশের উৎসাহ পেয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর অতঃপর সেই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখে দেন।

প্রথমে প্রিয়নাথ এবং রবীন্দ্রনাথ,—তারপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—এই তিনজন সাহিত্যবোদ্ধার স্বীকৃতি এবং সমর্থনের ফলে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারায় বলেন্দ্রনাথের নামটি বিশেষ স্মরণীয় বলে গৃহীত হয়েছে। তাঁর শব্দচয়ন এবং রীতিগত বিশিষ্টতা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর আগেই,—'প্রদীপ'-এর যে-সংখ্যায় প্রিয়নাথের প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, সেই সংখ্যাতেই বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি অসমাপ্ত রচনার মধ্যে 'শিবসুন্দর' নামে একটি লেখা নিজেই সম্পূর্ণ করে, রবীন্দ্রনাথ সেগুলি প্রকাশ করেন এবং সেই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যক্তিগত খবরের মধ্যে একথাও বলেছিলেন যে—'বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয়প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন।'

'বিশ্বভারতী' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি চিঠি এবং মন্তব্য ছেপে দিয়েছিলেন। পরে, তেরশ' চৌষট্টি সালের চৈত্রে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সে-সব তথ্য পুনর্মুদ্রিত করেছেন। তারও বছর পাঁচেক আগে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (১৭ই আশ্বিন ১৩৫৯—ইং ৩রা অক্টোবর, ১৯৫২) কয়েকমাস পরে, তেরশ' উনষাট সালে অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ সম্পাদনা ঐ বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ! তাঁর সহযোগী সজনীকান্ত সে-কথা স্মরণ করেছেন।

নিজস্ব কীর্তিগুণে তো বটেই, তা ছাড়া অকালমৃত্যুর অনুষঙ্গে জড়িত হয়ে বলেন্দ্রনাথের নামটি একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকচিত্তে বেশ সমাদরের সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু অকালমৃত্যুই তাঁর খ্যাতির প্রধান কারণ নয়। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর

সংযম এবং সামঞ্জস্যবোধের প্রশংসা করে গেছেন। তাঁর গৃহীত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের উল্লেখ করে রামেন্দ্রসুন্দর যে-তালিকা সাজিয়েছিলেন, তাতে কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানবসমাজ ও গৃহস্থ-গৃহ, মানবের চিত্ত ও মানবের জীবন—বিশেষতঃ এই ক'টি বিষয়ের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল। বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, 'বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গল শঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত স্বদেশীকে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষ তখনও শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।'

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার সুযোগ পাননি বটে। তবে, অল্প কয়েকদিনের জন্যে বলেন্দ্রনাথকে তিনি যেটুকু দেখেছিলেন, সেইটুকুর মধ্যেই তাঁর মনে হয়েছিল যে, বলেন্দ্রনাথ যেন বালকবেশী প্রৌঢ়! তাঁর নিজের কথাতে—'বালকের মূর্তির ভিতর প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য দেখিতে পাইতাম। তাঁহার পরিমিত স্বল্পাক্ষরবদ্ধ উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর যেন একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখিতাম। তিনি যেন পর্যবেক্ষক মাত্র; সংসারের চক্রে তাঁহাকে যেন কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু তিনি তাঁহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র, উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন না। উহার উন্মত্ত কোলাহলে যোগ দিতে তিনি যেন অক্ষম। সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্যকলার উপভোগের জন্য যেন তিনি উপস্থিত আছেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে দৃঢ়স্পর্শে আঁকড়াইয়া ধরিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।'

'চিত্র ও কাব্য' বইখানি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের আটটি প্রবন্ধের সংগ্রহ। এ সম্ভার তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। আরো কিছুদিন তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে এ বইয়ের পরবর্তী কোনো সংস্করণে 'উত্তরচরিত', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', 'কাব্যে প্রকৃতি', 'জয়দেব', 'পশুপ্রীতি', 'মৃচ্ছকটিক', 'রবি বর্মা' এবং 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র'—মোট এই আটটি প্রবন্ধের সঙ্গে ১২৯৮ সালের 'সাধনা'তে প্রকাশিত 'ঋতুসংহার'—কিংবা ঐ বছরের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'শিব'—বা ঐ মাসেই 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি ও সেন্টিমেণ্টাল' লেখাগুলিও হয়তো সংযোজিত হোতো। ১২৯৮ সালের পৌষের 'সাধনা'তে তাঁর 'রত্নাবলী' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। 'ভারতী ও বালক'-এর ১২৯৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর 'রাধা',—আশ্বিন সংখ্যায় 'দুষ্মন্ত'—এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে

'যশোদা' ছাপা হয়েছিল। হয়তো এসব—এবং নানা মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত এইরকম আরো কোনো কোনো কাব্যপ্রসঙ্গের আলোচনা তিনি অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন 'চিত্র ও কাব্য' দ্বিতীয় সংস্করণে সংকলিত করে যেতেন। কিন্তু মৃত্যু সে সম্ভাবনার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। এইসব লেখার স্থায়িত্ব-বিচারের কিংবা উপযুক্ত পরিমার্জন-প্রয়াসের সময় ছিল না তাঁর হাতে। তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত এইসব প্রবন্ধের জন্যে—বিশেষতঃ প্রাচীন সংস্কৃত এবং বাংলা কাব্যের ঐশ্বর্য দেখিয়ে দেবার যে ঐকান্তিক আগ্রহ ফুটে উঠেছিল এইসব লেখাতে,—সেদিক থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একই পংক্তিতে আসন দাবি করতে পারেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের গুণ এবং আস্বাদনের বিশিষ্ট সামর্থ্য ফুটেছিল এই লেখাগুলিতে। সেই সঙ্গে থেমে থেমে চলবার যে সাহিত্যিক-ভঙ্গির কথা আগেই বলা গেছে, সে-ভঙ্গিও এসব ক্ষেত্রে চোখে পড়বার মতন। যেমন, কালিদাসের রঘুবংশের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে 'রঘুবংশ'কে যে খণ্ড খণ্ড চিত্রের ধারা বলা যেতে পারে, সেই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করতে গিয়ে 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা'তে বলেন্দ্রনাথ তিনটি ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদে তাঁর এই বক্তব্যের ভূমিকা উত্থাপিত করে চতুর্থ অনুচ্ছেদে সোজাসুজি বলেছেন : 'রঘুবংশের বিষয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিবস্বৎকুলের বর্ণনা। কোন মূল ঘটনাও নাই, বিশেষ নায়কও নাই, এবং রাজচরিত্রের একটা আদর্শস্থাপন কিংবা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখা যায় না। তবে এত বিষয় থাকিতে প্রাচীন বংশাবলী বর্ণনায় কবির এত উৎসাহ কেন ?'

বলেন্দ্রনাথ তাঁর পাঠকের মধ্যে এই প্রশ্নমনস্কতা সঞ্চার করে দিতেই ব্যগ্র ছিলেন। এ তাঁর আস্বাদনেরই অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' এবং অন্যান্য সাহিত্য-প্রবন্ধের মধ্যেও এ-রীতি দেখা যায়। রঘুবংশের এই খণ্ডচিত্রণের কারণ দেখাতে গিয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেছে : 'শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্র চিত্রিত আবরণ নির্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমনি মানবপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র-আকারে পরিস্ফুট করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের ন্যায় প্রায়-অসংলগ্ন সর্গপরম্পরায় এই ছবি আঁকিবার অনেকটা অবসর পাওয়া যায়।'

অতঃপর রঘুবংশ থেকে কয়েকখানি ছবির উল্লেখ করেছেন তিনি—দিলীপ-দম্পতির তপোবনে গমন ; রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয় ; ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর ; দশরথের মৃগয়াগমন ;

রামসীতার রথযাত্রা; পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী; অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এবং এই ছবির তালিকা শেষ করেই আর কালব্যয় না করে সংক্ষিপ্ত একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে তিনি জানিয়ে গেছেন—'এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম!'

সাহিত্যের আসরে প্রয়োজনমাফিক দৃষ্টান্ত সাজিয়ে নিজের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ প্রবন্ধ লেখকমাত্রেই করে থাকেন বটে, কিন্তু লেখার স্তরে স্তরে এক-একটি সিদ্ধান্তের বিস্ময়চিহ্ন যোগ করা, আর সেই সঙ্গে পরবর্তী স্তরের ভূমিকার কাজটুকুও একই প্রযত্নে সুসম্পন্ন হতে দেওয়া মোটেই সাধারণ ক্ষমতা নয়! বলেন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে সেই শক্তিরই নিদর্শন রেখে গেছেন। আগের অনুচ্ছেদে যে চিত্রমালার উল্লখ করা হয়েছে,—বলেন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে অতঃপর সেগুলির বিস্তৃততর বর্ণনা দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে বিস্তারে এগিয়ে যাবার আগেই ঐ হ্রস্ব, তীব্র কৌতূহলোদ্দীপক 'এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম' মন্তব্যের আঘাতটুকু চমকপ্রদ! এবং চিত্রবর্ণনায় উদ্যত হবার প্রাক্কালে তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যও ঠিক এক-কথার পুনরাবৃত্তি নয়। তিনি বলেছেন,—'রঘুবংশে চরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল বর্ণনামাত্র, চরিত্র হয় নাই।' যথাসম্ভব অল্প কথায় এই দুটি মন্তব্য জানিয়ে তিনি একে একে, তাঁর অভ্যস্ত সাধু বাংলা গদ্যে, প্রদত্ত চিত্রতালিকার বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করেছেন।

তপোবনের পর্ণশালায় দিলীপদম্পতি নন্দিনী ধেনুর সেবা করেন। নন্দিনীর বরে সুদক্ষিণা অন্তঃসত্ত্বা হন। সুদক্ষিণার সে-সময়ের দোহদশ্রীর কথা-প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ একথা জানাতে ভোলেন নি যে—'এই দোহদচিত্র রঘুবংশে আরও দু'এক স্থলে দেখা যায়। রামচন্দ্রও একদিন আলেখ্যগৃহে বসিয়া অঙ্কনিষণ্ণা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি সাধ যায়; এবং তদুত্তরে সীতা—বোধ করি, চতুর্দিকের বনবাস-বৃত্তান্তালেখ্যদর্শনে—আর একবার সেই ঋষিকন্যাপরিবৃত তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।'

এই অনুষঙ্গসমৃদ্ধি বলেন্দ্রনাথের আর এক বিশেষত্ব! কথায়-কথায় রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের মৃগয়াবর্ণনার পার্থক্যের দিকটি দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে কালিদাসের সে-বর্ণনা 'শৌখীন বিলাস মাত্র'—রামায়ণে সে-রকম বসন্ত, মলয়ানিল বা মদনশরের লালিত্য নেই।

পর্যবেক্ষণ, আস্বাদন, কৌতূহল-সঞ্চার, অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধি এবং শব্দজ্ঞান—এই পাঁচটি ঐশ্বর্যে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটিই সমৃদ্ধ। তবে, এই আস্বাদনের সঙ্গে এই পঞ্চাঙ্গের বাকি চারটির যোগের প্রকৃতি এখানে একটু ভেবে দেখা দরকার। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আস্বাদন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এবং লেখক হিসেবে তিনি যখনই যা কিছু দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আস্বাদন-সামর্থ্য উৎসাহিত হয় বলেই তাঁর সমস্ত

দেখার কাজই তাঁর হৃদয়াবেগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে স্ফুরিত করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, দেখা, ভাবা এবং ব্যাকুলতা বোধ করা—এই তিন রকম ক্রিয়া তাঁর মনে যেন একই সঙ্গে ঘটতে থাকে! তাঁর মনন-প্রবাহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য-প্রসঙ্গ,—সেই সূত্রেই, কখনো ধীরে ধীরে, কখনো-বা একই সঙ্গে ভিড় করে আসে। অতএব, অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধি গুণটিও ঐ আস্বাদন-প্রকৃতির সঙ্গেই কেন্দ্রগত যোগে আবদ্ধ। আর, কৌতূহল সঞ্চার করবার যে-দক্ষতার কথা বলা হয়েছে, সেটিও একইভাবে তাঁর পর্যবেক্ষণ-আস্বাদন প্রক্রিয়ারই আর এক অভিব্যক্তি। এবং তাঁর ভাষাজ্ঞান তাঁর এইসব অভিজ্ঞতাজনিত অনুভূতি আর অভিপ্রায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধা পায় না বলেই তিনি কখনো লেখেন—'জলক্রীড়াকালে তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের স্তন-চন্দনপ্রক্ষালনে কালিন্দীর নীল জল যেন শুভ্র গঙ্গোর্মিসংযুক্ত হইয়া শোভা পায়'—আবার অন্যত্র মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কথা-প্রসঙ্গে বলেন—'ভাবের চরিত্র কবিকঙ্কণে নাই—সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যেই মুকুন্দরামের অবস্থিতি।' প্রথম উদাহরণটি 'চিত্র ও কাব্য' সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ থেকে এবং শেষেরটি ১২৯৬ সালের 'ভারতী ও বালক'-এ প্রকাশিত 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' থেকে তুলে দেওয়া গেল।

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' বইখানির মধ্যে বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সম্বন্ধে বলেছেন: 'মূলত সাধুভাষা হইলেও ইহাতে কথ্যভাষার রীতি সঞ্চার হওয়াতে সরসতার স্পর্শ লাগিয়াছে।' কিন্তু 'কথ্যভাষার রীতি' বল্‌লে কি কি গুণ বা কোন্ কোন্ বিশেষত্বের ধারণা জাগতে পারে? বলেন্দ্রনাথ অনেক জায়গাতেই কথ্যভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন। কথ্য রীতিতে আমরা খুব বেশি দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করি না। সেও কথ্যরীতিরই অন্যতম বিশেষত্ব। সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের সঙ্গে খুবই পরিচিত কথ্যশব্দের নিকট সমাবেশের নমুনা তাঁর গদ্যে মোটেই বিরল নয়। 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' লেখাটির মধ্যে তিনি বলেছেন—'নহিলে, মদনভস্মের চিত্রে চিত্রকর মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা বাহির করিয়া দিবেন কেন?' এই 'ঝাঁটা'-কথাটি ভোলবার নয়। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধের শেষ ক'লাইনের মধ্যে তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত; বিদ্যাপতি কিছু ধীর।' সেখানকার এই বাক্য-গঠনের মধ্যেও কথ্যভাষার রীতি যে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতেও সন্দেহ নেই।

চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলনা করে তিনি একদিকে, বিদ্যাপতির হিন্দি-ঘেঁষা শব্দরীতি (ব্রজবুলি),—তাঁর পাণ্ডিত্য,—বাহ্যসৌন্দর্যে তাঁর অনুরাগ ইত্যাদি বিশেষত্বের উল্লেখ করেছিলেন, অন্যদিকে চণ্ডীদাসের খাঁটি বাংলা শব্দ-প্রয়োগ,—তাঁর সারল্য,—এবং

গভীর বেদনাবোধের কথা বলেছিলেন। অনেক পদাংশ তুলে দেখিয়ে, বলেন্দ্রনাথ, দুজনের পার্থক্য সম্বন্ধে যতো কথা বলেছিলেন—ততোধিক বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছিল এই লেখাটিরই শেষদিকে ব্যবহৃত 'যৌবনাচ্ছন্ন' শব্দটির প্রয়োগে। তাঁর সেই সংক্ষিপ্ত একটিমাত্র বাক্যের অর্থশক্তি বা দ্যোতকতা কম নয়। 'বিদ্যাপতির কবিতাকে চণ্ডীদাসের তুলনায় যৌবনাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে।'—এইরকম শব্দ-প্রয়োগের মধ্যে তাঁর মননগুণই আত্মপ্রকাশ করেছে—এবং এই মননগত মৌলিকতাই তাঁর আস্বাদনের বিশেষত্ব। মুকুন্দরামের কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম বাক্যেই তিনি তাঁর প্রধান বক্তব্যের দিকে পাঠককে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সেই বাক্যটি উদাহরণ হিসেবে এখানে তুলে দেখা উচিত: 'ভাবগত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া জাতিবিশেষের মধ্যে উন্নত ভাবের কতদূর চর্চা হইয়াছিল যেমন বুঝা যায়, সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিবার পক্ষে তেমন সুবিধা হয় না।' বিশেষ কবির ভাবৈশ্বর্য,—আর,—তিনি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সে সমাজের সাধারণ, বাস্তব, ব্যবহারিক রূপ—আদিতেই এই দুইয়ের গরমিলের দিকটি পাঠককে ভাবতে দিয়ে, তিনি অতঃপর প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত মুকুন্দরাম হৃদয়ের সুগভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারও বিরহ-বেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক, সে মিলনে দেহই বাঁচিয়া গিয়াছে।'

এই লেখাগুলির মধ্যে বলেন্দ্রনাথ নতুন তথ্যও দেননি, নতুন কোনো রকম বিশেষণচাতুর্যও দেখান নি। তাঁর সহজ, সচ্ছন্দ গতিভঙ্গিই তাঁর এসব প্রবন্ধের প্রধান আবেদন। চল্‌তে চল্‌তে থেমেছেন তিনি,—থামতে-থামতে চলেছেন; এবং সেই তাঁর নিজস্ব গতিবেগের গুণে তাঁর ভাষা কোথাও বা অতিশয় মসৃণ, আবার কোথাও বা সামান্য বন্ধুর হয়ে উঠেছে। 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস' প্রবন্ধ থেকে তাঁর এইরকম অনুভূতিসমৃদ্ধ বন্ধুরতার আরো কিঞ্চিৎ নমুনা তোলা যেতে পারে:

'কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুকুন্দরামের সমকালীন কবি। বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ণ পৌরাণিক প্রভাব মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস হইতেই একরূপ আরম্ভ বলা যায়! কৃত্তিবাস কবির ভাষা পড়িয়া কিন্তু মুকুন্দরামের বাঙ্গলাপেক্ষা অনেক সময় ভাল লাগে। তাহার একটা কারণ বোধ হয়, কৃত্তিবাসে মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘশ্মশ্রুবর্গের জবাই-দক্ষা ছুরিকা-ভাষার বড় তীব্র কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না।'

'জবাই-দক্ষা ছুরিকা-ভাষা'র কণ্ঠধ্বনি! এরকম অলঙ্কৃতি বলেন্দ্রনাথের স্বভাব নয়। এ তাঁর স্বভাবের ব্যতিক্রম।

Fine Arts-এর বঙ্গানুবাদে 'ললিত কলা' এবং 'সুকুমার শিল্প'—দুটি কথারই প্রচলন আছে। ইংরেজিতে art-এর পাশে craft-এর ব্যবহার যেমন স্পষ্ট বিভেদ বোঝায়, বাংলায় 'কলা'-র পাশে 'শিল্প' বসিয়ে তা হয় না। কারণ, বাংলায় 'শিল্প' কথাটি উভচর। আর্ট-এর রাজ্যেও ওর ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, craft-এর অর্থেও ওর প্রয়োগ প্রশস্ত। আবার, যুৎসই অন্য কোনো শব্দের সঙ্গ পেলে ঐ উভচর শব্দটি অর্থবোধের এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসতেও কাতর হয় না! একদিকে 'সুকুমার-শিল্প' (fine arts)—অন্য দিকে 'শ্রম-শিল্প' (industries), এই দুই যুগ্ম-শব্দের অঙ্গরূপে 'শিল্প'-শব্দের ব্যবহারই তার প্রমাণ!

সুকুমার-শিল্প বা ললিত কলার একটি উপশাখা হোলো সাহিত্য। অন্যান্য উপশাখার মধ্যে আছে সংগীত, চিত্ররচনা ইত্যাদি। শৈব তন্ত্রে চৌষট্টি কলার তালিকা আছে। সাহিত্যেরও প্রকারভেদ ঘটতে ঘটতে কালে-কালে চৌষট্টির সীমা ছাড়িয়ে যাবে কি না কে জানে!

সংস্কৃতের 'কাব্য' কথাটি দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য,—চম্পূ, গদ্য, পদ্য, নাটক, নাটিকা, প্রহসন, ভান, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদি সকল শাখার সমাহারের সাধারণ নাম। ইংরেজির 'লিটারেচার', সংস্কৃতের 'কাব্য' এবং বাংলার 'সাহিত্য'—অর্থব্যাপ্তির হিসেবে এই তিনটি শব্দই সমমূল্য। আধুনিক বাংলায় 'সাহিত্য' শব্দটি নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি যাবতীয় সাহিত্য-শাখার বাচক।

এ-কালের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত এবং ইংরেজি—উভয় জননীর স্তন্যে পুষ্ট। অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগর-দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের কাল অবধি সংস্কৃত ভাষা ছিলেন মাতা, ইংরেজি ছিলেন বিমাতা। রামমোহন ইংরেজির অনাদর করেন নি,···অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগরের দলও ইংরেজির প্রভূত আদর করেছিলেন,—তারপরে উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজির মধ্য দিয়ে সমগ্র য়ুরোপীয় সংস্কৃতির স্বাদ পেয়ে বাংলায় ইংরেজির প্রতাপ-প্রভুত্ব বহু সমাদরে বরণ করে নিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধ অনুকরণ নিষেধ করলেন,—মধুসূদন তাঁর পাশ্চাত্য-আগ্রহের অতিরেকের জন্যে বঙ্গভাষা-জননীর কাছে অনুতাপ প্রকাশ করলেন,—বাঙালী সংস্কৃতির নবজাগরণের লগ্নে তবু ইংরেজির স্থানই কায়েমী হয়ে গেল। ইতিহাসের কালানুক্রমে এই সময় থেকেই বাংলার আধুনিক সাহিত্যের শুরু। তবে, আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। মধু-বঙ্কিমের আগে, রামমোহন-ঈশ্বর গুপ্ত থেকেই এই পূর্বভূমিকা তৈরি হয়েছে। মধুসূদনের সহকর্মী হেমচন্দ্র, অনুবর্তী নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলাল,—বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক দীনবন্ধু,

রমেশ দত্ত, গিরিশ ঘোষ ইত্যাদি শক্তিমানের আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্যে ইংরেজির প্রতাপ উত্তরোত্তর বেড়েই গেল। রবীন্দ্রনাথের যুগে ঈশ্বর গুপ্তের 'খাঁটি বাঙ্গালী' ভাব, মধুসূদনের 'ডাহা ইংরেজি' ভাব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গ-বঙ্গের গঙ্গা-যমুনার ধারা—সমস্ত মিলে মিশে সর্ব সম্প্রদায়ের বিভেদ দূর হয়ে দেখা দিলো একটি মহাপরিব্যাপ্তির প্রবণতা! রবীন্দ্রনাথ ভাষার দিকে হলেন 'প্রাকৃত বাংলা'র পক্ষপাতী, কথ্যরীতির ভক্ত,—শব্দচয়নে অতি উদার,—ছন্দ প্রয়োগেও বাংলার নিজস্ব ছড়ার ছন্দকে (স্বরাঘাত প্রধান) তিনি জাতে তুলে দিলেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যের কলাকৌশল তাঁর কাছে অস্পৃশ্য রইলো না। আবার আমাদের সনাতন সংস্কৃত সাহিত্যের বেদ উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেব পর্যন্ত কা'কেও তিনি দূরে ফেললেন না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতিভক্তি প্রাকৃত বাংলার পক্ষে তাঁর অনুরাগের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। বৈচিত্র্যই তাঁর আরাধ্য,—ব্যাপ্তিই তাঁর লক্ষ্য। সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্য বরণ করে নিলেন,—সম্প্রদায়ের টান এড়িয়ে তিনি গ্রহণ করলেন সর্বসম্মেলনের আদর্শ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সীমানির্ণয়ে নেমে কেউ ধরেন ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকালের হিসেব, কোনো ঐতিহাসিক বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেন মধুসূদন-বঙ্কিম-দীনবন্ধুর যুগ—কেউবা আরো একটু আগে থেকে—রামমোহন-ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিকতার সূত্রধার মনে করেন। আবার, অতি-আধুনিক যাঁরা, তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-কে বলেন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ভগীরথ। বাংলা মাসিক-পত্রিকার রাজ্যে 'সবুজ পত্র', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি'-ই এই আধুনিকতার মহিমান্বিত আদি বাহক। এইভাবে, নানা মুনির নানা মতের চক্রে পড়ে সরল মানুষের কৌতূহল উবে যায়। ক্রমশঃ 'আধুনিক'-কথাটাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অন্তরের ভাবানুষঙ্গের জালে 'আধুনিকতা' আর প্রশ্নচিহ্ন পরস্পর জড়িয়ে গিয়ে গড়ে তোলে চিরস্থায়ী এক সংশয়। অথচ 'আধুনিক'-এর ধারণা স্পষ্ট না হলে 'প্রাচীনের' বিশেষত্বও আমাদের বোধগম্য হবে না,—এবং এই দুটির সম্পর্কে সংশয় না কাটলে 'মধ্যযুগের' হিসেবটিও নির্ভুলভাবে বোঝা যাবে না। অতএব, 'আধুনিকতা'র হদিস পাওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।...

...আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি, নিয়ে।

...আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহ'লে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গত ভাবে দেখা।'

—'আধুনিক কবিতা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অর্থাৎ 'আধুনিকতা' শব্দটি ভাব আর কাল দুটি দিকেরই সূচক। বিশ্বকে 'তদ্গত ভাবে' দেখা যে-আধুনিকতার লক্ষণ, সে-আধুনিকতাও শাশ্বত নয়। সেও এক বিশেষ ঋতুর ফুল। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের 'আধুনিক' পাশ্চাত্ত্য কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছিলেন। মোহিতলাল এই প্রসঙ্গসূত্র-টি এড়িয়ে গিয়ে এটিকে মনে করেছেন শাশ্বত 'আধুনিকতা'র সংজ্ঞা—রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'নৈর্ব্যক্তিকতা'-তত্ত্বটিকে সার্বভৌম 'আধুনিকতা'র লক্ষণ ধরে নিয়ে তিনি বলেছেন :

'এই সংজ্ঞা অনুসারে একমাত্র চীনা কবিতাই টিকিয়া গেল ; উনবিংশ শতাব্দীর তো কথাই নাই—রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতাও বিশুদ্ধ বা শাশ্বতভাবে আধুনিক হইতে পারিল না।'

—'বিচিত্র কথা' : মোহিতলাল মজুমদার।

সত্যিই 'আধুনিক' মর্জি বলে কোনো স্থিতিশীল সামগ্রী নেই। আধুনিকতারও বিবর্তন আছে। বিগত কয়েক শতকের মধ্যে য়ুরোপীয় মনের আধুনিকতা নতুন নতুন কতো রূপেই যে দেখা দিয়েছে, সেকথা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে Michael Roberts-এর লেখা The Modern Mind বই-খানিতে। আমাদের দেশেও সেই রকম হয়েছে। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বপ্রভাবে ভাস্বর ষোড়শ শতকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা ছিলো 'আধুনিক',—উনিশ শতকের প্রথম দিকে রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-কেরী-র সমকালীন 'আধুনিকতা'র সঙ্গে তার বিভেদ অপ্রত্যাশিত নয়। বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই নব্য আধুনিকতারই সাধক এবং প্রতিনিধি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা তাকে একটা স্থায়ী গৌরব দিয়ে গেছে। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালী মন যে-'আধুনিকতা'র দিকে ঝুঁকেছিল,—রামমোহনের সময় থেকে ধর্ম-সমাজ-ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাজনীতি, সকল ক্ষেত্রের সর্বাভিমুখী সক্রিয়তার গুণে বাংলা দেশের প্রাণতরু যেভাবে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল—তারই সাহিত্যিক শতদলের পূর্ণ লাবণ্য দেখা দিলো বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। সাহিত্যে উনিশ শতকের বাঙালীর পূর্ণ 'আধুনিকতা'র পরাকাষ্ঠা ঘটেছিলো তাঁরই রচনায়। বঙ্কিমের সঙ্গে মধুসূদনের নাম অবিচ্ছেদ্য এই কারণে যে, উনিশ শতকের বাঙালীর যে-'আধুনিক' মনন গদ্যে দেখা দিয়েছিল বঙ্কিমের রচনায়,—পদ্যে তাই ফুটেছিলো মধুসূদনের মেঘনাদবধে, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে, বীরাঙ্গনায়। স্পষ্টভাষিতার বিচারে গদ্য অবশ্যই পদ্যের অগ্রগামী। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য-বাহনে তাঁর সমকালীন 'আধুনিকতা'কে যতো স্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত করতে পেরেছেন, মধুসূদনের স্বনির্বাচিত পদ্য-বাহনের পক্ষে ততোদূর সাফল্য ছিলো সাধ্যাতীত। তবু, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতে

একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে যুগচেতনার অব্যবহিত যোগ—দুই-ই যেমন এক বৃন্তে ফুটেছে, মধুসূদনের কাব্যেও ঠিক তাই ঘটেছে। রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-১৮৮৭), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-১৮৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৫-১৯০০), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২), নবগোপাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উনিশ শতকের স্মরণীয় মনীষীদের নানামুখী কর্মপ্রবাহের মধ্যে এই সামান্য লক্ষণটি সুস্পষ্ট। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারিচাঁদ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ—ইত্যাদি শক্তিমান সাহিত্যিকরা ছিলেন এই একই পুণ্যব্রতের সাধক। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র কথার মধ্যে 'আধুনিকতা'র যে-সুরটি সাধারণ লক্ষণ হিসেবে ধরা পড়েছে, সেটি হোলো আত্মবোধ আর বিশ্বাগ্রহের অবিচ্ছিন্ন অনুশীলন। অবশ্য সেকালে বাংলার চোখে য়ুরোপ-ই ছিলো বিশ্ব-সমগ্রত্বের প্রতীক। য়ুরোপ-ই ছিলো আমাদের উনিশ শতকের যুগদেবপীঠ! তারপর বিশ শতকের বাঙালীর 'আধুনিকতা'-বোধে দুটি নতুন শব্দ ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে,—একটি হোলো, 'প্রগতি', অন্যটি 'গণতন্ত্র'। য়ুরোপের প্রতি একালের আধুনিকতা-পরায়ণ বাঙালী সাহিত্যিক শ্রদ্ধাহীন নন, কিন্তু য়ুরোপের প্রগতিসামর্থ্য নিখিল বিশ্বে এখন আর শীর্ষতম নয়। একদিকে এশিয়া ও য়ুরোপ উভয় মহাদেশ-বিধৃত রুশদেশ,—অন্যদিকে মার্কিন মুলুক—সংস্কৃতির মহিমায় এখন এই দুই অঞ্চলই য়ুরোপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে, উনিশ শতকের য়ুরোপ-ভক্ত বাঙালী মানসের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলার বর্তমান সংস্কৃতি এখন দোটানায় নয়, তেটানায় নয়,—একেবারে চৌটানায় পড়েছে। একদিকে হৃতবীর্য য়ুরোপের পূর্ব-বিশ্বাস ও পূর্ব-সামর্থ্যের স্মৃতি এবং বর্তমান শতকের অনির্বাপিত বুদ্ধিনিষ্ঠা,—অন্যদিকে মার্কিন সাহিত্যের নব স্বাস্থ্য,—তৃতীয় দিকে, লৌহ-আবরণী-বেষ্টিত দুর্দম রুশিয়ার গণরহস্য,—আর, চতুর্থ দিকে আমাদের অচিরলব্ধ আত্মকৌলীন্যবোধ—চৌ-দিকের এই চৌটানের মধ্যে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিকতা' ফুটেছে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিনিষ্ঠ, হৃদয়চেতন, সর্বদিদৃক্ষু, অসাম্প্রদায়িক আত্মস্বীকরণে। 'সবুজ পত্র' এই

আধুনিকতার প্রথম বার্তাবহ। এই পত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ১৩২০-র আশ্বিন মাসে লিখেছিলেন :

'...বঙ্গ-সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে।...প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নব-সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে।...বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। ...এ যুগের লেখকরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়;

...প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম।

...মানুষ মাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা।'

এই 'সবুজ পত্রে'ই কবি সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন : 'যৌবনে দাও রাজটীকা'। সম্পাদক বীরবল একটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন নব-যৌবনবোধের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচারিত যৌবনধর্মের মধ্যে রক্ত মাংসের বাড়াবাড়ির নিন্দা করে মানবসমাজে যৌবনের নিত্যত্ব স্বীকার করেছিলেন। যৌবনাবস্থার লক্ষণ কি কি? বীরবল লিখেছিলেন :

'যৌবনে মানুষের বাহেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, মানুষ সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।'

বীরবল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বঙ্গীয় সমাজে মানসিক যৌবনের নব প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। এই বাসনা প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন :

'মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।'

উনিশ শতকে ডিরোজিও-র অনুচরদের মধ্যে (তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ Young Bengal-দল) একবার আমাদের মানসিক যৌবন এসেছিলো। এই যৌবনের প্রেরণা দিয়েছিল একদিকে পূর্বগামী ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, অন্যদিকে সমকালীন ইংলণ্ডের বামপন্থী দৃষ্টি ও আচরণ। Young Bengal-এর মুখপত্র 'Enquirer' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' যে জ্ঞানের অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিল, সে জ্ঞানবহ্নি পশ্চিমের আদর্শে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠা দাবী করে, কৃষ্ণমোহন-মধুসূদন প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী বাঙালীকে খ্রীষ্টান করে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্তাকর্ষণ করবার

সঙ্গে সঙ্গে মদ্য ও নিষিদ্ধ ভক্ষ্য বস্তুতে সৌখীন 'প্রগতি'-বাদীদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে—ডিরোজিও-র মৃত্যুর অল্প কাল পরেই সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়েছিল! তবে, সারা শতকের মধ্যে প্রগতি-চিন্তার যে স্রোত বয়ে গেছে, Young Bengal-দল সেই স্রোতেরই একটি বড়ো ঢেউ। রামমোহনের পরে Young Bengal,—তারপরে দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী'-সভা (১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী'-বিদ্যালয় (১৮৪০), 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকা-র (১৮৪৩) প্রতিষ্ঠা,—১৮৪৩-এর ৭ই পৌষ ব্রাহ্মধর্মে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ, একদিকে রাধাকান্ত দেবের দলের, অন্য দিকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুচরদের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রগতি-সাধনার মধ্যগা নীতি,—বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার,—১৮৫১-তে British Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা,—১৮৪৯-এর 'কালা আইন'-আন্দোলন, ১৮৫৭-র সিপাহী-বিদ্রোহ, ১৮৬০-এ দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ'-প্রকাশ, ১৮৭২-এর হিন্দু মেলা, ১৮৮২-তে বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ধ্বনি, ইল্‌বার্ট-বিলের আন্দোলন, ১৮৮৫-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা, প্রায় একই সময়ে বিবেকানন্দের অভ্যুত্থান—সব মিলিয়ে উনিশ শতকের বিচিত্র প্রগতি-চিন্তার সমগ্রতাটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশ শতকে, সেই ধারাতেই আমাদের মনন এগিয়েছে। নতুনত্ব ঘটেছে এইটুকু যে, আমরা ক্রমশঃ গণসচেতন হয়ে উঠেছি। প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ-বিরোধী রাজদ্রোহিতা দিয়েছে গণসান্নিধ্যের সুযোগ,—তারপর পড়েছে নিখিল বিশ্বের সমকালীন ভাবনা-সাধনার প্রভাব। ক্রমশঃ উনিশ শতকের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের' পরিবর্তে আধুনিক স্তরের শেষতম পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে গণ-আনুকূল্য। বাংলা সাহিত্যের বিগত দেড়শো বছরে 'আধুনিকতা'র এই হোলো আন্তর পরিচয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকার ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য আমাদের এই অন্তর্যৌবনেরই দেহকান্তি!

আধুনিক বাংলা গদ্য

সংস্কৃতে যাকে বলে গৌড়ী রীতি, তার বিশেষত্ব হ'লো সমাসবহুলতে, আর, বৈদর্ভী রীতি তার বিপরীত, এবং দুর্বোধ্যতার প্রতি সে রীতি উদাসীন নয়। বাংলা সাহিত্যের গদ্যধারার কালানুক্রমিক আলোচনায় নামলে উনিশ শতকের গোড়া থেকে বিশ শতকের অদ্যাবধি এই দেড়শো বছরের গদ্যের ইতিহাসে বারে বারে রীতিগত এই দুই প্রকৃতির অভিমুখে বাংলা গদ্যের নিয়মিত দোলন লক্ষ্য করা যায়। কালপ্রবাহের এক পর্বে গদ্য সারল্যের দিকে ঝুঁকেছে,—অন্য পর্বে গাম্ভীর্য আর দুর্বোধ্যতার দিকে এগিয়ে গেছে! এ ঘটনা একবার ঘটেই থেমে যায়নি—ঘটেছে বারে বারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহন রায়,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং প্যারীচাঁদ মিত্র,—তারপর, হাল আমলে প্রমথ চৌধুরী এবং তার অল্পকাল পরেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবান লেখক—এঁদের গদ্য-রচনা বিশ্লেষণ করে দেখলে ব্যাপারটি বোধগম্য হয়। রবীন্দ্রনাথ,—তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র,—রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী—এঁরা তিনজনেই আপন আপন কালের পূর্বকথিত গদ্য-প্রকৃতির দুই ঝোঁকের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে,দুই প্রবণতার সমন্বয় ঘটিয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন।

বিশ শতকের বাংলা গদ্যের প্রকৃতি কোন্ দিকে ঝুঁকেছে, সেই তথ্যটিই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। সেজন্যে একটু আগেকার স্তর থেকে এগিয়ে আধুনিক স্তরে প্রবেশ করা দরকার। 'আধুনিক' কথাটি এখানে কেবল কালমিতির উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা গেল। 'আধুনিকতা' এবং 'চিরন্তনতা' নিয়ে রসোপলব্ধির কোনো নিগূঢ় প্রকৃতিভেদ সম্পর্কে কূটবিশ্লেষণ এই রচনার প্রতিপাদ্য নয়।

বাংলা গদ্যের এই দেড়শো বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে তার উৎস থেকে পরিণতির আধুনিকতম স্তরে এসে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই গদ্য উনিশ শতকে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কলমে লালিত হয়ে, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে প্রমথ চৌধুরীর হস্তক্ষেপে আর একবার উল্লেখযোগ্য এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বাংলা গদ্যের এই নতুনতরো পরীক্ষার ব্যবস্থা শুরু হয়। প্রমথ চৌধুরীর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'বীরবল' ছদ্মনামে। বীরবল ছিলেন সম্রাট আকবরের সভাসদ—রসিক এবং পণ্ডিত,—ইতিহাস-প্রখ্যাত ব্যক্তি। বাংলা গদ্যের নবযুগস্রষ্টা, বিশ শতকের বাঙালী 'বীরবল'ও তাঁর রসিকতায় এবং পাণ্ডিত্যে বাঙালী পাঠককে চমৎকৃত করলেন।

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্প রচনায় বাংলা ক্রিয়াপদের যে সাধুরূপের প্রচলন চলে এসেছে, সর্বনামের যে চেহারা দেখা গেছে, শব্দচয়নে যে সংস্কৃতানুসারিতা ধরা পড়েছে,—'সবুজ পত্রে' সে-সব রীতি গেল বদলে। কলকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত লোক মৌখিক আলাপে যে-রকম ভাষা ব্যবহার করেন, প্রমথ চৌধুরী সেই রীতির আদর্শেই বাংলার গদ্যকে দিলেন নতুন মূর্তি। কলকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষায় কৃষ্ণনাগরিক বাক্-চাতুর্যের প্রক্রিয়ায় নানান্ শব্দ মিশিয়ে নতুন যে গদ্য তৈরি হোলো, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তারই নাম দিয়েছেন 'বীরবলী রীতি'। এ রীতি গৌড়ী নয়,—একে বরং বৈদর্ভী বলা চলে! রবীন্দ্রনাথ এই নতুন রীতি তাঁর নিজের কলমেও বরণ করে নিলেন। ফলে, এ-রীতি এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টার সমর্থনে আভিজাত্য এবং কৌলীন্য লাভ করলো। একশো বছরের বাংলা গদ্যের ধারায় এই ভাবেই একালের আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। গদ্যের পোশাকী চেহারা উঠে গিয়ে

বেশ একটি সহজ সুন্দর আটপৌরে মহিমার বিকাশ ঘটলো। 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হবার কয়েক বছর আগেই প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন:

'যতদূর পারা যায় যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই, লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়! ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।'

এই রচনাটিরই শেষদিকে বীরবল আরো বলেছিলেন:

'ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটা নিতান্ত নাহলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষায় ভিতর থেকে খাপ্ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।'

এই আদর্শ নিয়ে বীরবল বাংলা গদ্যের আসরে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়ে এই আদর্শটি পরবর্তী বাংলা গদ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষার রূপ বদলাতে উদ্যত হন নি। তিনি মোটামুটি সাধু ভাষাতেই লিখে গেছেন; সে ভাষা সরল এবং মধুর।

বীরবলের এই নতুন রীতি স্থাপনের পরে আমাদের শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, অর্থাৎ ১৯৩০-৪০-এর মধ্যে বাংলা গদ্যে আর একবার নতুন ঢেউ উঠেছিল। একদিকে 'সবুজপত্র' এবং অন্য দিকে ১৯৩০-৪০ সালের এই আন্দোলন—এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনাটি হোলো 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ। 'সবুজপত্র' ১৩২১-এ এবং 'কল্লোল' ১৩৩০-এ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে ছিলো 'হিতবাদী' এবং 'সাধনা' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ)। 'সাধনা'র আগে 'ভারতী'। কিন্তু 'সবুজপত্র' বাংলা গদ্যের যে বিচিত্র সংস্কার ঘটালো, পূর্ববর্তী এই কাগজগুলির মধ্য দিয়ে তেমন বিপুল কোনো পরিবর্তন আর ঘটেনি। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রথম ছাপা হয়েছিল 'ভারতী'তে; 'সাধনা'য় ছাপা হয়েছিল 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' (১৮৯১-৯২)। এই দুই রচনাই চলিত ভাষায় লেখা, প্রথমটির সঙ্গে শেষেরটির ব্যবধান প্রায় বারো বছরের। 'সবুজপত্রে' বাংলা দেশের তৎকালীন লেখকরা বাংলা গদ্যের রীতিও বদলে দিলেন, তাতে নতুন বিষয়েরও সন্নিবেশ ঘটালেন। 'কল্লোলের' লেখকদের বক্তব্য বিষয়টি ছিলো অভিনব, কিন্তু তাঁরা বীরবলী-গদ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সুতরাং বিষয়ের দিক থেকে নানা কারণে 'কল্লোলের' গদ্যরচনাবলী স্মরণীয় হয়ে

থাকলেও লিখনরীতির বিচারে সেগুলি 'সবুজপত্র'-যুগেরই অনুসাধনার দৃষ্টান্ত। তারপর, গদ্যের মোড় ফিরেছিল ১৩৩০-৪০ এর মধ্যে,—যখন বাংলা ১৩৩৮ সালে 'সবুজপত্রে'র অপেক্ষাকৃত উৎসাহী শিষ্যেরা 'পরিচয়' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই কাগজটি আগে ছিল ত্রৈমাসিক, পরে মাসিকে পরিণত হয়। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর লেখকদের হাতে বাংলা গদ্য ক্রিয়াপদের-সর্বনামের চলিত রূপগুলি বর্জন না করেও বিশেষ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠলো। এঁরা অনেক অপরিচিত শব্দ আমদানি করলেন। ইংরেজি 'ইডিয়ম্' এর বঙ্গানুবাদ করে, সংস্কৃত পুঁথিপত্র ঘেঁটে নানা নতুন কথা বানিয়ে বাংলা সাহিত্যের রাজপথে এঁরা সেই সব নতুন প্রয়োগ চালু করে দিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' থেকে এই শ্রেণীর গদ্যের একটু নমুনা দেওয়া হোলো :

'বর্তমানের বুদ্ধি বৈনাশিক, তাঁর উন্মেষণী মানুষের কান্তিস্তম্ভের আপতিক ভিত্তিকে এমনি নিষ্ঠুর অন্বেষণে আমাদের জ্ঞানগোচরে এনেছে যে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহে আমরা আজ স্বভাবতই বীতশ্রদ্ধ। অতএব কাব্যের কল্পতরু আজকে আর বটের মতো ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল নয়, সে-গাছ পরিত্যাজ্য রডডেনড্রনের মতো তন্ত্রবাত অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত,··· [কাব্যের মুক্তি]

'অনীহা', 'বৈহাসিকতা', 'কলাকৈবল্য', 'হার্দ্য', 'ঋলমের বন্দাক স্রোত', 'শ্লেষ্মাপ্রধান চারিত্র্য', 'নির্ব্যাজ', 'সার্বভৌম বিপর্যয়' ইত্যাদি শব্দভারে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য বৈশিষ্ট্যময়। তার মানে এ নয় যে, তাঁর রচনার ভার শুধু শব্দগত,—সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি-সংস্কৃত-ফারসী ইত্যাদি নানা সাহিত্য বিচারের ফলে তাঁর মননগত যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন, তাঁর লেখায় তারই প্রকাশ ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি বচনের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করেছেন, যেমন—করকৌশলপ্রদর্শন (sleight of hand.), ধাতুসঙ্কর (alloy), তন্ত্রবাত শিখর (airy peak ?), নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন (emotion recollected in tranquillity), নঞর্থক ক্ষমতা (negative capability) ইত্যাদি। আবার কখনো বা বাংলায় অল্প-প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার তাঁর গদ্যরীতিকে দিয়েছে গাম্ভীর্যময় এক অভিনবত্ব। 'স্বগত' বইখানির সূচনা-য় তিনি লিখেছেন : 'বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য ব'লে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরেজি ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

এই ঈষৎ খেদ-ব্যঙ্গদিগ্ধ বিনয়প্রতিম উক্তিটি, প্রকৃতপক্ষে, শক্তিমানের জয়-ঘোষণা মাত্র। ১৩৪৫-এ 'স্বগত'-প্রকাশকালে সুধীন্দ্রনাথ যখন এ-কথা লিখেছিলেন, তখন, তাঁর গদ্যরীতি ছিল ক্ষুদ্র এক ভক্ত-গোষ্ঠীর তারিফলালিত এবং প্রবীণ লেখক-পাঠক-

সম্প্রদায়ের কৌতুকপ্রদ সামগ্রী বিশেষ। কিন্তু তারপর, ক্রমশঃ এই গদ্যরীতি কতো যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, সাম্প্রতিকতম বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিকে চোখ ফেরালেই তা বোঝা যাবে। এখানে বহুশ্রুত ফরাসী সদুক্তিটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই—সকলেই জানেন যে, style মানেই স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের অননুকরণীয় মৌলিকতা; প্রত্যেক শক্তিমান লেখকেরই নিজস্ব style থাকে। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের অনুচর-সংখ্যা বেশি নয়,—সে-কথা সত্য; 'সবুজপত্রের' গদ্য অর্থাৎ বীরবলী গদ্য যেমন সহজ-সংক্রামক-রূপে বাংলা দেশের নানা লেখকের রচনায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সুধীন্দ্রনাথের এই তথাকথিত কঠিন গদ্য ঠিক সেরকম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেনি, তাও সত্য;—তথাচ, এই কাঠিন্যের সাধনা হাল আমলের অনেক লেখকের রচনাতেই অল্প-বিস্তর দেখা যে না-দিয়েছে, তাও নয়।

বিশুদ্ধ বঙ্কিমী গদ্যের দৃষ্টান্ত এ-কালের সৃজ্যমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরল হয়ে এসেছে বটে,—তবে, এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। গদ্য-রচনায় মোহিতলাল মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুসরণকারী। মোহিতলালের গদ্যভঙ্গির একটু নমুনা দেখা যাক:

> 'কিন্তু 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ' যাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ একালে যেমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক এই অবস্থা আর কখনও হয়তো হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা মানুষের স্মরণাতীত, সে মন্বন্তর প্রাগৈতিহাসিক। ইহা সাধারণ কালধর্ম নয়—ইহা অকাল; মহাকালরূপী মহোরগ যেন নিজ বিষে জর্জরিত হইয়া নিজের পুচ্ছ দংশন করিতেছে!'
>
> ['শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ']

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল, সুসংযত, সুশ্রাব্য এবং সর্বসমর্থ এক রীতি সৃষ্টি করে গেছেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, প্যারীচাঁদ, ভূদেব প্রভৃতি লেখক বাংলা গদ্যের শব্দবিন্যাসে, বাক্য-গঠনে, ছেদ-যতি প্রয়োগে এবং অনুচ্ছেদের বিন্যাসে-বন্ধনে ক্রমবর্ধমান যে প্রযত্নের যোগ ঘটিয়েছিলেন, —বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই ধারার সর্ববৈচিত্র্যের সুসমন্বয়কারী লেখক। বঙ্কিমী রীতির ভিত্তিতে ছিলো পরিণত শব্দচেতনা,—ভারসাম্যবোধ এবং অলংকরণ-বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গতানুগতিক অলংকরণ নয়,—গদ্যের গতি নির্বিঘ্ন রেখে, কথাবস্তুর মধ্যে নাটকীয়তা সঞ্চার করে, গদ্যকে তিনি শব্দে-অর্থে অলংকৃত করে তুলেছিলেন। তাঁর গদ্যে দীর্ঘ সমাসের দৃষ্টান্ত অল্প নয়, ইংরেজি এবং সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির অনুকরণের উদাহরণও তাতে কিছু কম পাওয়া যায় না—কিন্তু যে-বিশেষত্ব একমাত্র বঙ্কিমের গদ্যেই দেখা যায়, সে হোলো তাঁর ধ্বনিবৈশিষ্ট্য এবং অলংকরণপটুতা। একাধারে অলংকৃত এবং ধ্বনিমান

এই সমাস-গম্ভীর গদ্যে নিষ্ঠার জন্যেই গদ্যলেখক মোহিতলালকে বলা যায় এ-কালের বঙ্কিমচন্দ্র।

আধুনিক বাংলা গদ্যের জরীপ করতে বসলে প্রধানতম যে ধারাটি প্রচুরতম ক্ষেত্রে চোখে পড়ে, সে হোলো প্রমথ চৌধুরীর প্রবর্তনায় সৃষ্ট 'বীরবলী' রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র যে-গদ্যের উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর পূর্ববর্তী রীতির তুলনায় সে-গদ্যও ছিল তৎকালীন মৌখিক ভাষার নিকটবর্তী। বীরবলী গদ্যের পরে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য ক্রিয়াপদের, সর্বনামের এবং সাধারণভাবে ভঙ্গির মৌখিক প্রকৃতি মেনে নিয়েও এক বিপরীত আন্দোলন তুলেছিল। বীরবলী গদ্যে আছে সহজ এক প্রবাহধর্ম; তার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত শব্দতক্ষণকলার যোগে উত্তরসাধকদের লেখনী আরো বলিষ্ঠ, আরো মসৃণ, আরো বিচিত্রগামী হতে চেয়েছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রে সিদ্ধির সমতা ঘটেনি।

পঁচিশ বছর আগে যেমন ছিল, তার তুলনায়, হাল আমলে—বাংলা গদ্যলেখকদের নৈপুণ্যের মান তবু অনেকটা বেড়ে গেছে। গণতন্ত্রের যুগে লেখকদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে,—অন্ততঃ গদ্যের ক্ষেত্রে, লেখার গুণ বা স্বাদ সে-অনুপাতে কমেনি!—বরং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য উত্তরোত্তর ক্ষিপ্র ও সুঠাম হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক অন্যান্য অনেক রচনার মধ্যে জ্যোতির্ময় রায়ের 'দৃষ্টিকোণ' (১৩৪৮) ও 'অন্যান্য' (১৩৫১), যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' (১৩৫৩), ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' (১৩৫৬) এবং ইন্দ্রজিৎ-রচিত 'ইন্দ্রজিতের খাতা' (১৩৫৬) বাংলা সাহিত্যের সদ্যস্তন গদ্য রচয়িতাদের সার্থক কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত। এঁদের গদ্যরীতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এঁরা বীরবলী ধারারই প্রত্যক্ষ বাহক—তবে, নতুন নতুন শব্দতক্ষণের প্রবণতায় এঁরা সুধীন্দ্রনাথের অনুচর। সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাব-গম্ভীর ব্যক্তি। কিন্তু বীরবলের নীরসতম গাম্ভীর্যও নির্হাস নয়। পূর্বোক্ত চারজন লেখকেরই পক্ষপাত যে বীরবলী-প্রকৃতির অভিমুখী, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কথ্যরীতির কাঠামো বজায় রেখে, প্রধানতঃ হালকা কথাকে যুক্তিসূত্রে সুসংবদ্ধভাবে বেঁধে প্রবহমান করে তোলাতেই এঁদের কৃতিত্ব। 'যাযাবর'-এর গদ্যে শ্লেষ-যমকের কসরতী অতিপ্রকট হলেও (শিবরাম চক্রবর্তীর স্মারক), এঁদের গদ্য মোটামুটি মসৃণ,—শব্দ-প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃপ্তিকর,—ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রশংসনীয়।

'কল্লোল'-পর্বে এবং তার পরে, বাংলা ১৩৩৮ সালে 'পরিচয়'-এর জন্মকাল থেকে আরম্ভ ক'রে অদ্যাবধি—গদ্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের সকলের রীতির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। লেখকদের সংখ্যার হারে রীতিবৈচিত্র্য বাড়েনি—সমগ্রভাবেই বাংলার গদ্যলেখকদের নৈপুণ্য বেড়েছে।

বিজ্ঞান-বিষয়ে বাংলায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের, মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে গিরীন্দ্রশেখর বসু, সত্যচরণ লাহা, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়, পশুপতি ভট্টাচার্যের নাম একসূত্রে গাঁথা চলে। বিশেষজ্ঞ 'পণ্ডিত' লেখকদের সংখ্যা কম নয়। অতুল চন্দ্র গুপ্তের পাণ্ডিত্য আদর্শ ভদ্রতার মতোই অ-দৃশ্য, কিন্তু পাঠকের মর্মস্পর্শী। নলিনীকান্ত গুপ্তের গদ্যে তাঁর তথ্যজ্ঞানের ভার কিছু বেশি পড়েছে,—কিন্তু পূর্ববর্তী শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী'র ততোধিক ভারময়তা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। যামিনীকান্ত সেনের 'আর্ট ও আহিতাগ্নি'-র গদ্যরীতি এই সূত্রে স্মরণীয়। সাংবাদিকদের মধ্যেও কয়েকটি নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে,—কিন্তু হাল আমলের বাংলা গদ্যে—বিশিষ্ট কয়েকটি রীতির বিভাগ অনুসারে—কোনো রকম পরিবার-ভেদ কল্পনা করা চলে কি না, সেই কথাটিই এখানে বিচার্য।

সেই বিচারে মোটামুটি চারটি পরিবার দেখা যাচ্ছে: প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী শাখাটি, দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের সাধুরীতির অনুসারী শাখা; তৃতীয়টি হোলো বীরবলী,—চতুর্থটি 'সুধীন্দ্রনাথী'। শেষেরটি বীরবলী রীতিরই সাক্ষাৎ বংশধর। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আলোচনায় প্রমথনাথ বিশী ('বাংলার লেখক': ১ম খণ্ড) গদ্যের গীতিস্পন্দ, বাক্‌স্পন্দ ও লেখনীস্পন্দ নামে যে ত্রিশাখা কল্পনা করেছেন,—সেই বিভাগ মনে রেখে বলা যায়—প্রথমোক্ত দুই শাখায় ছিলো 'গীতি' এবং 'লেখনী'র মিশ্রস্পন্দন, শেষের দুটিতে আছে বাক্ আর লেখনীর মিশ্রস্পন্দন।

বঙ্কিমী,—রবীন্দ্রনাথের সাধুরীতির অনুসারী,—বীরবলী—এবং সুধীন্দ্রনাথী—আধুনিক বাংলা গদ্যের এই চারটি শ্রেণী সহজেই চোখে পড়ে। তা'ছাড়া আছে কাব্যমুখী গদ্য,—এবং উপভাষা-খচিত গদ্য। প্রথমটির দেখা মেলে অবনীন্দ্রনাথ-দক্ষিণারঞ্জনের রচনায়,—দ্বিতীয়টির মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববঙ্গীয়তায়, অচিন্ত্য-কুমারের আদালতী-চাষী-মগী বুলির সিঞ্চনে, শৈলজানন্দ-তারাশঙ্করের বীরভূমী-সাঁওতালীর অকুণ্ঠ প্রয়োগে।

আধুনিক বাংলা গদ্যের বিচিত্র অনুশীলনে যাঁরা সক্রিয়তম, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বনফুলের নাম সর্বাগ্রগণ্য। গদ্যকে এঁরা স্বচ্ছতায় এবং স্বাচ্ছন্দ্যে সুবোধ্য ও শোভন করেন,—গুরু-লঘু, তন্দ্রালু অথবা সজাগ, শিথিল অথবা সতর্ক—সকল অবস্থার সকল অনুভূতি প্রকাশের কাজে বাংলা গদ্য এঁদের কলমে মসৃণভাবে নিঃসৃত হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু সুসমর্থ গদ্য-লেখকদের হাতেও তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বিরল।

কোনো শক্তিমান লেখকই তাঁর কলাবিধির প্রতি উদাসীন থাকেন না। প্রসঙ্গ-নির্বাচন ঘটতে থাকে জীবনের অভিজ্ঞতার ধারায়, শিল্পীর নির্বাচনী চেতনার গুণে,—আর, সেই সঙ্গে শিল্পের রূপ বা বাহন এবং প্রযুক্তি বিষয়ে পরিমার্জন চলতে থাকে শিল্পীর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের শাসনে। একালের কর্তব্যনিষ্ঠ বাঙালী লেখকদের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে। স্থান-সংকোচের কথা মনে রেখেও, বুদ্ধদেব বসুর অতিকায় উপন্যাস 'তিথিডোর' থেকে বাংলা গদ্য সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষার কিছু নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হোলো :

> 'আতা গাঁতিকে ধাক্কা দিয়ে বললো ওঠ না, সরস্বতী বললো সত্যেন তাহ'লে, উজ্জ্বল আলোর সিঁড়ি দিয়ে নামলো দু'জনে, উজ্জ্বল একতলা পেরোলো, কেউ নেই, চুপ, শাশ্বতী বললো স্বাতী কি, শোভা ভাবলো ঘুম ; অন্ধকার কালো, রিকশর দুই চোখই উজ্জ্বল, টুংটাং, চুপ, সব চুপ, টুংটাং, আরো কালো মাথার উপর আকাশ, আরো উজ্জ্বল আকাশের তারা, তারা, কত !'

'তিথিডোরে'র (রচনাকাল : ১৯৪৬-৪৯) শেষ দু'এক পাতার এই গদ্য বহুশ্রুত James Joyce-এর স্মারক। তবে জয়েসীয় উল্লম্ফন,—অন্বয়গত এবং শব্দগত খামখেয়ালীপনা বুদ্ধদেবের ধাতে সয় না। ওপরে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তাতে —কাব্য এবং গদ্যের ভেদরেখা যেন মুছে যেতে চেয়েছে। যুক্তিজীবী গদ্য যেন স্বপ্নময় কবিতার দেশে ছুটি পেয়েছে ! এতে বুদ্ধদেব হয়তো সজ্ঞান অনুকরণেরই নমুনা দিয়েছেন,—তা'হলেও এ অনুকরণ পাকা হাতের কাজ।

এই সূত্রে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ওঠা স্বাভাবিক। বুদ্ধদেবের কলমে উপন্যাসের তন্দ্রালু উপসংহারে কাব্যসীমাস্পর্শী অর্ধজাগর গদ্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু, দক্ষিণারঞ্জনের স্বাভাবিক মর্জিই যেন কাব্যাভ। তাছাড়া তিনি হলেন কিশোর-রাজ্যের শিল্পী,—রূপকথা সেখানকার হাওয়ায় ভাসে,—ছুটি সেখানকার স্বাভাবিক দাবী,—ব্যাকরণের ছুটিও সেখানকার বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণারঞ্জন অনেক সময়ে বাক্যের ব্যাকরণসম্মত অন্বয় এড়িয়ে চলেন,—তবে, Joyce-এর মতো যুদ্ধসাজে নয়,—Lewis Carol অথবা সুকুমার রায়ের মতো সর্বপ্রশংসিত রাজবেশে ! অবনীন্দ্রনাথ এবং দক্ষিণারঞ্জন উভয়েই কিশোর রাজ্যে সর্ববন্দিত ;—কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে তার বাইরেও সফরে বেরুতে হয়। আটপৌরে এবং পোশাকী সব রকম প্রয়োজনেই তাঁর রীতি হলো চিত্রল-রীতি। মনোমোহন ঘোষ ঠিকই বলেছেন—'রাজ-কাহিনী, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, নালক—এগুলি যেন এক একটি জীবন্ত চিত্রশালা'।* কিন্তু শুধু এই বইগুলি কেন ? 'ভূতপতরীর দেশে'তে যেমন, 'বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধা-

* বাংলা গদ্যের চার যুগ

বলী'তেও তেমনি—মনের ছবি যেন চোখের তারায় ধরা দেয়—কখনো দেখা যায় দিগ্‌বলয়ের ধূ ধূ ঝাপ্‌সা রেখা, কখনো দেখা দেয় কাছের জগতের গোলাপি, বাসন্তী, সবুজ, হলুদ, নীল, বেগুনি, রাঙার রামধনু। তবে, অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে—অবনীন্দ্রনাথের গদ্য রবীন্দ্রনাথেরই খাসমহলের জিনিস। অঙ্গসংস্থানে অথবা উপাদানে তার কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই—আছে মননে, সেও সামান্যমাত্র। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের কোনো কোনো রচনায় গদ্যের অঙ্গসংস্থানই অন্য জাতের। কাব্যের সংকেত এবং গদ্যের বিস্তার—এই দু'য়ের সন্ধিতে সংকরধর্মী, মেরুদণ্ডহীন 'নক্সা'-গদ্যের সঙ্গে তার কতকটা আত্মীয়তা আছে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে তাকে 'কাব্যসংকর গদ্য' নাম দিলে কি বেমানান হবে?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, সুধীন্দ্রনাথ,—অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন,—বাংলার বিভিন্ন উপভাষা,—পাশ্চাত্ত্য নানা জাতির গদ্যের আদর্শ,—সাংবাদিকদের প্রভাব,—অধ্যাপকদের প্রতাপ—এইসব বিচিত্র তরঙ্গের দোল খেতে খেতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্য আধুনিক বাঙালী জীবনের মাপে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে। তার গতি কথ্যরীতির তীক্ষ্ণতম সংহতির দিকে। এই লক্ষ্যের সক্রিয়তম সাধক হলেন অচিন্ত্যকুমার এবং অন্নদাশঙ্কর। এঁদের গদ্যে বুদ্ধদেবের স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু ঢিলেমি নেই। গদ্যের মর্জি অনুসারে বুদ্ধদেব-কে বলা যায় রবীন্দ্র-শাসিত, আর, এরা হলেন রবীন্দ্রাতিশায়ী। বুদ্ধদেব আত্মতায় আবিষ্ট, এঁদের গদ্যে ঘটেছে নাট্যকারের আত্মস্থতা—অনুচ্চারিত কিন্তু অবধারিত।

বঙ্কিমের গদ্য মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে সমুদ্র-তরঙ্গের মতো উত্তাল,—রবীন্দ্রনাথের গদ্যে সে সমুদ্রগর্জন বিরল;—বীরবলের গদ্য কখনো ব্যঙ্গালাপী, কখনো সুখালাপী,—সুধীন্দ্রনাথের গদ্য মিত গম্ভীর, কারুনিষ্ঠ;—অবনীন্দ্রনাথের রীতি বৈঠকী, অবকাশ-স্নিগ্ধ। 'কিন্তু বিনয় সরকারের বৈঠকে'র ত্বরা বা তপ্ততা নেই সেখানে। অচিন্ত্য-কুমারের গদ্য তীক্ষ্ণ, সংহত টংকারী। অন্নদাশঙ্করের কোনো কোনো লেখায়,—বনফুলের চলিত রীতির রচনায় এই লক্ষ্যেরই সন্ধান দেখা যায়। প্রেমেন্দ্রের বহু-প্রশংসিত সংলাপ-কুশলতায় এই প্রবণতাই সর্বোচ্চ।

বাংলা গদ্যের অস্থিসম্ভারের পুরাকালিক দৈর্ঘ্য—মেদমাংসের পৃথুলতা—অঙ্গচালনার অভিজাত মন্থরতা,—বিদ্যাসাগরী ক্রিয়াপদ, বঙ্কিমী অলংকরণ, চন্দ্রশেখর দীনেশ সেনীয় আবেগমত্ততা এখন প্রায় লুপ্তপ্রচল। আধুনিক বাংলা গদ্য মিতবেশী এবং দ্রুতচারী। তার সংগীত শ্রুতিমুখী নয়,—মর্মমুখী; তার তরঙ্গ জলীয় নয়, ধাতব,—তাতে তরবারির দীপ্তি, ইস্পাতের নমনীয়তা।

প্রাক্‌ আধুনিক বাংলা গদ্য

উনিশ শতকের শুরুতেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শুরু হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। বিদেশী শাসকদের আনুকূল্যে, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের আগ্রহে এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে বাংলার সাহিত্যিক গদ্যের ধারা তখন থেকেই স্তরে স্তরে পরিণতির দিকে এগিয়েছে বলা যেতে পারে।

এদেশে সেকালে যে সব ইংরেজ রাজকর্মচারী আসতেন,—আইন, সাহিত্য, দেশের রীতিনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্যেই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হয়। সেখানে সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী ছাড়া বাংলা, মারাঠি, তামিল এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। উইলিয়ম কেরি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাঁর সহযোগী দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সংস্কৃতে কৃতবিদ্য ;—অন্যেরা আরবী-ফারসীতে।

১৮০০ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে বাংলা গদ্য প্রধানতঃ ছাত্র-পাঠ্য নানান বই লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়। কেরির নিজের লেখা নানান বইয়ের মধ্যে বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ এবং বাংলা কথোপকথনের কিছু সংগ্রহও ছিল। বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের পক্ষে দু'খানিই কাজে লাগবার মত বই। তখনকার বাংলা গদ্যে প্রধান প্রভাবের মধ্যে হয় সংস্কৃতের, নয় তো ফারসীর চিহ্নই বেশি চোখে পড়ে। সে গদ্য তথ্য বা খবর পরিবেষণের উপযোগী, কিন্তু তাতে সৌন্দর্য ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের ঝোঁক ছিল কথ্যরীতির দিকে। অনুবাদের অন্ত ছিল না তখন। বাংলা গদ্য যথার্থ স্বাভাবিক হবার জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করছিল। সেই প্রয়াসের মধ্যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের হাত থেকে বেদান্ত সম্বন্ধে ছোট একখানি আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

গদ্য-লেখকদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন সে আমলের সর্বাগ্রগণ্য, সর্বাপেক্ষা সমর্থ ব্যক্তি। তবে, একালের পাঠকদের কাছে তাঁর বাক্য-গঠনের ভঙ্গি কেমন যেন জটিল মনে হবে। একালের অনুভূতিতে তাঁর ভাষা সত্যিই কেমন যেন মাধুর্যহীন!

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় পত্র-পত্রিকার গদ্য দেখা দেয়। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম এবং সামাজিক প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্কময় প্রবন্ধের রেওয়াজ শুরু হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গদ্যে কয়েকটি সামাজিক নক্সা লিখেছিলেন। 'মেটিরিয়া মেডিকা'র একখানি বাংলা সংস্করণও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল। সংস্কৃত অথবা আরবী-ফারসী মূলের নানা কাহিনীর গদ্য-অনুবাদও সে সময়ে ভূরি পরিমাণে দেখা দিয়েছিল।

রামমোহন বাংলা গদ্যকে বেশ এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। সংস্কৃতের সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ ছিল,—আবার সেই সঙ্গে নিজের পারিপার্শ্বিক সমকালীন প্রয়োজনও তিনি বিস্মৃত হননি। দেশের যথার্থ উন্নতির জন্যেই য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আদর্শ যে মেনে নেওয়া উচিত, সে বিষয়ে তাঁর সত্যিকার প্রত্যয় ছিল। বড়লাটের কাছে লেখা, তাঁর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ এক চিঠিতে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বেশ জোর দিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। সে ঘটনার বারো বছর পরে, বাঞ্ছিত ইংরেজি শিক্ষার অনুমোদন পাওয়া যায় মেকলের হাত থেকে। মেকলে ছিলেন তখনকার শিক্ষা-নিয়ামক সমিতির সভাপতি। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন-আদালতের কাজেও ইংরেজির চল শুরু হয়।

শতাব্দের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলায় লেখা সামাজিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা কিছু কম ছিল না। রামকমল সেনের 'ঔষধসারসংগ্রহ' বেরিয়েছিল ১৮১৯ সালে। প্রাচীন বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা তাঁর বই 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত' বেরিয়েছিল ১৮৩৪ সালে। পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে উইলিয়ম য়েট্সের দু'খানি বইয়ের কথা মনে পড়ে। প্রথমটির নাম—'পদার্থ বিদ্যাসার', দ্বিতীয়টির নাম—'জ্যোতির্বিদ্যা'। ১৮২২ সালে স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে পশুজীবনী সম্বন্ধে 'পশ্বাবলী' নামে এক মাসিক-পত্রিকা ছাপা হয়। পশ্বাবলীর লেখাগুলি ইংরেজি মূল থেকে প্রধানতঃ ডব্লিউ-এস-পিয়ার্স-এর অনুবাদ। ১৮২৮ সালে পিয়ার্সের লেখা ভূগোল সম্বন্ধে একখানি বাংলা বই বেরিয়েছিল।

১৮৩২ থেকে হোরেস হেম্যান উইলসনের আনুকূল্যে বিজ্ঞান বিষয়ে 'বিজ্ঞান সেবধি' নামে এক মাসিক-পত্রিকা ছাপা হয়। শ্রীরামপুর থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বিজ্ঞান-সার-সংগ্রহ' নামে এক পাক্ষিক-পত্রিকা বেরুতে থাকে। ইংরেজি আর বাংলা দুই ভাষাতেই এই পত্রিকার লেখাগুলি ছাপা হোতো। রসায়ন সম্বন্ধে অদ্ভুত ধরনের একটি গ্রন্থনামও এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়—'কিমিয়াবিদ্যার সার'! ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেলিক্স কেরি 'বিদ্যাহারাবলী' নামে এক কোষগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। জোশুয়া মার্শম্যানের ছেলে জন ক্লার্ক মার্শম্যান কিছু ইতিহাসের বই লেখেন। তাঁর প্রয়াসের আগেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' বেরিয়েছিল। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫১-র মধ্যে ভূগোল, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলি অনুবাদ-প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। কৃষ্ণমোহনের রচনায় প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত দু'জনেরই জন্ম-বর্ষ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। দু'জনেই পণ্ডিত, দু'জনেই সংস্কারব্রতী। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের বাড়াবাড়ি যখন প্রথম

কমতির মুখে, উনিশ শতকের সেই সন্ধিতে তাঁরা দু'জনেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রামমোহনের কলমেই বাংলা-গদ্য সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করেছিল বলা হয়; বিদ্যাসাগর উপযুক্ত ছেদ-যতি প্রয়োগ করে সেই গদ্যের শরীরে সৌন্দর্য সঞ্চার করেন। সরল গদ্যে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য' বিষয়ক প্রস্তাব ১৮৫৩ সালে ছাপা হয়। তার আগে তিনি হিন্দী মূল অবলম্বনে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' লিখেছিলেন। তাছাড়া তাঁর বাংলার ইতিহাস, 'জীবন চরিত', 'নীতিবোধ' ইত্যাদি বইগুলিরও নাম করা যেতে পারে। সংস্কৃত মূলের ছায়ায় তিনি 'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাস' লিখেছিলেন,—সেক্‌স্‌পীয়রের 'কমেডি অব এরর্স'-এর অনুসরণ করে তিনি তাঁর 'ভ্রান্তি বিলাস' লেখেন।

জর্জ কুমের 'কনস্টিট্যুশন অব ম্যান' অবলম্বনে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় দত্ত তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইখানির প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। অক্ষয় দত্ত ছিলেন সেকালের দার্শনিক পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক। পরের বছর বাহ্যবস্তুর দ্বিতীয় ভাগ বের হয়। দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্য পেয়েছিলেন তিনি। যুক্তি এবং বিশ্লেষণের পথ ধরে, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নতুন ধরনের আলোচনার তিনি প্রবর্তক তো বটেই, তা'ছাড়া অক্ষয়কুমার ছিলেন বিচার-বিতর্কের উপযুক্ত গদ্য-রীতির স্রষ্টা। নীতি এবং ধর্ম বিষয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধমালা 'উপদেশকথা' বেরিয়েছিল ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' এবং ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বালোচনার বই 'ষড়দর্শনসংবাদ'ও উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টান যাজক-সম্প্রদায়ের ধর্মালোচনার ঢেউ যখন শুরু হয়, শতাব্দের সেই সূচনা-পর্ব থেকেই দেশের পত্র-পত্রিকার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সেই ধারাটি প্রবাহিত হতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের ঝোঁক দেখা দেয়। উনিশ শতকে বাংলার বিচিত্র পরিবর্তনের কথা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' বইখানির মধ্যে চিত্তাকর্ষক ভাবে বলা হয়েছে। বাংলার নবীন এক শিক্ষিত দল পশ্চিমের শিক্ষাদীক্ষার জৌলুষে সেকালে মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগী দলও ছিলেন বটে। কিন্তু কয়েকজন মাত্র বিদ্বান ব্যক্তির সমবায়ে গড়া সে-দলকে অন্যদলের তুলনায় ছোটোই বলতে হবে। সেকালে অধিকাংশের আগ্রহ ছিল পরিবর্তনের দিকে।

শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অন্যান্য প্রসিদ্ধ গদ্য-লেখকের আবির্ভাব হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রথম ছাপা হয়। তার বাইশ বছর পরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ এপ্রিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' স্থাপিত হয়।

বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দ-স্পন্দন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন। তাঁর গদ্য-প্রবাহে সংস্কৃতের নানা শব্দ জায়গা পেয়েছিল। তৎসত্ত্বেও তাতে অভূতপূর্ব শক্তি এবং স্বাধীনতার স্বাদ বজায় ছিল। তাঁর গদ্যরীতির বিষয়ে সমালোচক এই কথাই বলেছেন যে, প্রতিদিনের সাধারণ জীবনের সান্নিধ্য মেনে নিয়েও সে গদ্য উচ্চকোটির শিল্প-শক্তির অভিব্যক্তি সাধনের পক্ষে অনুকূল ছিল,····· একাধারে তা চল্‌তি এবং মার্জিত,—সরল এবং যথাযথ,—বর্ণাঢ্য এবং সংগীতময়; আধুনিক হলেও তাতে সংস্কৃতের নাড়ীর যোগটি সুস্পষ্ট! তিনিই বাংলা গদ্যের সাধু-সাহিত্যিক রূপটি সৃষ্টি করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কীর্তিমান মনীষীরা এসে সেই গদ্য-রূপেরই বিচিত্রতর সার্থকতা দেখিয়ে গেছেন।

শতকের শেষার্ধের বাংলা গদ্য-লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছড়িয়ে ছিল ব্যাপক ভাবে। তাঁর অনুসরণকারী এবং বিরোধী নানা দলের বিচিত্র গদ্য রচনার মধ্যে সেকালের কথা-সাহিত্যের কথাই বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁদের পরে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যে রোমান্টিক আখ্যান এবং সামাজিক কাহিনী রচনায় হাত দেন। প্যারীচাঁদ তো 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্ম-নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর রীতি ছিল প্রধানতঃ চল্‌তি,—এবং মহিলাদের পক্ষে সুবোধ্য ভাষায় জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 'মাসিক পত্রিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে সংরক্ষণপন্থী গোঁড়ার দল অসন্তুষ্ট হলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রগতি-বাদী লেখকরা খুশি হয়েছিলেন। ১৮৫০-এর পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে কতো যে বই, কতো যে পত্রিকা বেরিয়েছিল। এক সঙ্গে অনেক নাম মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। ফেনেলনের মূল ফরাসী থেকে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ 'টেলিমেকস',—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' আর 'রহস্য-সন্দর্ভ',—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' এবং 'পৌলবর্জিনী',—কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্কৃত মহাভারতের গদ্যানুবাদ কোনোটিই ভোলবার নয়। সেকালের নবীন গদ্য-লেখকদের ওপর এই সব রচনার প্রভাব বর্তেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের গদ্যকে সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন করে গেছেন। রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, চাতুর্যময় হাস্য-কৌতুক এবং গভীর ভক্তিভাব,—মানুষের যাবতীয় মনোভাব, যাবতীয় বাসনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা গেছে তাঁর গদ্যে। তাঁর সমসাময়িক গদ্য-লেখকদের তিনি প্রেরণা যুগিয়েছেন, অনুবর্তীদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলা গদ্যে সাধু ভাষা এবং চলিত

ভাষার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে। তারপর বারবার সে বিরোধের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় যখন 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হয়, চলিত রীতির অনুকূলে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়েছিল সেই সময়েই। তার অনেক কাল আগের রচনা রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের' কথা মনে পড়ে। সেও চলিত রীতির গদ্য। কিন্তু সেই তখন থেকে 'চতুরঙ্গ' পর্যন্ত—রবীন্দ্রনাথ সাধুরীতিতেই একনিষ্ঠ ছিলেন বলা যায়। 'সবুজ পত্রের' আমলেই রবীন্দ্রনাথ পূর্ণভাবে চলিত রীতি গ্রহণ করেন।

গত ষাট বছরের বাংলা গদ্য-রীতির বৈচিত্র্যের আলোচনা অল্প কথায় ফুরোবেনা। শরৎচন্দ্র দেখিয়ে গেছেন সরল সাধুরীতি, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গেছেন গদ্যের পরমাশ্চর্য দ্যুতি বা স্ফূর্তি। 'বীরবল' ছদ্ম-নামে প্রসিদ্ধ প্রমথ চৌধুরীর রীতি যেমন উজ্জ্বল, তেমনি কৌতুক-খচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য উত্তেজনাজনক। শরৎচন্দ্র এবং সমকালীন অন্যান্য কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে সাধু রীতিতেই যাঁরা নিষ্ঠা বজায় রেখেছিলেন, সংলাপের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায় সকলেই চলতি রীতির আনুগত্য করেছেন।

শরৎচন্দ্র সাধু, সরল অভ্যস্ত রীতিতেই একনিষ্ঠ ছিলেন। গল্প-উপন্যাসে—বর্ণনার জন্যে সাধু-রীতির ব্যবহার,—এবং সংলাপে চলিত-রীতির প্রয়োগ এখনো বাতিল হয়ে যায়নি। তাঁর ছেলেবেলার গল্প 'লালু' কিন্তু আগাগোড়া সবটাই চলিত রীতিতে লেখা। বইয়ের মধ্যে প্রথম এসব লেখা আশ্রয় পায় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর এসব' লেখা গৌণ। প্রধান প্রধান রচনাতে তিনি পুরোপুরি এ রীতি গ্রহণ করেন নি। তাঁর গদ্যরীতির একটু নমুনার জন্যে অতঃপর 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব খুলে দেখা যেতে পারে :

'তবে, আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারিব না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন, সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া জগতে আর কেহ কি আছে যে, অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।'

এ-রীতি সাধু ক্রিয়াপদ এবং সাধু সবনামের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি থেকে এর প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' থেকে সূর্যমুখীর চিঠির কয়েক ছত্র এখানে তুলে দেখা যেতে পারে :

'আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে ? কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব ? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম।'

হয়তো রমণীচিত্তের ব্যাকুলতাবশেই সূর্যমুখী তাঁর এই চিঠির ভাষায় 'করিয়াছি', 'লইয়া' 'বলিব' ইত্যাদি সাধু ক্রিয়ারূপের সঙ্গে 'চেয়ে' চলিত রূপটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এ-অনুমান ঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে এ-রকম মিশ্রণ হামেশাই ঘটে থাকে।

এখনকার জীবিত কথা-সাহিত্যিকদের অল্প কয়েকজনের নাম করতে হলেও বলা যেতে পারে যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—বনফুল যাঁর ছদ্মনাম,—অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বুদ্ধদেব বসু,—প্রমথনাথ বিশী এবং আরো অনেকে মিলে বাক্য, বাক্যাংশ, অনুচ্ছেদের গঠনে, বাংলা গদ্যের অন্বয়ে এবং স্থাপত্যে কতো যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, সে কথা প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক বাংলা গদ্য-লেখকের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুই বোধহয় সর্বাধিক মসৃণ, সর্বাধিক মধুর রীতির স্বাদ জাগিয়ে রেখেছেন। সাধু ভাষায় শব্দ-সম্ভার ব্যবহার ক'রে, চলিত-রীতিতে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন রাজশেখর বসু। বর্তমানে কেবল ছোটদেরই লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর ঝোঁক অনুপ্রাসে এবং শব্দ-ক্রীড়ায়। তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের অন্যতর রীতির তুলনা করতে হলে মনে হয় হাসিতে, স্ফূর্তিতে, কৌতুকে উচ্ছল কোনো-এক নাগরিক পরিবেশ থেকে সুদূর দিগন্ত-ছায়া-বেষ্টিত, স্বপ্নমাধুর্যময় কোনো-এক দেশান্তরে পৌঁছোনো গেল! তত্ত্বচিন্তামুখ্য গদ্য-লেখকদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সাবলীল রীতি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অতিসংহত, দুরূহ রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া নানা বিজ্ঞান বিষয়েও তথ্য-ব্যাখ্যানের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে একালের গদ্য-লেখকদের মধ্যে। সংবাদপত্রের গদ্যেও সৌষম্যের আদর্শ এখন আর দুর্লক্ষ্য নয়। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা গদ্য আধুনিক জীবনের গতিবেগে এবং বিচিত্র বিদ্যানুসন্ধিৎসায় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক বাংলা গদ্য বর্তমান মানব-সংসারের বহুবিচিত্র ভাব-প্রকাশের পক্ষে সমর্থ এবং সমৃদ্ধ বাহন। নানা সমালোচক এবং স্রষ্টার সাধনায়, সুদীর্ঘ ১৬০ বছরের প্রযত্নে বাংলা গদ্য তার বিশিষ্ট শক্তি অর্জন করেছে। এ গদ্য ইংরেজির কাছে নানাভাবে ঋণী। স্বচ্ছতা, সারল্য এবং দীপ্তির দিকেই এর বিশেষ আগ্রহ। বাংলার গদ্য-শিল্পী গদ্যের অঙ্গসংস্থানে শক্তি-সঞ্চারের প্রয়াসী।

বাংলা ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্যহীনতা সে পথে দুস্তর বাধা। ইংরেজি এ গদ্যে সংহতি দিয়েছে,—সংস্কৃত দিয়েছে শব্দ এবং অর্থের সমৃদ্ধি।

আধুনিক সাহিত্যের 'বাস্তবতা'

যুক্তি দিয়ে যাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায়, তার জন্য মনের আগ্রহ একটি সম্যক আশ্রয়ে পরিসমাপ্তি পায়। মননের এই জাতীয় অধিকার স্ফটিকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়, মনে হয়। সে মূর্তি স্বচ্ছ, সুসীম, স্পর্শসহ। মননের আরো এক মূর্তি আছে,—তাকে বলা যায়, ছায়ামূর্তি। সে মূর্তিতে রূপ ও অরূপের সেতুবন্ধন ঘটে,—কল্পনা মুক্তি পায়,—অবিশ্বাসের প্রহরীগুলো নীরব তিরস্কারে ধিকৃকৃত হয়ে শান্ত হয়।

সাহিত্যে সেই ছায়ামোহমুগ্ধ মানবচিত্তের বিলাসই পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করেছে। সংসারাসক্ত মানববুদ্ধি এই আলৌকিক মোহ থেকে আত্মরক্ষা করতে না পেরে সাহিত্য-বিচারে বাস্তবতা আর অবাস্তবতার সম্প্রদায়-ভেদ প্রচার করে এসেছে। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় পার্থক্য আপেক্ষিক ভেদ ঘোষণা করে মাত্র, কোনো কাব্যই অবিমিশ্র বাস্তবতাধর্মী হতে পারে না। অর্থাৎ, বস্তু যেখানে ভাবব্যঞ্জনাহীন বস্তুরূপেই সুসম্পূর্ণ, সেখানে কবিকল্পনা কর্মহীন থাকে; এবং বস্তুরাজ্যে কবি যে-কাজেই লিপ্ত থাকুন না কেন, কাব্যরাজ্যে তাঁর প্রবেশপত্রের জন্যে কল্পনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দিনের আলোয় যে গাছটি বহুপরিচিত, অতি সাধারণ এক দৃশ্যবস্তুমাত্র মনে হওয়া স্বাভাবিক, রাত্রির ছায়াপাতে সেই প্রাকৃত বৃক্ষই অপ্রাকৃত কল্পতরুতে রূপান্তরিত হতে পারে! এই অর্থে কবি-কল্পনাও এক রকম ছায়া,—অথবা এক রকম আলো, যার গুণে বস্তুর নবকান্তি চোখে পড়ে।

রসবিচারের ক্ষেত্রে একাধিক স্থায়ী ভাব থেকে সমুত্থিত একাধিক রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেও একটি রসকে যেমন 'আদি রস' নামে অভিহিত করা হয়, অর্থালংকারের মধ্যেও তেমনি একটি আদি-অলংকারের মর্যাদা দেওয়া যায় কাকে?—সে প্রশ্নের উত্তরে উপমা, রূপক, ব্যতিরেক প্রভৃতি তুলনাবাচক অর্থালংকারের কথাই মনে পড়ে।* প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংলগ্ন প্রাক্তন মনন ও বাসনার বিপুল ছায়ামোহস্পর্শেই তো রূপের রাজ্য অপরূপ দীপ্তিতে মণ্ডিত হয়,—বাস্তব জগতের সীমা মুছে গিয়ে বিপুলতর ক্ষেত্রের বিপুলতর চেতনার স্পর্শ মানুষের অধিগম্য হয়! একেবারে প্রথম শিক্ষার্থীর কাব্যানুশীলনেও এই শ্রেণীর অর্থালংকার আত্মপ্রকাশ না করে পারে না। দৃষ্ট রূপকে অবলম্বন করে সেই রূপোৎসারিত ছায়ার আস্বাদনেই কবির কবিত্ব

* Aristotle বলেছিলেন, রূপক-ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যই হোলো কবিপ্রতিভার বিশেষত্ব।

নির্ভর করে। মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই ছায়ার বৈচিত্র্য এবং জটিলতাও ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

এক আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কবির রচনায় স্নানের বাস্তব উপকরণ 'বাথটব' সম্বন্ধে এই রকম ছায়াসৃষ্টির চেষ্টা ঘটেছে। সেখানে কবি বলেছেন:

গরম জল যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসে
সাদা চীনা মাটির অস্তর্-লাগানো
'বাথ্ টবের' তখন যে চেহারা হয়,
আমাদের ক্রমবিলীয়মান বীর্যের প্রেরণাও
সেই রকম।

যে শরীরে-মনে শৌর্য সাধনের ঐতিহ্য নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, তার সঙ্গে একটি স্নানপাত্রের উপমা প্রয়োগের মূলে যে-দৃষ্টি, যে-রকম চেতনাই থাকুক না কেন, এখানকার এই কাব্যাংশেও সাদৃশ্য সন্ধানের কবিজনোচিত অনিবার্য প্রয়াসই সুপ্রকাশিত। উপমান আর উপমেয়,—এই দুই পৃথক বস্তুর সমধর্মিতা অবলম্বন করে কবির নিজস্ব অনুষঙ্গ-ক্ষেত্র থেকে যথোচিত অভিজ্ঞতার উল্লেখ-সূত্রে সহৃদয় ব্যক্তির অনুভূতিকে স্পন্দিত ও গাঢ়তর করবার জন্যেই এখানে কবিকল্পনার প্রয়াস ঘটেছে।

রসতত্ত্বে ব্যবহৃত পারিভাষিক 'ধ্বনি'-শব্দটিও এই বস্তু-অতিশায়ী রম্যানুভূতির প্রকাশক। একথা খুবই সুপ্রচারিত যে, শিশুপাঠ্য প্রাথমিক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে,' এই বর্ণনায় গভীর কবিতার আনন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। বাইরের জগতের প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির সূত্র ধরে, আমাদের অন্তর্জগৎ কখনো কখনো এই রকম পরম অভিজ্ঞতার বিস্ময় উপলব্ধি করে। মর্তের মধ্যে এই রকম অমর্তের আবির্ভাব সম্বন্ধে কবি লিখেছেন:

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি···

এই অমর্তের অনুসন্ধানে,—দূরলোকের এই অনিবার্য আকর্ষণে চলেছে রসলোকের যাত্রী! এই যাত্রা দৃশ্যলোক থেকে অদৃশ্যের অভিমুখে অনন্তপ্রসারিত। সেখানে যুগযুগান্তের পরিমাপ অর্থহীন। সমস্ত বিচ্ছেদ-চিন্তা সেখানে বিলুপ্ত হয়। কবি লিখেছেন,

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে

সূর্য তারা ল'য়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।

বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষের বস্তুপ্রীতি ও জড় বন্ধনাসক্তি যতোই পরিবর্ধিত হোক্ না কেন, কবি-কল্পনার দুর্মরতা তবু সুপ্রতিষ্ঠিত! কারণ, বস্তুকে অস্বীকার করা তার ধর্ম নয়। Robert Lynd বলেছিলেন, 'Poetry has a double birth: it has a utilitarian father and an aesthetic mother'। ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির স্তরে স্তরে বস্তু-সীমা উত্তরণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাই সকল যুগেই রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নপ্রবণতা দুরারোগ্য। কাব্যে, কবির সেই প্রেরণাই সাধারণ অভিজ্ঞতার মাটি থেকে অলৌকিক লাবণ্যময়ী প্রতিমা গড়ছে। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে,—আয়ুর পর্বে-পর্বে সেই প্রতিমাই চিরন্তনী প্রতিমা। তার বোধন আছে, বিসর্জন নেই!

ক্ষুদ্র দেশ-কালে আবদ্ধ মানুষ সাহিত্যের আনন্দলোকে বিরাট বিরাট সৃষ্টির সঙ্গে তার নিবিড় যোগটি উপলব্ধি করে থাকে। সাহিত্য যদিও বাস্তব জীবন থেকেই উদ্ভূত, তথাপি, বাস্তব জীবনের পরিসীমার মধ্যেই তা' অবরুদ্ধ নয়।

আমাদের জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আছে বটে,—কিন্তু সেই প্রবাহে সদৃশ ঘটনার সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা নেই। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক— এঁরা সকলেই নিজের-নিজের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাকে এক-একটি পরম উপলব্ধির সূত্রে গ্রথিত করে পাঠকের চিত্তে তাঁদের সেই-সেই ধ্যান সঞ্চার করে থাকেন। অন্তর্দৃষ্টি ও ভূয়োদর্শন,—মহৎ সাহিত্যিকের পক্ষে দুটি সামর্থ্যই সমান আবশ্যক। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য জীবনের বস্তুসম্পদের প্রতি উদাসীন নয়,—আবার, সান্তের সঙ্গে অনন্তের সমীকরণেও তা' বিমুখ নয়।

যুগ-পরিবেশের নির্মম এবং অতিমাত্রিক দাবির অত্যাচারে কোনো কোনো লেখক আমাদের এই স্থূল, সীমিত, সান্ত জগতের অভিজ্ঞতাকে এই অনন্ত লোকের শুদ্ধ চৈতন্যে স্থাপন, রক্ষণ ও পোষণের দায়িত্ব বিস্মৃত হন,—অথবা, তা' তাঁরা উপেক্ষা করে থাকেন। তাঁরা হলেন তাঁদের সমসাময়িক দেশ-কালের সাংবাদিক। আর এক দল ক্ষীণচিত্ত, মসীবিলাসী দেশ-কালের বাস্তব সংস্পর্শের উত্তাপ এবং গ্লানি থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টায় অলীক, অতিমর্ত্য মায়ালোকের

কুহেলিকায় আত্মসমর্পণের স্বপ্ন দেখেন। তাঁরাই তো নিন্দিত পলাতক দল! সাংবাদিক এবং পলাতক,—এই দুই সম্প্রদায়ের দোষগুলি পরিহার করে, গুণগুলি আত্মসাৎ করে,—বাস্তব জগতের সঙ্গে অনন্ত রসলোকের সমীকরণ ঘটিয়ে, যে সাহিত্যিক মানুষের মনোলোকের সঙ্গে বস্তুলোকের রসময় যোগটি পরিশীলিত বাক্যে এবং উপযুক্ত কলাবিধিতে অভিব্যক্ত করে তোলেন,—তিনিই হলেন সাহিত্যলোকের মহৎ স্রষ্টা,—কাব্যমালঞ্চের সার্থক মালাকার!

আমাদের সাহিত্যে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে—প্রধানতঃ, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের অন্দোলনে তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠা বা realism-এর দিকে প্রবল এক রকম ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, গোকুল নাগ, যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক), অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব,—এবং প্রায় একই সময়ে প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায় ইত্যাদি লেখকরা গদ্যে-পদ্যে তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। এইসব খ্যাতনামারা ছাড়া, স্বল্পখ্যাতিমান লেখকদের সংখ্যাও কম ছিল না। এঁদের বস্তুনিষ্ঠার বিশ্লেষণ করে দেখলে প্রধানতঃ দুটি সামগ্রী চোখে পড়ে,—প্রথমতঃ, তৎকালীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবপ্রসূত দুঃখবোধ,—দ্বিতীয়তঃ, যৌনাকাঙ্ক্ষার অতিরেক-অবদমন-ঘটিত তৎ-প্রসঙ্গের প্রবণতা।

কবিতার ক্ষেত্রে সে-সময়ে নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়-সূত্রেও নিকট বস্তুবেষ্টনীর প্রতি বাঙালী সাহিত্যিকদের অনুরাগ-চর্চা উদ্দীপনা লাভ করেছিল। তার আগে 'সবুজপত্রে'র দল বলে গিয়েছিলেন: 'দেশকালপাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্র ধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার জন্য কোনও খেদ নেই।'*

অতএব, এই ভূমিকায়,—১৩৩০-এর এপারে-ওপারে প্রায় এক যুগের, অর্থাৎ বারো বছরের বাংলা সাহিত্য তথাকথিত বাস্তবতা বা বস্তুনিষ্ঠার নামে কতকটা যে অনাচারী হয়ে পড়বে, সে-ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। ১৩৩৫-এ প্রকাশিত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রূপ ও রস' নামক গ্রন্থে এই দুর্লক্ষণ সম্বন্ধে যে খেদোক্তিটি স্থান পেয়েছে সেটি এখানে তুলে দেওয়া হোলো:

'আমাদের আজকালকার কাব্যজগৎ উপন্যাসজগৎ উপদেষ্টার ও প্রচারকের গর্জনে মুখরিত, ঋষির প্রশান্ত সৌন্দর্যানুভূতি সেখানে অতি বিরল।...'

'আজকালকার সাহিত্যের বিশেষত্বই এই যে, তাহা সমস্যামূলক (a these)।'

এই শ্রেণীর বস্তুনিষ্ঠার ধারা বাংলা সাহিত্যে আজ প্রায় বছর তিরিশেক অক্ষুণ্ণ

* বীরবলের হালখাতা: বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ

প্রবাহে চলে আসছে। সেই সূত্রে, সাহিত্যের ছদ্মবেশে, বহুসংখ্যক স্বল্পক্ষম এবং অক্ষম লেখকের সাংবাদিক রচনা বাজার গরম করে রেখেছে।

বাংলা সাহিত্যে ১৩৩০ সালের কাছাকাছি আমলের বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় সূত্রবৎ সংক্ষেপে এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর, এই কথাই বক্তব্য যে, যখনই আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বা ধর্মসংক্রান্ত অথবা প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা ঘটেছে, সেই-সেই ব্যাপার অবলম্বন ক'রে গদ্য-পদ্য রচনার আগাছায় তখনই দেশ ছেয়ে গেছে। এ ব্যাপার অস্বাভাবিক নয়। এ-থেকে জাতির লেখনীচালন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে শক্তিমানদের তুলনায় অশক্তের সংখ্যানুপাতিক অপরিসীম আধিক্য দেখে কিছু নৈরাশ্যও যে না ঘটে, এমন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর তো বাংলা মাসিক-সাপ্তাহিক-ত্রৈমাসিক-বার্ষিক ইত্যাদি কাগজগুলি যুদ্ধঘটিত কথা-উপকথায় পূর্ণ থাকতো,—তারই মধ্যে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন গেছে, ৪৩-এ মন্বন্তর গেছে—যুদ্ধের পরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা গেছে,—বঙ্গবিচ্ছেদের ফলে উদ্বাস্তু-সমস্যা ঘটেছে—এবং সে দুর্ভাগ্য এখনো কাটেনি ;—তারপর, যুদ্ধের আদিতে, মধ্যে, অন্ত্য-পর্বে—এবং যুদ্ধোত্তর বর্তমানেও পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদের চিন্তা রয়েছে। এই সব বস্তু বাংলার সদ্যস্তন সাময়িক সাহিত্যের দর্পণে, কালের গতিতে যথারীতি প্রতিফলিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যে হতে থাকবে, তাতে আর সন্দেহ কি! একজন সমালোচক লিখেছেন :

> 'এখনকার দিনে সমাজের নিম্নতর স্তরে যারা, তারা সবেগে সাহিত্যে এসে ভিড় করেছে—যা কুশ্রী, কদর্য, যা উপেক্ষিত, সেগুলো জড়ো হয়েছে রসশিল্পের আসরে। আধুনিকেরা বলছেন, এই দিকটাই হচ্ছে সত্যিকার দিক এবং এ দিকে নজর না করায় প্রাচীনদের দৃষ্টি ছিল অবাস্তব, এবং সেই জন্যেই অসত্য।*

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের এই আলোচনার পরবর্তী একটি অংশ এখানে বিস্তৃতভাবে তুলে দেখা দরকার। তিনি বলেছেন :

> 'এ যুগের রাজনীতি ও সংস্কৃতি মানুষকে যে চিন্তা-বিপ্লবের মধ্যে টেনে এনেছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতি সেই বিপ্লবকে যে-পরিমাণ পোষকতা করেছে, এবং সর্বোপরি রুশীয় সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাপক বিস্তার এই বিপ্লবকে যতটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তার সুযোগ দিয়েছে, তাতে সাহিত্যাদর্শেও ওলাট-পালট অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে গেছে। এই ভাব-বিপর্যয়কে মোটা কথায় বাস্তবতা আন্দোলন নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে বলা

*শতাব্দী ও সাহিত্য : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দরকার যে, বাস্তবতা সংজ্ঞাটা আধুনিক আন্দোলনকে ষোল আনা বুঝতে সহায়তা করে না।'

এর পর লেখক বলেছেন :

'যা এতদিন অনভিজাত বলে উপেক্ষিত ছিল, তাকে গ্রহণীয় করে তোলাতেই যে বাস্তবতার যথেষ্ট মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তা নয়। বরং নূতন দৃষ্টি ও ভাবাদর্শ প্রবর্তনের উন্মাদনায় আধুনিকেরাও বাস্তব থেকে ঠিক ততখানিই দূরে গিয়ে পড়ছেন, যতখানি দূরে ছিলেন প্রাচীনেরা রসাত্মকতার নাম নিয়ে।'

কথাটি প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে আরো একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'বাঁশরী' নাট্যে প্রকৃত 'বাস্তবতার' আদর্শ সম্পর্কে নব্য বাঙালী সাহিত্যিক ক্ষিতীশের প্রতি অভিজাত-কন্যা বাঁশরীর মুখে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কথা আরোপ করেছিলেন। বাঁশরী সেখানে ক্ষিতীশকে বলেছে : 'আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখো যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাচ্চা করে লিখতে শেখো।'

এবং পুনরায় অন্যত্র বলেছে :

'প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোঙরামিকে নয়।'

একেই বলে শিল্পলোকের বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক অনুবর্তী বাঙালী সাহিত্যিকদের এই তত্ত্বটি নিপুণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকেও এই একই কাজ করতে হয়েছিল প্রায় শতবর্ষ পূর্বে। তাঁর কথাগুলি এই সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক :

'কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনামধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্যের প্রশংসা কি ?'*

শিল্পক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠার স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থলে তাঁর একাধিক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। নিচে তাঁর আর দুটি উক্তি তুলে দেওয়া হোলো :

'ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই, যাকে মানুষ

* উত্তরচরিত (বিবিধ প্রবন্ধ)

আপন অন্তর থেকে অব্যবহিত ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে, এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম, জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়, সে অসুন্দর হলেও মনোরম, সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।'*

একটি ইংরেজি আলোচনায় তিনি লিখেছিলেন :

'And this is Reality, which is truth made our own,—truth that has its eternal relation with the Supreme Person.' †

প্রথমে 'বাঁশরী' থেকে, এবং পরে তাঁর অন্যান্য কোনো-কোনো রচনা থেকে এই যে উক্তিগুলি তুলে দেখা গেল,—এগুলির প্রতিপাদ্য বস্তু সহজবোধ্য। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, যে, মানব-জগতে মানুষের প্রবৃত্তি আছে, বিবেক আছে, এবং তারও ওপরে আছেন 'প্রকৃতি' বা 'ভবিতব্য'। প্রবৃত্তির সঙ্গে বিবেকের সংঘাত চলেছে এবং এই সংঘাত সত্ত্বেও এক অলৌকিক ভবিতব্যের দ্বারা মানব-জীবন শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই ভূমিকায় দাঁড়িয়ে, শেষোক্ত ইংরেজি উক্তিটিতে—সত্যকে তিনি আমাদের পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত, গভীর উপলব্ধির বস্তু বলে স্বীকার করেছেন।

বলা বাহুল্য, এ স্বীকৃতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবির স্বীকৃতি। যে-সমাজে এই রকম মন গড়ে ওঠে, সে-সমাজের মনোগঠন কি রকম? একজন আধুনিক পণ্ডিতের জবাব দেখা যাক :

'The basic relation of society was to be freedom from any relation —the free merchant, the free labourer, and free capital. With each man thus freely following his desires, the best interests of society as a whole would, it was asserted, be served.' ‡

ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় ব্যক্তি ও সমাজের এই হোলো পারস্পরিক সম্পর্কবোধ। এখন, অন্যপন্থীরা অন্য কথা বলছেন :

'But it is not true. Freedom is the product, not of the instincts, but of social relations themselves. Freedom is secreted in the relation of man to man.'

* সাহিত্যের পথে

† Personality : Rabindranath Tagore.

‡ Studies in A Dying Culture : Christopher Caudwell, (1938),

এই দৃষ্টির প্রসার ঘটেছে এ-কালের পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের মন থেকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনসমাজে,—তথা, লেখক-সমাজের মনে। ফলে, আত্মাশ্রয়ী বা স্বাশ্রয়ী সত্যোপলব্ধির ধারণা থেকে জ্ঞাতসারে অথবা অর্ধজ্ঞাতসারে একালের লেখকরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক বস্তুসম্পর্কগুলির পুনর্বিচারে এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। খণ্ড ও সাময়িক,—বর্তমান ও প্রাদেশিক জীবনচিত্রকে অনন্তের পটেই যে স্থাপন করতে হবে,—তাই যে করা উচিত,—এ সম্পর্কে এ-কালের 'বাস্তব' সাহিত্যিকেরও কোনো সংশয় নেই। কিন্তু 'অনন্ত' বললে 'ভবিতব্য'-শাসিত যে-অজ্ঞাতরাজ্যের ধারণা পূর্ববর্তীরা মনে মনে পোষণ করতেন, একালের ভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে সে ধারণা কোন ক্রমেই আর টিঁকে থাকতে পারছে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নামাঙ্কিত পুরোনো টাকা সংঘপ্রাধান্যবাদী এ-কালের বাজারে আর চলছে না। পুরোনো সংস্কার এখন আমাদের পদে পদে বাধা দিচ্ছে। একালের দুঃসাহসী জিজ্ঞাসুরা ব্যাপারটি তলিয়ে দেখে বলেছেন :

'Worn-out engines become brakes. Outworn truths become illusions. Bourgeois culture is dying of a myth.'

কোন্ সমাজের সংস্কৃতি আজ মৃতপ্রায়? কোন্ সুখস্বপ্নের নেশায় বর্তমান কাল এই সন্ধিযুগের গ্লানি ভোগ করছে? ১৩৪৪-এ প্রকাশিত একটি বাংলা সংকলন-গ্রন্থ থেকেই এ দুটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া যেতে পারে। এই বইখানিতে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

> 'বর্তমান জগতে ঘটনা বড় একঘেয়ে, এবং তার কারণ যন্ত্রের আধিপত্য নয়, যন্ত্রাধিপতির আধিপত্য।… পাছে বিপ্লব বাধে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ বল্লেন যে মূল্যজ্ঞানটাই সনাতন, এবং গতিটা মায়া। কোনো মূল্যজ্ঞানকে শাশ্বতে পরিণত করার মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ আছে। সাহিত্যে সনাতন তত্ত্বের, ঐতিহ্যের নজীর দেখানর মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখবার, কোনো একটি মুমূর্ষু মূল্যকে বোতলে পুরে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়। শবের দৌরাত্ম্য প্রগতিশীল লেখক মানতে পারেন না।'

ঐ একই গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

> 'মোটের উপর দেখি যে আমাদের সাহিত্যে একদিকে সনাতনী খাত প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে অদ্ভুত বৈদেশিকভাব (নরনারীর দেহরাগ-ভাবাতিরেক)* আসিতেছে। আমার মতে উভয়েই বেখাপ্পা। আমাদের সাহিত্যে 'realism'-এর অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। আমরা 'space and time'কে ঠিকভাবে ধরিয়া চলিতেছি না।'*

* বন্ধনী চিহ্নভুক্ত অংশ বর্তমান লেখকের

এই সময়ের বাংলা সাহিত্যে গতপ্রাণ সামন্ত যুগের অথবা অস্তোন্মুখ ধনতান্ত্রিক যুগের মুমূর্ষু মূল্যকে 'শাশ্বতে পরিণত' দেখবার যে দুর্মর আশা এঁরা টিঁকে থাকতে দেখেছিলেন,—বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করে Caudwell তারই নাম দিয়েছিলেন—'পুরাণ স্বপ্ন' বা myth ;—ধূর্জটিপ্রসাদ তাকেই বলেছিলেন 'শবের দৌরাত্ম্য'—এবং ভূপেন্দ্রনাথ সেই কারণেই খেদোক্তি করে জানিয়েছিলেন যে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে realism-এর বদলে anachronism ঘটছিলো।

ভাবাদর্শ পরিবর্তনের সময়ে সকল দেশে এবং সকল কালেই অন্তর্দৃষ্টিহীন, ভূয়োদর্শনহীন, স্বল্পশক্তিমান একদল লেখক চটকদার, স্বল্পায়ু মৌশুমী ফুলের মতো আবির্ভূত হয়ে নবজাতকের চিত্ততোষণে মেতে ওঠেন! মহৎ শিল্পীর কোনো গুণই তাঁদের থাকে না। মহৎ শিল্পীর আগমন সম্ভব করবার জন্মেই বোধ হয় তাঁদের প্রয়োজন আছে। প্রকৃত শক্তিমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয়ে শিশিরান্তরণের মতো তাঁরা শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যান। বাংলা সাহিত্যে গত তিরিশ বছরের মধ্যে,—অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যেই রবীন্দ্র-কালীন ভাবাদর্শে আর আমাদের মন উঠছে না বলে যখন থেকে রব উঠেছে,—তখন থেকে অদ্যাবধি, এই রকম যুগ-তোষক 'সাহিত্যিক' দলে দলে এসেছেন এবং গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যে, যেখানে তিনি বলেছেন, 'নূতন দৃষ্টি ও ভাবাদর্শ প্রবর্তনের উন্মাদনায় আধুনিকেরাও বাস্তব থেকে' দূরে গিয়ে পড়েছেন,—সেখানে তিনি এই যুগতোষক আধুনিকদের কথাই ভেবেছেন। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে এই সময়ের মধ্যে শুধু যে যুগতোষণই ঘটেছে, তা' নয়,—সার্থক গল্প-উপন্যাস-কাব্য-নাটকও অনেক লেখা হয়েছে,—এবং সেইসব সার্থক রচনা নিকটতম বর্তমানকে এড়িয়েও চলেনি—আবার সেই বর্তমানকে এ-জীবনের সর্বস্বও মনে করেনি।

পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তথাকথিত যে 'আধুনিক'-দের কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নায়িকা বাঁশরী সেই দলের প্রতিভূ কল্পিতনামা ক্ষিতীশকে বলেছে, 'স্পষ্ট জানতে শেখো,…সাচ্চা করে লিখতে শেখো।' রবীন্দ্রনাথ বাঁশরীর মুখে 'বাস্তব সাহিত্য'-অভিপ্রায়ী বাঙালী সাহিত্যিকদের সুপরামর্শ যে দিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 'সাচ্চা করে' দেখবার জন্যে একদিকে যেমন দ্রষ্টার পক্ষে প্রস্তুতি দরকার হয়,—অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের বিশেষ লগ্নের আবশ্যিকতাও কি উপেক্ষা করা যায়? রবীন্দ্রনাথকে জিগেস করলে তিনি হয়তো বলতেন, 'সে লগ্ন ভবিতব্যের হাতে!' ভিন্ন-বিশ্বাসীরা সেই কথাটাই অন্যভাবে বলেন। রবীন্দ্রনাথের উপাসিত Supreme Person-এর আনুকূল্য কামনা না-ক'রে তাঁরা দাবি করেন—'সমাজ পরিবর্তিত হয়, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, আর শিল্প সাহিত্যও নূতন রূপ

লাভ করে। শিল্প ও সাহিত্যের সেই নূতন রূপ নির্ধারিত হয় নূতন সংস্কৃতির প্রভাবে।'*

পণ্ডিতম্মন্য অনুবাদীরা যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্র-যুগের মূল্যবোধ আমাদের সংস্কৃতি থেকে এখনো যে সম্পূর্ণ উবে যায়নি, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, এবং তৎপরে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক আলোড়নে আমরা নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছি এবং হচ্ছি বটে,—সামাজিক সম্পর্কের অভ্যস্ত মাধুর্যেও যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই,—বেকার-সমস্যা এবং উদ্বাস্তু-সমস্যাও নগণ্য নয়,—তথাপি, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্র-যুগের পরবর্তী অন্য কোনো নেতৃনামবেদ্য অধ্যায় এখনো শুরু হয়নি। বর্তমানে যা চলছে,—তা' রবীন্দ্র-যুগেরই অন্ত্যপর্ব,—অথবা, বড়ো জোর বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র-তিরোভাব-জনিত অবক্ষয় (decadence)-পর্ব। এই পর্বে আমাদের অভ্যস্ত রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের কিছু কিছু বদল হয়েছে বটে,—তবু সাহিত্যের আসরে যুগন্ধর নবীন স্রষ্টা কোথায়? নতুন সংস্কৃতি এখনও স্তন্যপায়ী। চিন্তাশীল শুভার্থীরা অবশ্যই তার পুষ্টি কামনা করবেন,—যুগতোষক অগ্রগামীরা তাকে দোলনায় দোল দেবেন,—কিন্তু যতোদিন সে-সংস্কৃতি সাবালক না হয়, ততোদিন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নামে সাংবাদিকতা, ব্যাপ্তির নামে বিভ্রান্তি এবং নতুনত্বের নামে উৎপাত যে কিছু পরিমাণে ঘটবেই, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে, ভরসা এই যে, রবীন্দ্রনাথের শুভব্যক্তিত্বের প্রসাদে বাংলা সাহিত্যের হাওয়া দীর্ঘকালের মতো সুরভিত হয়ে গেছে এবং সেই আবহের গুণে সাধারণ বাঙালী লেখকের গদ্য-পদ্যের হাত যে পেকেছে, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব, এই স্বল্পক্ষম মধ্যবর্তীদের শব্দচালনা যে চলনসই না-হবে, এমন আশঙ্কা নেই,—এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিমান, স্ব-কালচেতন, যুগ-স্রষ্টা লেখকের সুস্থতর বাস্তব দৃষ্টির স্বাস্থ্যকর, শক্তিবর্ধক, স্নিগ্ধোজ্জ্বল তাপ এবং দীপ্তির প্রতীক্ষা করতে করতে বাংলা গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা ইত্যাদির আঙ্গিকে ও প্রসঙ্গে আরো বিচিত্র পরীক্ষা আমরা দেখতে পাবো বলে আশা করতে পারি।

ধনতান্ত্রিকতার গঙ্গাযাত্রা শুরু হয়েছে,—পণ্ডিতদের এ সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত হয়, তাহলে তার অন্তর্জলির পরে গঙ্গালাভ পর্যন্ত নবীন উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষা করতে হবে,—ইতোমধ্যে পুরোনো শিল্পীরা দীর্ঘকালের অভ্যাস ভুলে সহসা দিব্য-জ্যোতির্ময়ী কোনো প্রতিমা গড়তে পারবেন বলে ভরসা হয় না,—তবে, রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে এবং পরে অদ্যাবধি যেমন অনেক ভালো পুতুল গড়া হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতেও তেমনি আরো কিছু গড়া হবে। 'পুতুল' কথাটা এখানে তুচ্ছার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

* 'সংস্কৃতির রূপান্তর' : গোপাল হালদার

প্রকৃত শিল্পরসিক ব্যক্তি পুতুলকেও অবজ্ঞা করেন না। পুতুলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেই তা প্রতিমায় পরিণত হয়। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরোহিতের ডাক পড়ে থাকে,—কিন্তু ভক্ত দর্শক ব্যতিরেকে পুরোহিতের সাফল্য কি সম্ভব? সাধারণ দর্শকের চোখে কালিঘাটের কালীপ্রতিমা হিংস্রদর্শন এক পুতুল মাত্র;—আবার, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চোখে তার ব্যঞ্জনা অন্য রকম! অতএব, সহিষ্ণু ব্যক্তিরা প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা পূজারীর সঙ্গে প্রাণ-প্রতীক্ষ্যমান ভক্তের সহযোগিতার প্রয়োজনটি অস্বীকার করতে পারেন না। যাঁরা হিন্দুধর্মের মর্মকথাটি জানেন, তাঁরা হিন্দুকে পৌত্তলিকতার অপবাদ দেন না; যাঁরা তা না-জানেন, তাঁদের তিক্তবচন স্বদেশে-বিদেশে বহুবার শোনা গেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই রকম। শব্দে, ছন্দে,—অধ্যবসায়ে, সহিষ্ণুতায় একালের রূপকার একালের অনেক রূপ ফুটিয়ে তুলছেন,—নানান্ মূর্তি গড়ছেন। কিন্তু সর্ববরেণ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাতার আজ সমূহ অভাব! সেজন্যে, রূপকারকে দোষ দেওয়া সুবিচার নয়। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপকার এবং পুরোহিত দেখা দেন একাধারে। অর্থাৎ যিনি ধ্যান করেন, তিনিই রূপ গড়েন। কাব্যের বিষয় যে-মনে ধরা দেয়, কাব্যের আঙ্গিক বা শিল্পরীতি সেখান থেকেই নিঃসৃত হয়। আজ বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান রূপকারদল তাঁদের বহু-যত্নে-গড়া পুতুলকে-যে প্রতিমা করে তুলতে পারছেন না,—তাঁরা-যে বিপুলায়তন কোনো ভক্ত-সম্প্রদায়ের পুরোহিত হয়ে উঠতে পারছেন না,—বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বচিত্তজয়ী কোনো বাঙালী সাহিত্যিক যে এ-কালে আবির্ভূত হচ্ছেন না,—সে অক্ষমতা কি শুধু এ-কালের বাঙালী সাহিত্য-সাধকের ওপরেই সম্পূর্ণ চাপিয়ে দেওয়া উচিত? দেশে আজ নতুন যুগের নতুন বিশ্বাস কোথায়?—বীণাপাণির নববোধনের লগ্ন কি সত্যিই এসেছে? নতুন বিশ্বাস না-হয় এখনো ফুঠে ওঠে নি! প্রবল কোনো অবিশ্বাসই কি ফুটেছে? আস্তিক্য না থাক্—দৃঢ়-দুর্জয় নাস্তিক্য-ই বা কোথায়? দেশের জনসাধারণ এবং দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত যে বিরোধের বীজ ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশের,—তথা ভারতবর্ষের জীবনে বপন করে গেছে,—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে যে-কথা বলে গেছেন,—আজ সেই বিরোধের ব্যবধানটাই সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে। সেই বীজ থেকে উৎপন্ন আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষবৃক্ষের ফল এতোদিনে দেশের পাকযন্ত্রে প্রবেশ ক'রে, তার সর্বশরীরে নৈরাশ্য ও নির্বেদের লালা ক্ষরণ করছে। তাই আজ দেশ থেকে দৃঢ় বিশ্বাস হোলো অন্তর্হিত,—গভীর ধ্যান হোলো অস্তগত। এখন মুষ্টিমেয় 'স্বাস্থ্যবান' ব্যক্তি তাঁদের বিত্তগত, অথবা, বিত্তনিরপেক্ষ

বিরল ব্যাপক-দৃষ্টিক্ষমতাগত, কৃতিত্বের জোরে, হয়, পূর্ব-বিশ্বাসে আস্থাবান আছেন,—নতুবা, নব-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছেন। প্রথমোক্তদের কথা বর্তমান আলোচনায় ধর্তব্য নয়,—কারণ তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুদ্র বিত্তগোষ্ঠীগত,—বৃহত্তর, ব্যাপকতর যুগ-জীবন-প্রবাহ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন। তাঁদের মনোদর্পণে প্রাক্তন সংস্কারের আবরণ দুর্মর,—তাঁদের সঞ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁদের নবজীবনের বাধা। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে মহৎ স্রষ্টার পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি তেমন কোনো মহৎ স্রষ্টামানসের আবির্ভাব ঘটে, তা'হলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বজনস্বীকার্য আধুনিকতার তিনিই হবেন স্রষ্টা—এ-কালের 'বাস্তবতা'-কে তিনিই দেবেন কালজয়ী ভাষা! তা' যদি না হয়,—তাহলে প্রতীক্ষা করতে হবে সেই বহুদুঃখ-পরিস্রুত শুভলগ্নের—যে লগ্নে, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শিশুর জন্ম হয়,—মূক, অন্ধ, নৈশ স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে পূর্বাকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে,—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হন অমৃত!

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্রষ্টা ও সমালোচকেরা বলেছেন যে, নতুন সৃষ্টির এই প্রসববেদনা হোলো শিল্পস্রষ্টার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সাম্যবাদী পর্যালোচকেরা বলেন যে, এই বেদনা শুধু ব্যক্তিগত নয়,—দেশগত, কালগত, ঐতিহাসিক ধারাগত। তাঁরা বলেন, পরিবর্তনই সৃষ্টির স্বভাব,—অর্থনৈতিক সম্পর্কও মানব-সমাজে পরিবর্তিত হচ্ছে,—ফলে, তথাকথিত 'স্থায়ী' ভাব আর রসের রাজ্যেও বিপ্লব ঘটছে—ফলে, এক যুগের 'বাস্তবতার' আদর্শ অন্য যুগের সমর্থন পাচ্ছে না। প্রত্যেক যুগের শিল্পাদর্শ সেই যুগের বিত্তচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিল্প আর সাহিত্য আকাশ থেকে পড়ে না,—দেশের মাটি থেকে, যন্ত্র থেকে, মানুষের মন থেকেই এরা অঙ্কুরিত হয়। অতএব, সাহিত্যের বাস্তবতা একটা ধ্রুব পদার্থ নয়,—'বাস্তবতা' হোলো নিত্যপরিবর্তমান মানবসমাজের নিত্যবিবর্তমান যুগচেতনা,—অর্থাৎ শিল্পীর সেই আত্মবোধ, যা আত্মস্বাতন্ত্র্য নয়,—যাকে বলা যায়, যুগসত্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ! এই তত্ত্বই নিহিত আছে তাঁদের পারিভাষিক সূত্রে—দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের (Dialectical Materialism) দৃক্‌কোণে।*

* At a certain stage of their development, the material forces of production in society come in conflict with the existing relations of production, or, what is but a legal expression for the same thing, with the property relations within which they had been at work before. From forms of development of the forces of production, these relations turn into their fetters. Then comes the period of social revolution. With the change of the economic foundation, the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed.—Karl Marx.

সাহিত্যে-শিল্পে 'বাস্তবতা'-র আলোচনা এই অবধি এসে অতঃপর দ্বি-ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য। যাঁরা বিতর্কবিজ্ঞ, তাঁরা এ-দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের গ্রাহ্য, তা নিয়ে তর্ক জমিয়ে তুলতে পারেন,—যাঁদের ধৈর্য আছে, তাঁরা এ দুই স্রোতের মহাসঙ্গম পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারেন। অন্যেরা এই যুক্তবেণীর তীর থেকে দূর সঙ্গমের ধ্যানটি একবার চিন্তা করে দেখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ধ্যানের উদ্‌গাতা। কাব্যে 'বাস্তবতা'র উৎস এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে নিচের মন্তব্যে :

'যে সত্য আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোন মূল্য নেই, সে হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা কিছু আমাদের সুখ দুঃখ বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা দীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব ব'লে গ্রহণ করি, সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারো প্রশস্ত কারো সংকীর্ণ। কারো দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে বিশ্বের ছোটবড় অনেক কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ শক্তি।'*

এই ধ্যানে সাহিত্য-রসের ধ্রুববাদীদেরও আপত্তি নেই, পরিবর্তন-বিশ্বাসীদেরও অনাস্থার কারণ নেই। এই মান অনুসারে ফরাসী সাহিত্যের Goncourt-ভ্রাতৃবৃন্দের প্রচারিত 'বাস্তবতা' অ-গ্রাহ্য ; কিন্তু মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'ও বাস্তব, শোলোগভের উপন্যাসও বাস্তব,—আবার, একালের লেখক সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'ও বাস্তব সাহিত্য। সৃষ্টি চলমান, মানুষের মন স্থাণু নয়,—অতএব 'বাস্তবতা'ও একটি চলন্ত সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের অনেক কবিতায় এই ধারণাটিই ফুটে উঠেছে।

* বাংলা ভাষা পরিচয়

বীরবলের ভাষা

১৯২০-তে প্রকাশিত একটি বাংলা প্রবন্ধের বইয়ে 'বীরবল' সম্পর্কে ছোটো একটি আলোচনায় বলা হয়েছিল :

'শব্দের দেহায়তন যত বাড়বে অর্থের মূল্যও যে তত চড়বে এ ভুল আমাদের প্রমথবাবু ভেঙেছেন। শব্দকল্পদ্রুমের বাইরেও যে চিন্তাশীলতার অবসর আছে তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।'

এবং—

'প্রমথবাবুর লেখার স্বর খাঁটি বাংলা ভাষার স্বর—বলা বাহুল্য, এ-স্বর যে কি তা যিনি নিজের কান দিয়ে না বোঝেন তাঁকে কলম দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে—যে-স্বর চণ্ডীদাসের, যে-স্বর কবিকঙ্কণের—যে-স্বর সংস্কৃত-বহুল হলেও ভারতচন্দ্রের—

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল বলে।

এই লাইনগুলোতে আছে,—এ-স্বর—সেই স্বর।'*

প্রথম উক্তিটির অর্থবোধে কোনোরকম সংশয় ঘটবার কথা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিটি দেখে একটু গোলমাল ঠেকে। চণ্ডীদাস—মুকুন্দরাম—ভারতচন্দ্র—তিনজনেই কবি। প্রথম চৌধুরী যদিচ কয়েকটি 'সনেট' লিখে কবি-খ্যাতি অর্জন করেছেন, তথাপি, তাঁর প্রধান পরিচয় হোলো গদ্য-লেখক হিসেবে। কবিতার ভাষা এবং গদ্যের ভাষা Free verse-এর আধারে সমীকৃত হয় বটে ;—তবে Free verse বা মুক্তচ্ছন্দে পূর্বোক্তনামাদের মধ্যে একজনও আত্মপ্রকাশ করেন নি। আর Free verse কাব্যশিল্পের একটি রীতি মাত্র—এবং সাহিত্যিক রীতি মাত্রেই কৃত্রিম ; অতএব ও-জিনিসটিও খাঁটি বা অকৃত্রিম নয়।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুসারে দেখা যায় যে, আধুনিক বাংলা ভাষায় মোটামুটি তিনটি শ্রেণী-বিভাগ চলতে পারে : ১। সাধুভাষা, ২। চলিত ভাষা—কলকাতা এবং সারা বাংলার শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষা এবং ৩। বিভিন্ন উপভাষা, যেমন, মানভূম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ইত্যাদির আঞ্চলিক ভাষা। এর মধ্যে প্রথম শাখাটি প্রধানতঃ লেখকদের কলমের আর ছাপাখানার পরিচর্যায় মোটামুটি রামমোহন রায়ের আমল থেকে বেড়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র ইত্যাদি লেখকরা

* সবুজ কথা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২০)

সে-ভাষার জন্মকালের বহু পূর্বে দেহরক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় শাখাটি সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে বিশ শতকের প্রথম পাদে ('সবুজ পত্রে'র প্রথম আবির্ভাবকাল ১৯১৪)—প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীনরা সে-ঘটনাও চোখে দেখবার সুযোগ পান নি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগটির উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন,—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে যে-অর্থে খাঁটি বাংলা ভাষার উল্লেখ করেছেন, সে অর্থ যতোই অস্পষ্ট মনে হোক্ না কেন, তবু এ-কথা অবধারিত সত্য, যে বাংলা উপভাষাগুলির কথা তিনি ভাবেন নি।

তা'হলে প্রবন্ধ-লেখকের পূর্বোক্ত ঐ উক্তিটির মানে কি? প্রমথ বাবুর লেখার সুর 'খাঁটি বাংলা ভাষার সুর'—এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দরকার। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী যাঁদের ভাষার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের প্রথম দু'জনের কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তৃতীয় ব্যক্তি ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভাকবি। প্রমথবাবু তাঁর 'আত্মকথা'-য় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) কৃষ্ণনগরের কথাও বলেছেন :

'আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা।...আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙাল কিন্তু আমার মুখের ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার মূল পুঁজি, তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে। বাংলা বই ছেলেবেলায় অনেক পড়েছি, কিন্তু বইয়ের ভাষা আমার কস্মিন কালেও আদর্শ ছিল না।...'

'...আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে ত তার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।...সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমারা দু'জনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দু'জনেরই লেখায় আর যে গুণের অভাব থাক্—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়।'*

প্রমথ চৌধুরীর ঝোঁক যে বাংলা ভাষার কোন্ রীতির দিকে ছিলো, তা এই 'আত্মকথা' থেকে বোঝা গেল। তিনি কৃষ্ণনগরের মুখের ভাষাকে ভালোবেসেছিলেন। মুখের ভাষা চলতি ভাষা,—তা মুখে মুখে চলতে পারে, বদলাতে পারে,—পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত আত্মবিস্তার ঘটাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা চলে :

'সাধুভাষা মাজা ঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে

---

* আত্মকথা : পৃঃ ১৭-১৮

তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।' *

সাধারণতঃ এই চলতি ভাষাকেই বলা হয় 'কথ্যভাষা',—রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, 'প্রাকৃত বাংলা'। ভারতচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক 'প্রাকৃত বাংলা'কে অবজ্ঞা করেন নি, —এবং, চণ্ডীদাস-মুকুন্দরামও আপন-আপন কালের এই 'প্রাকৃত বাংলা'র প্রতি উদাসীন ছিলেন না। সুতরাং এঁদের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী-র ভাষাগত সাদৃশ্যের কোনো ভিত্তি যে আদৌ নেই, এমন কথা বলা সংগত হবে না। 'সবুজ পত্র' যুগের বই 'সবুজ কথা'য় এই সাদৃশ্যের ঘোষণাই দেখা যাচ্ছে।

'সবুজ পত্রে' বাংলা সাহিত্যিক-গদ্যের নতুন যে রীতিটির সম্পর্কে আন্দোলন চলেছিল,—এবং যে-আন্দোলনের সঙ্গে বীরবলের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত, মোহিতলাল মজুমদার তাঁর একটি প্রবন্ধে সেই নব্য রীতির নাম দিয়েছেন, 'ভাষাঘটিত-বাস্তববাদ'। 'সবুজ পত্রে' এই ভাষা প্রবর্তনের আন্দোলনের পূর্বে, চলিত ভাষা যে বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে একেবারেই প্রবেশ করে নি, তা নয়। ১২৮৬-৮৭ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ-কাল: অক্টোবর ১৮৮১) এই রীতিতে লেখা হয়। তা' ছাড়া, মোহিতলালের কথায়:

'ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহাব মৌখিক আলাপ আলোচনা ও ধর্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা, এবং তাহারই লিপিবদ্ধ রূপ বাংলা গদ্যের জাত্যন্তর ঘটাইতে ও শিষ্টবিদ্যা গরীয়সী করিয়া তুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াছিল।' §

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান পার্থক্য হোলো ক্রিয়াপদের চেহারা নিয়ে—তারপর দুই রীতিতে সর্বনামের রূপভেদও প্রশস্ত;—আর, তৃতীয় প্রভেদ হোলো ভঙ্গিমার। রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে দেখা যাক:

'উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল এইটে থেকেই সর্পবংশ ধ্বংসের উৎপত্তি' এর ক্রিয়া ক'টাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধুভাষার ভঙ্গি দিলেই কালী সিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পিঠে মোহিতলাল মজুমদারের নিচের উক্তিটি প্রতিবাদের মতন শোনাবে:

'বাংলা ভাষার যে ধ্বনি-প্রকৃতির উপর বাংলা-গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বাক্যের কোনও অঙ্গে তাহার ব্যভিচার ঘটিলে সারাদেহ অসুস্থ হয়।

* বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮) পৃঃ ৪৬

§ আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার

সাধু বা সাহিত্যিক বাংলায় সংস্কৃত শব্দ ও বাক্‌পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা-বুলি যে ভাবে অন্বিত হইয়াছে তাহার ধ্বনিরূপ প্রাকৃত নয়—সংস্কৃত। বাংলা পয়ার যেমন প্রাকৃত-অপভ্রংশের ধ্বনি-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা সংস্কৃত নয়, বাংলা বুলির ধ্বনিও নয়, বরং দূরসম্পর্কে সংস্কৃতের আত্মীয়, তেমনই বাংলা গদ্যের বাক্যচ্ছন্দ কথ্যভাষার ধ্বনি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা যে ভাষায় লিখিয়া থাকি—নব্য লেখকেরাও যে ভাষা লিখিয়া থাকেন, তাহার বুলিও প্রধানতঃ সংস্কৃত বা সাধু, তাহার ধ্বনি-প্রকৃতিকে জোর করিয়া কথ্যভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায় না।'

বীরবলের নিজের রচনায় সাধু বাংলাকে কি-ভাবে 'কথ্যভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া' সম্ভব হয়েছে, তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক :

'কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমন কি, কৌপীন পর্যন্ত পেলা দিয়েছিলেন।' —সাহিত্যে খেলা : বীরবলের হালখাতা

'জ্ঞানাঞ্জন শলাকার অপপ্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কানা হয়েছে, তাঁরাই কেবল সত্য মানতে নারাজ হবেন।' —বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ : ঐ

'শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত বাপের তাড়নায় বারো বৎসর বয়সে সর্বশাস্ত্রের পারগামী হওয়ার দরুণ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হৃদয়মন যে কতদূর ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। ফলে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে কাঁচতে গিয়ে বিবাহ করেন।' —শিশু-সাহিত্য : ঐ

ওপরের তিনটি উদ্ধৃতির মধ্যে প্রথমটিতে 'পেলা দিয়েছিলেন' অংশটুকু,—দ্বিতীয়টিতে একদিকে 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকার অপপ্রয়োগ' এবং অন্যদিকে 'কানা হয়েছে'—এই অংশের প্রয়োগ,—আর, তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে 'ইঁচড়ে পেকে' ও 'বৃদ্ধবয়সে কাঁচতে গিয়ে'—অংশগুলি অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে স্পষ্ট বিভেদ ঘোষণা করেছে—অর্থাৎ, বেশ বোঝা যায় যে, সনাতন বঙ্কিমী গদ্যের সঙ্গে এই গদ্যের পার্থক্য শুধু যে ক্রিয়াপদ-ঘটিত, তাই নয়,—দুয়ের মধ্যে অন্যতর সুনির্দেশ্য এক ভেদ আছে। আমরা 'বুড়োবয়সে কাঁচতে যাবার' অপচেষ্টায় হেসে থাকি, কিন্তু 'বৃদ্ধবয়সে কাঁচতে গিয়ে' লিখলে বঙ্কিমী গদ্যের লালনে পুষ্ট মন আর কান একই সঙ্গে অসন্তুষ্ট হয়। 'সোমপ্রকাশ'-এর মাতব্বর-রা 'শবপোড়া—মড়াদাহের' কটাক্ষপূর্ণ উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির নিন্দা করেছিলেন এরই সদৃশ তাড়নায়। তার হেতু ছিল প্রাক্-বঙ্কিমী গদ্যের

সঙ্গে বঙ্কিমী গদ্যের বিরোধে। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই সমসাময়িক লাঞ্ছনায়—রক্ষণশীল মনোভাবের তাড়নায় নীরব হয়ে যায়নি। সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্বে, বিদ্রোহীর শাসনে সনাতনপন্থীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন, এও যেমন সত্য,—নতুন বিদ্রোহী লেখকদল যদি যথার্থ শক্তিমান হন, তাহলে তাঁরাও যে যৌবনসুলভ সাহসে-শক্তিতে-হঠকারিতায়-আত্মপ্রত্যয়ে বৃদ্ধের রক্ষাকবচ অঙ্গে ধারণ করতে পরাঙ্মুখ হবেন,—এও তেমনি সত্য। এ-কালেও তাই হয়েছে। বীরবলের অঙ্গীকারে শক্তি সঞ্চার করলেন চিরযুবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! তিনি বললেন:

'আমার এই প্রায় আশি বছর বয়সে নিজেরই ভিতর থেকে দেখতে পাই সত্তর বছর পূর্বের বাঙালীর মন আর এখনকার মনে তফাত বিস্তর। দেখতে পাচ্ছি এই তার মনের বদল ভাষার মধ্যে মধ্যেও ভিতরে ভিতরে কাজ করছে। নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র।'

'বাংলাভাষা পরিচয়' নামক বইখানির অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন:

'সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।

'এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশি বিদেশি হালকা ভারি সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধুভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে।'

চলতি বা চলিত ভাষার আতিথেয়তা যে কতো উদার, তার নমুনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলায় প্রচলিত 'বিদায়', 'হয়রান' এবং 'দরদ' এই তিনটি কথার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, আমাদের মাতৃভাষার এই নব্য রীতিতে এই শব্দগুলি অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সে-যুগে ভারতচন্দ্রও ভিন্ন এক প্রসঙ্গে অনুরূপ কৈফিয়ত দেখিয়ে তাঁর তৎকালীন অভিনব ভাষা ব্যবহার করেছিলেন:

মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে ॥*

'মানসিংহ-পাতশায় কথোপকথন' বর্ণনার জন্যে 'যাবনী মিশাল' ভাষাকে ভারতচন্দ্র 'রসাল' করে তুলেছিলেন! আর, এ-কালে যাঁরা বাংলার সাহিত্যিক গদ্যে নতুন মৌখিক রীতির প্রবর্তন করলেন, তাঁদেরই অন্যতম পুরোধা বীরবলের কৈফিয়ত এই :

'আমি বাংলাভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি, তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।'

বীরবল এই কারণেই শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি প্রস্তাব স্মরণ করে লিখেছিলেন :

'পণ্ডিত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই হয়।'

এই অভিপ্রায় প্রকাশ করে বীরবল নিজেই তাঁর উক্তির অন্তর্নিহিত প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন। বাংলা ভাষা বলতে তিনি কোন্ উপাদানের ওপর জোর দিতে চান? তাঁর নিজের উত্তরটিই দেখা যাক :

'এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যা' আমরা সকলে জানি, শুনি, বুঝি ; যে ভাষায় আমরা ভাবনা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি এবং আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা? বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালীর মুখে।'

'বীরবল' বাংলার সাহিত্যিক গদ্যে এই নব্যরীতি প্রবর্তনের দায়িত্ব পালন করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে নিজেও 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৫) থেকে তাঁর গদ্য-রচনায় এই রীতি গ্রহণ করলেন। সনাতন-পন্থী মোহিতলাল মজুমদারের খরশান লেখনী একদা এই ব্যাপারে ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন :

'টলষ্টয় শেষ বয়সে আর্টের নূতন আদর্শ স্থাপনার্থে যাহা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধবয়সে ভাষার নবাবিষ্কৃত ভঙ্গির খাতিরে সাহিত্যের সেইরূপ প্রাণদণ্ড করিতে চান।'

* অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায়

'ক্ষণিকা'-র (১৯০০) কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এর আগেই যে মৌখিক বাক্-ভঙ্গির মর্যাদা দিয়েছিলেন, সে-কথা স্মরণ করে মোহিতলাল বলেছিলেন,—

'উপলক্ষ্য বা বিষয়-বিশেষে, এই মৌখিক বাক্-ভঙ্গিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হইতে পারে, তা ছাড়া আটপৌরে পোষাকের মত ভাষারও যদি আর একটা ছাঁদ থাকে, মন্দ কি? কিন্তু গদ্যের এই রীতিও এমন প্রশস্ত নহে যে তাহাকেই সাহিত্যের রীতি করিতে হইবে—যে রীতি সাহিত্যের রীতি হইয়া আছে, তাহার তুল্য ক্ষমতা ইহার নাই, রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রমাণ হয় নাই যে এই রীতিই শ্রেষ্ঠ, ইহার জন্য পুরাতন রীতি পরিত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন আছে।'

মোহিতলাল শুধু এই মন্তব্য দিয়েই তাঁর আলোচনা শেষ করেন নি। তিনি এই ব্যাপারে 'শিল্পী রবীন্দ্রনাথের খেয়াল-খুসীর স্বাধীনতা' লক্ষ্য করেছেন, এবং প্রশ্ন করেছেন—

'খাঁটি সাহিত্যের প্রয়োজনে চল্‌তি ভাষার সহজ প্রাণশক্তির আবশ্যক হইল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আগে হয় নাই কেন?'

মোহিতলালের এই প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৩৪১-এ। তার অনেক আগে 'পদ-চারণে'র কবি প্রমথ চৌধুরী সনাতনীদের এই রোষবিহ্বল প্রশ্নের সম্ভাবনা অনুমান করেই জবাব লিখে গেছেন দশ মাত্রার আটটি চরণে,

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শত গুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম। (১লা নভেম্বর, ১৯১৪)

—এবং অনুরাগী পাঠক জানেন, যে, এই কবিতা লেখবার পরে বীরবল তাঁর লেখায় 'অলম্' দেন নি—বরং কালে কালে তাঁর কলম আরো শানিয়ে উঠেছিল। শেষ বয়সে 'আত্মকথা'য় তিনি লিখেছিলেন :

'সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজ্‌মকে আমি কোন কালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি।'

তাঁর প্রথম বাংলা রচনার ইতিহাস তিনি নিজেই লিখে গেছেন :

'ইতিপূর্বে আমি বাংলা কখনো লিখিনি। আমি যখন এম. এ. পড়ি, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক একটি যুবকের অনুরোধে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভায় যোগ দিই এবং সেই সভাতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি।...সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষগুণই তাতে বর্তমান।'

এই প্রবন্ধটিতে লেখক বলেছিলেন,—জয়দেব উঁচুদরের কবি ন'ন। এ মত শুনে চিত্তরঞ্জন দাশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বলেছিলেন, 'এতকাল পরে বাংলায় একটি নূতন লেখকের আবির্ভাব হল।' 'ভারতী'-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এই প্রবন্ধের অনেকটা ছাঁটাই করে তাঁর পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে মূল রচনার পাণ্ডুলিপিটি ছিল। পরে 'সবুজপত্রে' সেই পাণ্ডুলিপি পুনর্মুদ্রিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর এই প্রথম আবির্ভাবের সময় তাঁর মতামতের সারবত্তা একদল যেমন মেনেছিলেন, অন্য দল তা' মানেন নি,—তাঁর বুদ্ধিমুখ্য, লঘু-চালের কথ্য গদ্যরীতি সম্পর্কেও অদ্যাপি তেমনি দুটি দলের বিপরীত মন্তব্য শ্রুতিগোচর হয়। তবে, ইদানীং বিরুদ্ধ দলের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে—একালে তাঁর ভক্ত-সংখ্যাই গরিষ্ঠ।

কিছুকাল আগে কালিদাস রায় মহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাভঙ্গির সঙ্গে বীরবলের রচনাভঙ্গির কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

'বীরবলের রচনাভঙ্গির ক্রম আলঙ্কারিক এবং বীরবলের রচনায় অর্থালঙ্কারের সংযত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ আছে—সেজন্য বৈচিত্র্য যথেষ্ট। কেদারবাবুর ভঙ্গিটি কৌতুকমধুর ও শব্দালঙ্কার-ভূয়িষ্ঠ। কিন্তু ক্রমটি আলঙ্কারিক নয়—জীবনের অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রাধান্য দেন এবং ঐ অভিজ্ঞতাই তাঁহার রচনার ক্রম-নির্দেশ করিয়াছে।' —সাহিত্যপ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড—পৃঃ ১১—১২)

কেদারনাথের সঙ্গে প্রমথনাথের রীতিগত বৈসাদৃশ্যই বেশি, সাদৃশ্য অল্প। তেমনি উনিশ শতকের মধ্যপর্বের লেখক প্যারিচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মৌখিক গদ্যরীতির সঙ্গেও বীরবলের মৌখিকতার সাদৃশ্য নেই। 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'—দুই গ্রন্থই আঞ্চলিক ভাষায় লেখা; বীরবলও কৃষ্ণনগরের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণনগরের খাঁটি আঞ্চলিক

ভাষাতে সাহিত্যোপযোগী পরিবর্তন ঘটিয়ে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা তিনি অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর আগে কলকাতার আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে নিত্যব্যবহার্য মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যিক কৌলীন্য দিয়েছিলেন য়ুরোপ-প্রবাসী, বিংশতিবর্ষোপদেশিক রবীন্দ্রনাথ—তাঁর বহুবিশ্রুত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' (১৮৮২)।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ও কবিধর্ম

১৩২১-এর আষাঢ় মাসে, প্রমথ চৌধুরীর চারটি সনেট একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। সেই 'সনেট-চতুষ্টয়ের' প্রথমটির নাম 'কবিতা', দ্বিতীয়টির 'কাব্যকলা', তৃতীয়টি 'আমার সনেট' এবং চতুর্থটির নাম 'আমার সমালোচক'। প্রথমটিতে তিনি লিখেছিলেন :

কবিতা না করে যদি স্বয়ং বরণ
টানাটানি তারে করা চরিত্র পশুর।

দ্বিতীয়টির শেষ চতুষ্কে দেখা যায় :

পোড়া কিংবা তোড়া নয় যাহার হৃদয়
বুক আর মুখ যার আছে মেরামত,
কবিতা তাহারে নয় সহজে সদয়,—
শব্দ ধরে জব্দ করা তারি কেরামৎ!

তৃতীয় সনেটের ষষ্ঠকে তিনি বলেছিলেন :

ভাষার সুসার আছে, নাই ভাব প্রাণ,
গোলাপের ছোপ আছে, নাই তার ঘ্রাণ।
আমি নাকি ভাবদেহ করি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গে জুড়ে
প্রতিমা দর্শনে শুধু, বিনা আশ্লেষণ
পোরে না এদের সাধ, গাত্র যায় পুড়ে!

এবং চতুর্থ সনেটে চতুর্দশপদী কবিতার আধার-প্রকৃতি এবং ভাববাহকত্ব সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য আছে এই কয়েকটি চরণে :

সনেটের গোনা গাঁথা ছত্র চতুর্দশ,—
এ পাত্রে যায় না ঢালা এক গঙ্গা রস॥
জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা,
না বধি রাবণ পদ্যে, কিম্বা রাজা কংস!
সাধনার ধন মোর ভাবের অণিমা,
অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।

এই চারটি চতুর্দশপদীর আগে, ১৩২০-র আষাঢ়ে লেখা হয় আরো সাতটি সনেট। ভূমিকায় লেখক লিখেছিলেন যে, মূল ইংরেজি থেকে তিনি এগুলি বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকের জন্যে পরিবেষণ করেছেন মাত্র। এবং তাছাড়া—দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে—'পাতায় পাতায় এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে বাঙালী কবি যেরূপ জানে, পৃথিবীর অন্য কোন কবি তাহার সিকির সিকিও জানে না'। প্রমথ চৌধুরী নিজে সে অভিযোগ খণ্ডন করবার জন্যেই তথাকথিত 'বিগলিত ভাব' পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সনেটের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, তাঁর উদ্ধৃত এই উক্তিতে প্রমথ চৌধুরীরই নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গি এসে যোগ দিয়েছে। জীবনের সর্ব বিষয়ে, কতকটা অভিভাবকের ভঙ্গিতে, কতকটা বা তির্যক রীতিতে মন্তব্য প্রকাশের অভ্যাস ছিল তাঁর। সেই ভাবেই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের লেখকের ভাবাবেগ-প্রবণতার উল্লেখ করে, এই 'সনেট-সপ্তকের' লেখক এই সাতটি সনেটের ভাবৈশ্বর্য সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত হতে বলে গেছেন। প্রত্যেকটি কবিতায় ফুটেছে তাঁরই স্বতন্ত্র মননভঙ্গি।

তাঁর কবিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে,—অথবা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর কী আদর্শ ছিল,—কী-ই বা বিশ্বাস ছিল, সে-কথা ভাবতে গেলেই মনে পড়ে যে, ১৩২১-এর বৈশাখ মাসে 'সবুজপত্রের' মুখপত্রে 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' নামে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতেই তাঁর সাহিত্য-চিন্তার মূল কথাগুলি বলা হয়েছিল। নিচে সে-চিন্তার সার কথাগুলি সংক্ষেপে এবং কতকটা সূত্রাকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল :

(১) 'স্বদেশের কিংবা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্মও নয়; সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সংকীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্ফূর্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়।'

(২) 'দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়তে পারি নে, গড়তে পারি শুধু সাহিত্য-সম্মিলন।...সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।'

(৩) 'একথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্‌ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টিলাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়।'

(৪) 'কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজেনা, কিন্তু কোনো কোনো কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। ...সাহিত্য মানব-জীবনের

প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।'

(৫) 'সাহিত্য গড়বার জন্য (লেখকের) নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই।'

(৬) 'ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্ আর হলাহলই হোক্ তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়।...ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক্ গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে—সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি।'

(৭) 'ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব জ্ঞানলাভ করেছি, সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যেখান থেকেই আন না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে।... ইংরেজি শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হয়েছি।'

(৮) 'ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাকলেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল— উভয়ই প্রাণবন্ত।'

'সবুজপত্রে'র আদর্শ—এবং তাঁর নিজের সাহিত্য-বিশ্বাসের কথা এইভাবে ব্যক্ত করে, লেখক আর-একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলেন। এই নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্য কেন যে 'পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছে', সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন :

(৯) 'অ-ব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোন কাজই যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, একথা সর্বলোকস্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে, কাজও নয়, খেলাও নয়, শুধু অকাজ।...একথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে লেখেন, সরস্বতী চাই কি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ নাও করতে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গসাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে, পল্লবিত হয়ে উঠেছে।...'

এই 'পল্লবিত সাহিত্য'-কে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্য' আখ্যা দিতে রাজি ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁর দ্বিধাহীন মন্তব্য ফুটেছে সংক্ষিপ্ত এই উক্তিটিতে—'যে লেখায় লেখকের মন নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।'

এই মূল্যবান প্রবন্ধটির শেষ দিকে তাঁর আর একটি উক্তি ছিলো—যা এখানে স্মরণ করা আবশ্যক :

(১০) পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই

'মেঘনাদবধ কাব্য' পরগাছার ফুল। 'অর্কিড্'-এর মত তার আকারের অপূর্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশী বলে 'অন্নদামঙ্গল' স্বল্পপ্রাণ হলেও তা কখনোই 'মহাকাব্য' নয়।...দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধে নয়,—এদের মিলনের ওপরেই আমাদের সাহিত্যের এবং সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি, বাংলার পতিত জমি সেই মিলন-ক্ষেত্র হবে।

এই প্রাণের স্বীকৃতিই ছিলো 'সবুজ পত্রের' প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৩১৯-এর মাঘ মাসের লেখা 'তর্জমায়' প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—'সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে।... ...পরের জিনিসকে আপনার করে নেবার নামই তর্জমা।...আমরা মনে মনে যা তর্জমা করে নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি। যা পারিনে. তার শুধু নাম মাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।' ঐ লেখাটিতেই তাঁর গৃহীত ভাষা-রীতি সম্বন্ধে মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে—'মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা।' ১৩২০-তে লেখা 'বইয়ের ব্যবসা' প্রবন্ধে তিনি আবার বলেছিলেন, 'বই লেখা জিনিসটে একটা সখ মাত্র হওয়া উচিত নয়।'

এই ধরনের মন্তব্য তাঁর বহু প্রবন্ধে বার বার বলা হয়েছে। ১৩২০ সালের আর-একটি প্রবন্ধের নাম 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ'। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন: 'ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়।·· প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি।... আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারি না, তার একমাত্র কারণ আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।'

তাঁর নিজের কবিতা বোঝবার পক্ষে এই কথাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই লেখাটিতেই তিনি বলেছিলেন,—'প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটিই হচ্ছে আর্টের ধর্ম।...আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়—সৃষ্টি।...শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্যসামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য,—জ্যামিতি কিংবা গণিত শাস্ত্রের শাসন নয়।...সত্যভ্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না।...কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা।'

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রসঙ্গ আছে তাঁর 'কথার কথা' প্রবন্ধে। বৈয়াকরণদের—এবং সাহিত্যে যাঁরা শাশ্বত মূল্যের অভিপ্রায়ী, তাঁদেরও লক্ষ্য করে এই লেখাটিতে তিনি জানিয়েছিলেন, 'বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালীর মুখে।...ভাষায় এখন শানিয়ে ধার বার করা দরকার, ভার বাড়ানো

নয়।' এবং 'অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর থাকলে—আমরা যা perfect তা ব্যতীত কিছু বলতে কিংবা করতে রাজি হতুম না।'

সে-সময়ে বর্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তদানীন্তন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে 'চুট্‌কি' লক্ষণের অভিযোগ তুলেছিলেন। ১৩২২-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সবুজপত্রে' 'চুট্‌কি' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর জবাব ছাপা হয়। সে জবাব যেমন কঠোর, তেমনি শ্লেষময়! ১৩২২ সালের কার্তিকের 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত শান্ত, সংযতভাবে—পূর্বোক্ত 'চুট্‌কি'-অপবাদের আলোচনা করে তিনি বলেছিলেন—'এ-যুগের রচনার নাতিদীর্ঘতা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, এ-কালের লেখকেরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন।...যাঁদের শ্রোতার আক্কেলের উপর কোনো আস্থা নেই, তাঁরাই একটুখানি কথাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অনেকখানি করে তুলতে ব্যস্ত।' 'চুট্‌কি' কথাটার মধ্যে অন্তঃসারহীনতা, হ্রস্বতা ও লঘুত্বের ইঙ্গিত আছে। ১৩২২-এর বৈশাখের 'প্রবাসী'তে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন :

এই চট্ করে যাহা বলে ফেলা যায়
চুট্‌কি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোট লোকে
জানিবে সুনিশ্চয়।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রীমহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদেই নবকুমার কবিরত্ন (সত্যেন্দ্রনাথের ছদ্মনাম) এই লেখাটি লিখেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী গদ্যে যে প্রতিবাদ লিখেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ পদ্যে তারই সূত্রপাত করেন। দু'জনের লেখা পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। সত্যেন্দ্রনাথের—

দেখ হাফেজ কেবল চুট্‌কি লিখিল
ফেজ খোয়াইল তাই,
আর রবি শেলি রুমি বার্নস হাইন
পড়ে সে কজন ভাই?
হোথা শ্লোক তিন টন লিখি মিলটন
অমর হইল ভবে,
লোকে পড়ে কি না পড়ে জানেন বিধাতা
হরি হরি বল সবে।

—ইত্যাদি কথাতে যে-রকম বিদ্রূপ ফুটেছে, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনায় যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এতে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আন্তরিক হৃদ্যতাই প্রমাণিত হয়।

সাহিত্যের স্বরূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে এইসব কথা তাঁর অনেক প্রবন্ধে নিবন্ধে বার বার বলা হয়েছে। এই মূল কথাগুলি বিচার করে দেখলে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর এই রকম ধারণা ছিল বলে মনে হয় :

(ক) তিনি ছিলেন প্রেরণায় বিশ্বাসী ;

(খ) তাঁর নিজের কবিতায় বিশ্লেষণের আধিক্য ঘটবার ফলে তা যে জনপ্রিয় হয়নি, সে-বিষয়ে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন ;

(গ) তাঁর মতে, 'সনেট' হচ্ছে আকারে হ্রস্বায়তন রচনা, এবং সে-জিনিস ভাষার পাত্রে ধৃত মনের ভগ্নাংশ মাত্র ;

(ঘ) তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্যগুণ যাতে থাকে বা যেখানে তা থাকবে বলে আশা করা যায়, সে রকম কোনো রচনা আমাদের কোনো ব্যবহারিক বা স্থূল অভাব পূরণের উদ্দেশে রচিত হওয়া উচিত হয় ;

(ঙ) সাহিত্য ব্যক্তির একক সাধনা ;

(চ) কিন্তু মানবজীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ অনস্বীকার্য ; সাহিত্য মানুষের মনকে সজাগ রাখে ;

(ছ) ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে বাংলায় তথা ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের প্রতি, নিজেদের অতীতের প্রতি আমাদের অনুসন্ধান বেড়েছে ;

(জ) সত্যিকার ভালো সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে সাহিত্যিককে প্রতিভাসম্পন্ন হতে হবে, প্রেরণার অধিকারী হতে হবে,—এবং তাঁর রীতিমত লেখাপড়ার চর্চা থাকা চাই। শুধু নানা তথ্য আর নানা বিদ্যার সংগ্রহ নয়,—সাহিত্যিকের নিজের মনের বিশিষ্ট মনন দরকার।

(ঝ) প্রকাশের মধ্যে সংহতি ও সরলতার সমন্বয় চাই। ভাষার ব্যবহারে চাই প্রাণধর্ম স্বীকারের সৎসাহস।

(ঞ) সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগে অনেক অবাঞ্ছিত পল্লব দেখা দিয়ে থাকে,—সেই পল্লবকে সাহিত্য বলে ভুল করা ঠিক নয়।

এই দশ দফার সংক্ষিপ্ততর সূত্র করলে প্রমথ চৌধুরীর কবিধর্ম সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন প্রেরণায় বিশ্বাসী, জীবনসত্যের প্রতি অনুরাগী, বিদ্যানুশীলনে অধ্যবসায়ী, সংহতি ও সরলতার ভক্ত, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে স্বাদেশিকতারও সাধক এবং সংস্কারমুক্ত শিল্পী! তাঁর কবিতা যে আগেকার দিনের বাংলা কবিতার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয় এবং পাঠকদের মধ্যে যাঁরা আগেকার কাব্যপ্রথাতেই অভ্যস্ত, তাঁরা যে তাঁর নিজের লেখা কবিতা থেকে ঠিক পূর্বাভ্যস্ত আনন্দ পাচ্ছেন না, এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

পুরোনো রীতির অন্ধ অনুকরণে তাঁর আদৌ সায় ছিল না। বীরবলের হালখাতায় 'সবুজপত্র' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাক্ষী। তাতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের লোহিত বিরোধালঙ্কার স্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্কপত্রের।'

এই 'শুষ্কপত্র' প্রসঙ্গ থেকেই তাঁর আর-একটি উক্তি মনে পড়া স্বাভাবিক। যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের স্পর্শ তিনি বহু সমাদরে বরণ করেছিলেন, সেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্পর্কেই ১৩২২-এর কার্তিকে তিনি লিখেছিলেন: 'আজকের দিনে ইংরাজী সাহিত্য আমাদের কাছে এতটা পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে যে, তার থেকে আমরা আর বিশেষ কোনো নূতন উদ্দীপনা কিংবা উত্তেজনা লাভ করি নে। আমাদের মনে ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ের চমক ভেঙেছে, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের প্রভাব স্থান পায় নি। সুতরাং আমরা গত যুগের সাহিত্যেরই জের টেনে আসছি।'

তাঁর সমকালীন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে,—বিশেষতঃ কবিতা বিষয়ে তাঁর মন্তব্য আছে ঐ একই প্রবন্ধে—'বর্তমান কাব্যসাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিবিস্তৃত এবং অপ্রতিহত, তা অস্বীকার করবার যোও নেই, প্রয়োজনও নেই।'

পত্র ও পত্রসাহিত্য

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।

—আকাশ প্রদীপ

ভারত-সরকারের মহাফেজখানায় যে ১৭৫ খানি প্রাচীন বাংলা চিঠি সংরক্ষিত ছিল, স্বনামধন্য ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র-সঙ্কলনে' সেগুলির প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেষণ করেছেন। প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে আমাদের দেশে বৈষয়িক চিঠিপত্রের চেহারা কি রকম ছিল, এই বইখানি তাঁরই নির্দেশক। এই সব চিঠিতে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীশ্রীশিবঃ', 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ইত্যাদি দেবদেবীর নামোল্লেখের নিচে '৺মহামহিম মহিমা শ্রীযুত বড় সাহেবজিউ' কিংবা '৺ইয়াদদাস্ত ও দরখাস্ত শ্রীরুদ্ররাম বড়ুয়া' কিংবা 'মহামহিম শ্রীযুক্ত ড্রোক্তর সাহেব বরাবরেষু' কিংবা

অন্যতর বিশেষণ-সমৃদ্ধ দীর্ঘতর শব্দমালায় পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই সব চিঠির ভাষায় বিশুদ্ধ তৎসম শব্দের সঙ্গে গা-ঘেঁষে বসেছে বিচিত্র আরবী-ফারসী শব্দ। স্বাক্ষরের জায়গায় কোথাও বা ব্যবহার করা হয়েছে ফার্শি সাল। তারিখের উল্লেখে শকাব্দ, সন, খ্রীষ্টাব্দ, সকাবত, মোতাবেক ইত্যাদির যথেচ্ছ প্রয়োগ এই চিঠিগুলির বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বাংলা চিঠিগুলি যখন লেখা হয়, বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থ তখনো অপ্রকাশিত ;—এদেশে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুদ্রিত বাংলা গদ্যের এবং মুদ্রিত গ্রন্থের ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ হোলো। তখন, বাংলা চিঠির চেহারাতেও ধীরে ধীরে বদল শুরু হয়।

বাংলায় ছাপা গদ্যের যুগে, চিঠির গদ্যও দ্রুত তালে আধুনিক হয়ে ওঠে। একটি মাত্র শতকের মধ্যে বাংলা পত্রধারা তার বদ্ধর উৎসক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে, একেবারে বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-সঙ্গমে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। অষ্টাদশ শতকের পূর্বোক্ত চিঠিগুলির সঙ্গে উনিশ শতকের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কি সহজ কাজ—সে কি সহজসাধ্য অনুষ্ঠান ?

ইতিহাসে অনুরক্ত পাঠক আরো অতীতে দৃষ্টি ফেরাতেও বিমুখ হবেন না। প্রায় চারশো বছর আগেকার একখানি চিঠির নকল পাওয়া গেছে বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত-আলোচকদের প্রসাদে। এই চিঠিখানি লিখেছিলেন কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ, —এবং এ-পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিও সামান্য লোক ছিলেন না! আহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে সম্বোধনের উদ্দেশ্যে এই চিঠিতেই যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল, তার একটু নমুনা দেওয়া হোলো :

'স্বস্তি সকল-দিগ্‌দন্তি-কর্ণতালাস্ফাল সমীরণ-প্রচলিত হিমকর-হার-হাস-কাশ-কৈলাস প্রাস্তর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ-ত্রিদশ তরঙ্গিনী-শলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ প্রচণ্ড ধীর-ধৈর্য্য-মর্য্যাদা-পারাবারসকল দিক্‌-কামিনী-গীয়মান-গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রতাপেষু।'···

বিশেষণ-বিলাসীরা এর পর হয়তো বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র কথা ভাববেন! কাদম্বরী-কাব্যের বিশেষণ-প্রাচুর্যের মূলে যে মনোভাবটি কাজ করেছে, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক তাকে বলতে পারেন বিলসনেচ্ছা বা exhibitionism,—এবং সে-ইচ্ছার পোষক ছিলেন একজন কবি। পক্ষান্তরে, আহোমরাজ স্বর্গদেবের উদ্দেশ্যে এই যে বিশেষণের ঘটা, এর মূলে কোনো কবি ছিলেন না,—এ শুধু এক রাজার প্রতি অন্য এক রাজার রাজকীয় সম্ভাষণ মাত্র! এ বাচালতা আর যাই হোক, সাহিত্যিক

কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত নয়। কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এ চিঠিও বৈষয়িক চিঠি,—অষ্টাদশ শতকের বৈষয়িক বাংলা চিঠির সঙ্গে এর রীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। শব্দতত্ত্বানুরাগীরা ভিন্নকালবর্তী এই পত্রমালায় শব্দ-প্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখে খুসি হতে পাবেন। কিন্তু এ-সব চিঠি যে সর্বপ্রকার সাহিত্য-সম্পর্ক-বিমুক্ত রচনা, এ অভিমত সর্ববাদিসম্মত।

বৈষয়িকতা-সম্পর্কহীন বাংলা চিঠির উৎস-কাল গেছে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ এই মন্দাকিনীর ভগীরথ। তবে, তাঁদের শ্রমে, প্রজ্ঞায়, বিদ্যাবত্তায় বাংলা ভাষায় লেখা চিঠি বৈষয়িকতার দৃঢ় শাসন স্থানে-স্থানে লঙ্ঘন করেছিল মাত্র। তাঁদের উপচীয়মান ব্যাপ্তিবোধ—চিঠির মাঝে মাঝে, ইতস্তত: অল্প-বিস্তর আত্মপ্রকাশ করেছে। তথাচ, চিঠিকে তাঁরা প্রকৃত সাহিত্যের কৌলীন্য দেন নি।

মধুসূদনের ইংরেজী চিঠিগুলি যদি বাংলা ভাষায় লেখা হোতো, তাহলে বরং মধুসূদনকেই বাংলা পত্র-সাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া যেতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উনিশ শতকের মধ্য-পর্বের অন্যান্য মনীষীরাও মূলত: চিঠির আটপৌরে স্বভাবের দৈন্যবোধ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সাহিত্য-চর্চার সময়ে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত গদ্যময় অন্যান্য বাহনগুলিকেই মেনে নিয়েছিলেন। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পত্রধর্মী পোষাকী রচনা, তার বিষয়বস্তু ভারতীয় কাব্য-পুরাণমূল,—প্রেরণা পাশ্চাত্ত্য। তাঁর এই রচনায় মধুসূদন Ovid-এর Heroic Epistles-এর আঙ্গিক ও আদর্শের কাছে কী পরিমাণে ঋণী ছিলেন, সে-বিষয়ে বিতর্ক ওঠা অবান্তর নয়।

সুপ্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো বাহন বা প্রকরণ আশ্রয় করে নয়,—'পত্রসাহিত্যের' স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করে নিয়ে, সুখপাঠ্য চিঠি লেখার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন নবীনচন্দ্র সেন। তবে নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) ঐতিহাসিক কারণেই স্মরণীয়,—সে পত্রমালার সাহিত্যিক মূল্য সামান্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২), প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকদের আনুকূল্যে বাংলায় 'পত্রসাহিত্য' উত্তরোত্তর কৌলীন্য অর্জন করেছে। তারপর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার গুণে বাংলাভাষায় সাহিত্যিক চিঠি—বিদেশের শেলী, কীট্‌স্, লরেন্স, ব্রিজেস, প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পত্ররচয়িতাদের চিঠির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-সমসাময়িকেরা সেই আদর্শ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় ইত্যাদি পত্র-লেখকের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ; প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,—এঁদের সাহিত্যিক চিঠির সংখ্যাও কম নয়;—এবং ব্যক্তিগত চিঠির অন্তরালে দাঁড়িয়ে—প্রবন্ধ

ও গল্পের মিশ্ররস পরিবেষণের চেষ্টা এ-কালে যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দেবেশচন্দ্র দাস এবং 'যাযাবর'-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার।

'পথে ও পথের প্রান্তে' নামে পত্র-সংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'ভরতি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিসি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত প্রকাশ পায় বৈঠকে, যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁরা স্বগত উক্তি লেখেন ডায়ারিতে, আমার মতো যাঁদের রচনার মৌতাত তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে।'

এই মন্তব্য থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চিঠি যখন সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে ওঠে, তখন তা' ব্যক্তিগত মননধর্মী প্রবন্ধের অথবা গীতিকবিতারই সামিল হয়। শেষোক্ত সাহিত্য-শাখাটি রূপগত বৈশিষ্ট্যে পৃথক,—যদিও, অন্তর-বিচারে তা প্রথমটিরই সদৃশ। প্রথমোক্ত শাখার অন্তর-বিচারে আবার দুই উপশাখার বিভাগ সুপ্রশস্ত ; এক হোলো, গম্ভীর ধরনের রচনা,—দ্বিতীয়তঃ, লঘু বিষয়ের আলাপ। সাহিত্য-পদবাচ্য চিঠিরও এই দুই মূর্তি চোখে পড়ে। Lucas কিংবা Robert Lynd কিংবা Keats-এর চিঠি গম্ভীর মননের দৃষ্টান্তবহ,—পক্ষান্তরে, Ellen Terry-র উদ্দেশে লেখা Bernard Shaw-র পত্রমালা লঘু আলাপের দর্পণ,—কদাচ গম্ভীর।

সাহিত্য-পদবাচ্য চিঠির বিশ্লেষণে ভাবাবেগেরও দুই প্রকৃতি ধরা পড়ে—কোনো চিঠিতে দেখা যায় কেন্দ্রনিষ্ঠ মনন অর্থাৎ intensive emotion,—আবার, কোথাও ফুটে ওঠে লেখকের ভাবকল্পনার নানাচারিত্ব—ইংরেজিতে যাকে বলে, discursive emotion।

রবীন্দ্রনাথের পত্রধারায় চিঠির এই বিচিত্র প্রকৃতির বিচিত্র প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি চিঠিতে তিনি পত্রতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা চালিয়েছেন। এমনি একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

'পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প, যে দু'চারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে।' [৪ শ্রাবণ ১৩৩৬]

অনুরূপ আর একখানি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন :

'আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরানো হোলো না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলেছে, এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর।' [১৮ই কার্তিক, ১৩৩৫]

সংস্কৃত কাব্যে চিঠি লেখার প্রসঙ্গ কোনো কোনো জায়গায় যে না উঠেছে, এমন নয়। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও বররুচির 'পত্রকৌমুদী'র কথা ধরা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে বা লক্ষ্যে মননকে বেঁধে না রেখে, মননের দাক্ষিণ্যে চিঠিকে যথার্থ সাহিত্য করে তোলা—আমাদের এ-অঞ্চলে বোধহয় বাংলা সাহিত্যেরই আধুনিক কীর্তি।

বাংলায় মেয়েদের লেখা চিঠি এখনও সর্বজনীন সাহিত্যের লক্ষণে সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্য-গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়নি বটে। তার কারণ, বোধ হয় এই যে, মেয়েদের পর্দা এদেশে বেশিদিন ঘোচেনি—কিংবা হয়তো নিজেদের পর্দাবিমুক্ত অবস্থার প্রথম্ ধাক্কা তাঁরা এখনো ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অদূর ভবিষ্যতে মুক্ত মননের বৈচিত্র্যে আর মেয়েলি মমতার সৌরভে তাঁদের অনেক চিঠিই হয়তো সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে উঠবে। চিঠিতে সাহিত্যগুণ সঞ্চারণের প্রক্রিয়ায় এই দুটি গুণই অত্যাবশ্যক,—মননও দরকার, মমতাও অনিবার্য; আর সে মমতা মানে ভোগমগ্নতা নয়,—দ্রষ্টার মমতা, ভোক্তার নয়! রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিতে গিয়ে অন্য এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

'ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়।' [৬ই কার্তিক; ১৩৩৬]

মমতা ও মননের শাসনই সাহিত্য-পদবাচ্য চিঠির গতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই চিঠির সাহিত্যিক মূল্য যেখানে স্বীকৃত হয়, সেখানে তার রূপকল্পের বাঁধাবাঁধি কোনো আদর্শনিষ্ঠার যাচাই চলে না। রবীন্দ্রনাথ ঐ যে বলেছিলেন—'ভরতি মনের বকুনি',—সেই কথাটি এই প্রসঙ্গে পুনর্বার স্মরণীয়। লেখকের ভাবের ক্ষিপ্রতা ও চলচ্ছক্তি অনুযায়ী চিঠির অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গাবলীর অবতারণা ও বিন্যাস ঘটে থাকে। বৈষয়িক চিঠি হোলো এই আইনের ব্যতিক্রম। সে-ধরনের চিঠি লেখবার আদর্শের জন্যে বিচক্ষণ লোকেরা পরিমিত-বিনয়বাহী ও প্রভূত-বার্তাবহ সুনিপুণ পত্রমালার দিকেই সন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করে থাকেন! পক্ষান্তরে, সাহিত্যপদবাচ্য 'চিঠি' সাহিত্যের অন্যান্য রূপের মতোই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল। কবি Cowper তাঁর একখানি চিঠিতে বলেছিলেন:

'In fact, critics did not originally beget authors; but authors made critics. Common sense dictated to writers the necessity of method, connection, and thoughts congruous to the nature of their subject; genius prompted them with embellishments; and then came the critics'.

[Letter to the Rev. S. Newton—April 26, 1784].

মন্তব্যটি মোটেই অভিনব নয়। তবু, সাহিত্যপদবাচ্য চিঠিকে যাঁরা বৈয়াকরণ-

আলংকারিকের নির্দেশ-মানা, কেতা-দুরস্ত মূর্তিতেই চরমান দেখতে চান, তাঁদের পক্ষে এ মন্তব্য আশু-আরোগ্য-সাধক বলে প্রতিপন্ন হবে!

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে লিখেছিলেন :

জেগে উঠে মহানন্দ,
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম—
পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাপা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইষ্টাম্পের দাম!

জনগণের সাহিত্য

স্রষ্টার মানস প্রকৃতি সম্বন্ধে এ-কথা গ্রাহ্য যে, তিনি সকলের সঙ্গে অন্বিত থেকেও স্বতন্ত্র থাকেন! এই স্বাতন্ত্র্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শিল্পীর আত্ম-প্রকাশের তাগিদে দেশ-কাল-জন্ম-জন্মান্তর-সমুত্থিত বিশেষ বিশেষ প্রবণতা যেন শব্দ, অলংকার, রীতির দিকেই এগিয়ে আসছে। এসব প্রবণতাজনিত আগ্রহ তাদের যোগ্য বাহনে সওয়ার হয়ে,—সার্থক সাহিত্যের প্রকাশ ঘটাবার পরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পী এই ভেবে দুঃখিত হতে পারেন যে 'পূর্ণ'-কে তিনি পান নি!

কিন্তু সৃষ্টিতে সর্বময় এ 'পূর্ণ' কখনোই সাহিত্যিকের প্রাপ্য নয়,—এ পদার্থ ধ্যানীর অধিগম্য হলেও এ কখনোই খণ্ড দেশ-কালের গণ্ডী-ঘেরা সাহিত্য-বাহনের বহনীয় নয়। সাহিত্যিক যে পূর্ণতা প্রকাশ করতে পারেন, সে হোলো অহমস্পূর্বিকতাময় বিশ্ববোধ। লেখকের এই 'অহং' যে-দেশের, যে-কালের, যে-সমাজের ফল,—তাঁর সাহিত্যে সেই দেশ-কাল-সমাজ অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হবেই। সাহিত্য কখনোই কল্যাণ-বর্জিত হয়ে বাড়তে পারে না। তাই বলে, যুক্তির কড়া চৌকিদারিতে নীতির পাকা সড়ক দিয়েই যে সাহিত্যিক সর্বদা সজ্ঞানে হেঁটে থাকেন, তাও নয়। স্রষ্টার মন ললিতে-কঠোরে, ন্যায়ে-অন্যায়ে, জ্ঞানে-নির্জ্ঞানে কেমন যেন রহস্যময়!

এখন প্রশ্ন এই যে,—বিশেষ সমাজের বিশেষ ব্যক্তির দুর্জ্ঞেয় মননজাত আনন্দ-লিপি—এই যদি হয় সাহিত্যের সংজ্ঞা, তাহলে দেশ-কালের বিশেষ গণ্ডীর অতিশায়ী বৃহৎ মানবসমাজের মনে মনে সাহিত্যের চাহিদা ঘটবার কারণ কি? এই প্রশ্নটি ভাবতে বসে সাহিত্যের প্রধান-প্রধান জাতিভেদের কথাই ভাবতে হয়। প্রথমতঃ, জনগণের সাহিত্য,—দ্বিতীয়তঃ, লোকসাহিত্য—তৃতীয়তঃ, সূক্ষ্ম রুচির সাহিত্য।

অবশ্য অরসিকের কাছে রস-নিবেদনের দুরদৃষ্ট যেন কোনকালে না ঘটে,—এ

প্রার্থনা কেউ কেউ করেছেন। বাক্য ব্যাখ্যাগম্য হবে কি না হবে, তা নিয়েও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। একালে সমাজতত্ত্বে অভিনিবেশের আতিশয্যে 'বুর্জোয়া' সাহিত্য, 'সামন্ত'-সাহিত্য, 'গণ'-সাহিত্য ইত্যাদি শ্রেণীচেতনাও ব্যক্ত হয়েছে। বাংলায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'জাতীয় সাহিত্য' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধটি বহুপঠিত। ভৌগোলিক ও ভাষাগত সীমা অনুসারে ভারতীয় সাহিত্য, মার্কিন সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য ইত্যাদি ভেদও সুবিদিত। ধর্মের পার্থক্য অনুসারে বৌদ্ধ সাহিত্য, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য, খ্রীষ্টীয় সাহিত্য ইত্যাদি জাতিভেদও বহুপ্রচলিত। এছাড়া আরো নানাবিধ শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হয়েছে। কিন্তু দেশ-কাল-ধর্ম-ভাষা ইত্যাদির ভেদ কাটিয়ে উঠে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে, যদি সাহিত্যের ন্যূনতম জাতিসংখ্যা নির্ণয় করতে হয়, তাহলে প্রধানতঃ এই তিনটি শ্রেণীই চোখে পড়ে। মোটামুটি, বিশেষ কোনো যুগের অল্পশিক্ষিত, সাধারণ পাঠকমাত্রেই যে সাহিত্য পড়ে আনন্দ পান, তাকে বলা হয়,—সেই যুগের 'জনগণের সাহিত্য'। 'জনগণের সাহিত্যে' জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা-সুখ-দুঃখের জনবোধ্য ও গণগ্রাহ্য অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। তাতে বিবেচনার চেয়ে বিবৃতিরই প্রাধান্য ঘটে থাকে,—এবং তাতে রসসত্যের তুলনায় শ্রেণীগত সামাজিক তথ্যের অতিরেক ঘটাই অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য, এ সাহিত্য রাষ্ট্র-বিত্ত-সমাজগত শ্রেণী-স্বার্থবোধের সন্তান! পক্ষান্তরে, 'লোক-সাহিত্য' সত্যিই অন্তধর্মী, অন্তপন্থী রচনা। 'জনগণের সাহিত্য' আর 'লোকসাহিত্য' পরস্পরের প্রতিশব্দ নয়। এই দুই নাম দুটি পৃথক সাহিত্য-শ্রেণীর নির্দেশক।

লোকসাহিত্য

'লোকসাহিত্য' নামে রবীন্দ্রনাথ একখানি বই লিখেছেন। সেই বইয়ের শেষ সংস্করণে 'ছেলে-ভুলানো ছড়া (১ ও ২), 'কবি-সংগীত' এবং 'গ্রাম্য সাহিত্য'—এই তিনটি রচনা সংকলিত হয়েছে। এই লেখাগুলির মধ্যে 'লোক সাহিত্য' সম্পর্কে কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু এতে 'লোকসাহিত্যের' লক্ষণগুলির নির্দেশ ইতস্ততঃ নিহিত আছে।

'কবি-সংগীত' যে কোনোমতেই লোকসাহিত্য নয়,—সে-কথা অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি স্মরণ করেই ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব সে-কথা থাক্। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

ক] 'এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।'

খ] 'এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।'

দ্বিতীয় প্রবন্ধে কবি-সংগীত সম্পর্কে লেখা হয়েছিল :

গ] 'মোটের উপর এই গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা এবং কাব্য-কলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয়—এবং সেরূপ হইবার প্রধান কারণ, এই গানগুলি ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিত মতো রচিত।'

তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

ঘ] 'হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ছড়াগুলির জাতি স্বতন্ত্র। সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়।'

'বাংলায় গ্রাম্য ছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতা-রাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায় কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প।'

'লোকসাহিত্যের' তিনটি প্রবন্ধের উদ্ধৃত চারটি মন্তব্য থেকে বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ-বিরাগ দুইই বোঝা যাচ্ছে। শেষ উক্তি দুটিতে 'লোক সাহিত্যের' লক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু প্রথম দুটিতে অবশ্যস্বীকার্য পৃথক পৃথক দুটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে,—একটি হোলো 'চিরত্ব', অন্যটি লোকসাহিত্যের 'স্বয়ম্ভূত্ব'।

তথাকথিত 'জনগণের সাহিত্যে' এই দুই লক্ষণই অবিদ্যমান। জনগণের বিত্তাবস্থার জোয়ার-ভাঁটা অনুসারে জনগণের চিত্তাবস্থা পরিবর্তিত হয়—এই হোলো 'প্রগতি পন্থী' জনসাহিত্য-যজ্ঞের মূলমন্ত্র। অতএব এ-অঞ্চলে যুগভেদে রুচিভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এ পদার্থ 'অচির' এবং এর হোতা বা ঋত্বিক মোটেই জনগণ নন—গণাবস্থাব্যাখ্যাতা লেখকদল—অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ! পক্ষান্তরে, পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন যে, রামায়ণ-মহাভারত ঠিক এ-ভাবে রচিত হয়নি। বাংলা রামায়ণে কৃত্তিবাস ছাড়া আরো অনেকে কলম চালিয়েছেন। মহাভারতেও তাই হয়েছে। ছড়ার রাজ্যেও সেই রকমই ঘটেছে। নানাজনের হৃদয়-মস্তিষ্কের নানা কীর্তি এসে মিলেছে নানা যুগতট-প্রবাহিণী সাহিত্যধারায়। এবং, এই ভাবে যা গড়ে উঠেছে, সে-সাহিত্য একদিকে যেমন চিরত্বধর্মী, অন্য দিকে তেমনি সত্যিই কতকটা 'অপৌরুষেয়'। শেষের কথাটিকে যদি বাড়াবাড়ি মনে হয়, তাহলে বরং তাকে বলা যাক—'শ্রেণীনিরপেক্ষ'। অর্থাৎ, লোকসাহিত্যের উপভোগে সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের এবং সকল রসরুচিরই সমস্বামিত্ব স্বীকার্য

সূক্ষ্মরুচির সাহিত্য

আর একরকম সাহিত্য আছে, যা পড়ে আনন্দ পেতে হলে পাঠকের বিদ্যাবত্তার দরকার হয় এবং তাঁর রুচিরও বিশেষ পরিমার্জন দরকার। এই তৃতীয় শ্রেণীর নাম দেওয়া যাক—'সূক্ষ্মরুচির সাহিত্য'। কথাটা আরো ছোট করে নিয়ে বলা যায়—'রুচিবানের সাহিত্য'। কিন্তু সে-নামে আপত্তি ওঠা সুনিশ্চিত। প্রথমতঃ তুলনায় নিজেদের কিছু নিকৃষ্ট মনে করে জনগণ বলতে পারেন—'আমরা কি তবে রুচিহীন ?' দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম সাহিত্যরুচি যাঁদের আছে, এমন মহিলারা ভাবতে পারেন যে 'রুচিবানের সাহিত্য' আখ্যাটি যথেষ্ট নয়,—ওটি সংশোধন করে তাঁরা হয়তো লিখবেন—'রুচিবান ও রুচিবতীর সাহিত্য'। আর একটি হ্রস্ব-আখ্যার সাহায্যে শেষোক্ত বাধা দূর করা যায় বটে,—বলা যেতে পারে 'রুচিনিষ্ঠ সাহিত্য'! কিন্তু তত্রাচ, জনগণের দিক থেকে প্রথম আপত্তিটি দূর হয় না। অতএব, 'সূক্ষ্মরুচির সাহিত্য'—এই আখ্যাই স্বীকার করা গেল। জনগণের রুচি আছে, সন্দেহ নেই—কিন্তু রুচিরও আপেক্ষিক ভেদ আছে।

একথা সকলেরই জানা কথা যে, সাহিত্য-রসবোধের জন্যে পাঠকের প্রস্তুতি দরকার। এই 'প্রস্তুতি' কথাটির মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা ব্যাপার নিহিত। শিশুর কাছে চণ্ডীদাসের ভাবসম্মিলনের পদ অর্থহীন! আবার শিশুপাঠ্য সাহিত্য, কিশোরপাঠ্য সাহিত্য, শ্রমিকপাঠ্য বা কৃষকপাঠ্য সাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্য-শ্রেণীর বৈচিত্র্য বর্তমান মানবসমাজে স্বীকৃত। অবিশ্যি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য নাকি শিশু-বৃদ্ধ-শ্রমিক-ধনিক নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় বলে শোনা যায়। কিন্তু উর্মিলার কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বুঝেছিলেন, তেমন ভাবে বোঝা কি পূর্বে আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ? দ্রৌপদীর বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যা লিখেছিলেন, সে রচনাও বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঘটনাটি একই বৈশিষ্ট্যের সাক্ষী। অর্থাৎ সাহিত্যের স্বাদন ব্যাপারটি যে হেতু পাঠকের সামর্থ্যের ওপরেই নির্ভর করে, এবং পাঠকের সামর্থ্য যখন সব ক্ষেত্রে সমান নয়, তখন, কোনো বিশেষ সাহিত্যিক রচনা সব পাঠকের কাছেই সমান স্বাদু বা সমান তিক্ত মনে হওয়া যে সম্ভব নয়,—এ কথা সহজেই বোঝা যায়। এবং মার্জিত মন অথবা সূক্ষ্ম রুচিবোধ মানবসমাজের দুর্লভতম জিনিসগুলির মধ্যেই যে গণনীয়,—একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। অতএব, যে সাহিত্যে মানবজীবনের এই অঞ্চলের অভিব্যক্তি ঘটে, সে-সাহিত্য আর যাই হোক, জনগণের অধিগম্য যে নয়, সে কথা সুনিশ্চিত!

অপর পক্ষে, পাঠকসমাজ আপন আপন বাসনা-অনুযায়ী সাহিত্যকর্মের অনুমোদন করেন। শিশুরা মজার গল্প, মজার ছড়া চান,—কিশোররা ভূতের গল্প, ডিটেক্‌টিভ্-

কাহিনী, দুঃসাহসিক অভিযান চান,—যুবকরা প্রেমের গল্প-কবিতা, রাষ্ট্রবিপ্লবের কাহিনী, অর্থাৎ যৌবনের জয়টীকা চান,—বৃদ্ধেরা ভালোবাসেন হরিনাম, শাস্ত্রালাপ, পুরাকথা! এই হোলো সাহিত্যে সাধারণ চাহিদা। তবে, বলা বাহুল্য শিশুদের মধ্যে প্রবীণের এবং প্রবীণদের মধ্যে শিশুর অস্তিত্বও অসম্ভব নয়। যে সমাজে জীবিকানির্বাহের বাস্তবতা জীবনের অন্যান্য আগ্রহকে দাবিয়ে রাখে, সে সমাজে স্বল্পাবকাশভোগী পাঠক চাইবেন তৎসংক্রান্ত সাহিত্য। যে সমাজে পেটের চিন্তা আদৌ নেই, সেখানকার পাঠক যদি রিপুসর্বস্ব হন, তাহলে চাইবেন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির রোমাঞ্চ। যদি তাঁরা সূক্ষ্মতর রুচির অধিকারী হন, তাহলে অবিশ্যি অন্য কথা।

জনরুচির অন্ধ সেবক হওয়া কোনো স্বত্ববান সাহিত্যিকেরই লক্ষ্য নয়। আবার, জনরুচিকে উপেক্ষা করে সেদিকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরিয়ে থাকাও সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে অনভিপ্রেত কাজ। সংস্কৃতিসম্পন্ন, সুস্থ, সমর্থ সামাজিক ব্যক্তি যখন সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে সানন্দে আত্মনিয়োগ করেন, তখন বিশেষ এক সমৃদ্ধ রুচিরই প্রকাশ ঘটে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা

ইতিহাসের পুরাপর্বের দিকে চোখ ফেরালে বাংলা সাহিত্যের পুরোনো আমলে সাহিত্য-সমালোচনার তেমন কোনো প্রচেষ্টাই চোখে পড়ে না। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রসাদে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে যা একটু-আধটু আলোচনা প্রথম বাঙালী লেখকের কলম থেকে পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল সংস্কৃতে লেখা, বাংলায় নয়।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে পূর্বসূরীর প্রতিষ্ঠিত পদাঙ্ক বৃন্দাবনের গোস্বামীরা পরিহার করেন নি। সমালোচনার প্রাচীন কালের কুলীন রীতিটি পরিত্যক্ত হয়নি। সূত্র এবং ভাষ্য, বিশ্লেষণ এবং বিতর্কসর্বস্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপ্রচারিত, সুপ্রাচীন রাজপথ নেমে এসেছে প্রাচীন সংস্কৃত থেকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সংস্কৃতে।

রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের দিগদর্শনী স্বরূপ দু'খানি বই। তবে, এ-কথা না মেনে উপায়ান্তর নেই যে, 'উজ্জ্বলনীলমণি'র লেখক ব্যাপকভাবে সাহিত্য-বিচারব্রতী ছিলেন না। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী তিনজনেই ছিলেন পণ্ডিত এবং প্রত্যেকেই ছিলেন ভক্ত। কিন্তু ধর্ম-প্রেরণানিরপেক্ষভাবে এঁরা সাহিত্যভক্ত ছিলেন—একথা মনে করবার কোনো অনুকূল নজীর নেই।

এঁদের উত্তরবর্তীদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে নরহরি চক্রবর্তীর নাম। তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' প্রসিদ্ধ বই। প্রবীণ আলোচকরা বলেছেন, 'ভক্তিরত্নাকর' হোলো বৈষ্ণব

'বিশ্বকোষ' বিশেষ। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডক্টর সুকুমার সেন স্বীকার করেছেন যে, এই বইখানি খ্রীষ্টীয় আঠারোর শতকের প্রথম পাদে লেখা হয়েছিল। সব সমেত পনেরটি 'তরঙ্গে' বিন্যস্ত 'ভক্তিরত্নাকর'-এর পঞ্চম তরঙ্গে সংগীতশাস্ত্রের আলোচনা আছে,—কিন্তু সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ে নরহরি চক্রবর্তী যেন যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করে কলম ধরেন নি বলে মনে হয়।

কবিরাজ গোস্বামীর সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্যই গ্রাহ্য। তিনি 'শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম বিবরণ, বিচার ও বিশ্লেষণ' রেখে গেছেন বটে, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার কাজে নামেন নি।

নরহরি চক্রবর্তীর গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও পণ্ডিত ছিলেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে তাঁর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে প্রাচীনতম বাংলা পদাবলী-সংকলন প্রকাশিত হয়। তারপর, আঠারোর শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র',—তার কিছু পরে বৈষ্ণব দাসের (গোকুলানন্দ সেনের ছদ্মনাম) সংকলিত 'পদকল্পতরু',—এবং এগুলি ছাড়া আরো কয়েকখানি পদাবলীসংগ্রহ সম্পাদিত হয়েছে।

এইসব পদসংগ্রহের সংকলয়িতারাও কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো রীতি প্রবর্তন করেন নি। ধর্মপ্রেরণার সাম্প্রদায়িক পরিসীমার বাইরে বাস করেও, কেবলমাত্র সাহিত্যরসের টানেই যে বৈষ্ণব-পদাবলী পড়ে খুশি হওয়া সম্ভব, এই সত্যটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক আবিষ্কার! জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পর্কে প্রথম সাহিত্যিক পর্যালোচনা দেখা গেল উনিশের শতকে। বঙ্কিমচন্দ্রই এই নব ধারার ভগীরথ। একটি মাত্র প্রবন্ধের পরিসরে তিনি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ থেকে শুরু ক'রে রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগীর প্রসঙ্গ ছুঁয়ে—ফিরে গেলেন বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের প্রসঙ্গে।† এই কৃতিত্বটি বিশেষ স্মরণীয় সন্দেহ নেই। রূপ গোস্বামী-প্রবর্তিত বৈষ্ণব রসালংকার সম্পর্কে যাঁরা পদ্যবন্ধে কিছু কিছু চর্বিতচর্বণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা' বা 'রসপুষ্পকলিকা' (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক), ঘনশ্যাম দাসের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' (সপ্তদশ শতক), রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' (ঐ), পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরস-ব্যাখ্যা' (ঐ) ইত্যাদি পুঁথিগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কলেবর-পুষ্টি ঘটিয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণদাস বা লালদাস বাংলা 'ভক্তমাল' রচনা করেন।*

† বিবিধ প্রবন্ধ : 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'।

* মূল 'ভক্তমাল' ব্রজভাষায় দোহার আকারে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে নাভাজী কর্তৃক রচিত হয়।

কৃষ্ণদাসের 'ভক্তমাল' সাতাশ 'মালা'-তে বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই বইয়ের তেইশের অধ্যায়ে তিনি 'রসপ্রকরণ' পরিবেষণ করেছেন।

পুরোনো কালের এইসব 'রসপ্রকরণ'-আখ্যার আলোচনা শুনতে-শুনতে আঠারোর শতকের কবি ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। ভানুদত্তের মূল সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ 'রসমঞ্জরী' লিখে, ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষায় কাব্যালংকারতত্ত্বের একজন লেখক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর ততোধিক কৃতিত্ব এবং ঈষৎ মৌলিকতা আছে 'অন্নদামঙ্গলের' নিম্নোক্ত মন্তব্যে :

প্রাচীন-পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

শিক্ষানবীশ কবির বেশে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য চর্চার কৈশোর পর্ব যাপন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্য-পর্যালোচনার কাজে হস্তক্ষেপ করেননি বটে, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচকের অভ্যুদয়ের পথ তিনি যে কিছু পরিমাণে প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কবিওয়ালাদের লুপ্ত কবিতাবলীর উদ্ধার সাধনের প্রচেষ্টার জন্যে তিনি স্মরণীয়,—নবীন কবিদের উৎসাহ বর্ধনের জন্যেও তিনি বন্দনীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িকদের মধ্যে রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি স্মরণীয় শক্তিমানদের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে যশস্বী কেউ ছিলেন না। উনিশ শতকের সামাজিক আলোড়নের দ্রুত-পরিবর্তমান, বহুভঙ্গুর তরঙ্গশোভার অন্তরালে আধুনিক মননানুকূল সাহিত্য-সমালোচকের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর সুনিশ্চিত হয়ে উঠছিল। ১৭৭৬ শকে (১৮৫৪ খ্রীঃ) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১) 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিক-পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই তারিখটিকেই বাংলায় আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনা-রীতির আদি-সীমানা বলা যেতে পারে। এই ঘটনার তিন বছর আগে ইংরেজ সরকারের উদ্যোগে 'ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি' স্থাপিত হয়। সে-যুগে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সংযোগসাধনে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তি। রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯)—১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' রচনা করেন। সেকালের এই দুই মনীষীর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় যে-ব্যক্তির কথা মনে পড়ে, তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪)। সাহিত্য-সমালোচনার ব্যাপারে ভূদেব বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' লেখা হয় ১৮৫৩ সালে। তাঁর আদর্শে সেকালে অন্যান্য যাঁরা সাহিত্য আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন,—রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪) ছিলেন

তাঁদেরই একজন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখে সে-যুগে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ('কবিচরিত' ১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ('বঙ্গভাষার ইতিহাস' ১৮৭১) এবং রামগতি ন্যায়রত্ন ('বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৭২-৭৩)—তিন জনেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের এইসব প্রস্তাব রচনার আগে, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রায় সমকালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১২৫৯) লেখা হয়। এই লেখাটি সে-সময়ের বীটন্ সোসাইটির এক অধিবেশনে পড়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তুলনা করে বাংলা কবিতার নিন্দা করেন। রঙ্গলাল তারই জবাব লিখেছিলেন।*

উনিশ শতকের এইসব 'প্রস্তাব' আর প্রবন্ধ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে, এদেশে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব শুরু হবার অল্পকালের মধ্যেই প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের পরিবর্তে বাংলা-দেশের সাহিত্য-পাঠকদের মনে সাহিত্য-বিচারের তুলনামূলক রীতি উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অলংকার, ভাব, ছন্দ, শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচারের পথ ছেড়ে এঁরা তখন এগিয়ে আসছিলেন জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ বিচারের অভিমুখে। একদিকে সংস্কৃত-কলেজ-গোষ্ঠীর অনুশীলন, অন্যদিকে হিন্দু-কলেজ-গোষ্ঠীর আগ্রহ—এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফলে সে-যুগে গদ্যে-পদ্যে মৌলিক অন্যান্য সৃষ্টি যেমন ঘটেছে, তেমনি সাহিত্য-সমালোচনার নতুন পথ সন্ধানেরও সূচনা হয়েছে। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'সমালোচনা সাহিত্য' নামের বইখানির 'গ্রন্থ-পরিচিতি' অংশে সম্পাদক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> '১৮৫০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীব্যাপী রবীন্দ্রপূর্ব যুগের সমালোচকগোষ্ঠী সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার ও রসবিশ্লেষণে যে অভ্রান্তপ্রায় অনুভব-শক্তি দেখাইয়াছেন, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে অপরিচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব সাহিত্যিক সৌন্দর্যের সহিত নিজ অনভ্যস্ত রুচির মিলন ঘটাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর মানস প্রকর্ষ ও প্রগতিশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই দিক দিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সহিত তুলনায় বাংলা সাহিত্যের কৃতিত্ব অধিক বই অল্প নহে। ইংরাজী সাহিত্যে চসার, স্পেন্সার ও শেক্‌সপিয়ারের অনুপম সাহিত্য সৃষ্টির দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের গুণজ্ঞ সমালোচকের উদ্ভব হয়।'

* 'সাহিত্যের নানাকথা' গ্রন্থে রঙ্গলালের এই আলোচনা সম্বন্ধে আমি আলোচনা করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি,—তিন সাহিত্যেই অনুরাগী ছিলেন। কাব্যের শ্রেণী-বিভাগের সংকল্প নিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

'এক দল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, আর এক দল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য-হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন।...

আধুনিক বাঙালী লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজী গীতিকবিদিগের অনুগামী।...

এক্ষণকার কবিগণ—জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ।'

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ প্রভৃতি রসপর্যায়ের বিভাগই যে সাহিত্য-সমিতির একমাত্র মানদণ্ড নয়, অথবা অলংকার পর্যবেক্ষণই যে সাহিত্য-সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য নয়, তৎকালীন বাঙালী লেখকদের শ্রেণী-বিভাগ করতে বসে, বঙ্কিমচন্দ্র সে-কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতার বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর আগ্রহ আর বিরাগ দুই-ই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব অভিরুচির তাগিদে। স্বকীয় প্রবণতা এবং আপন কর্তব্যবোধের শাসন তিনি অকুণ্ঠভাবে মেনে নিয়েছেন। সমকালীন কবিদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন :

'তাঁহাদের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কবিতা প্রগাঢ় ;—মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সংকীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।'

বঙ্কিমচন্দ্র একই প্রবন্ধের পাত্রে ভিন্নকালবর্তী বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর নিজের সমকালবর্তী অন্য দু'জনের কথা স্মরণ করেছেন। প্রকৃত সাহিত্যরসসম্ভোগের উৎসবমণ্ডপেই এমন সর্বসম্মেলন সম্ভব। দেশকালের পরিসীমা-বিধৃত পৃথক পৃথক সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃতিগত তারতম্য স্বীকার করেও দেশ-কাল-ধর্ম-সংস্কার প্রভৃতির অতিশায়ী চিরন্তনী মনুষ্য-প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণের পৌনঃপুনিক আবির্ভাবও যে সাহিত্যের সুদীর্ঘ ধারায় প্রতিফলিত হতে পারে, সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এই দৃষ্টির গুণেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন :

'শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য সাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা

বলিতেছি না, কিন্তু সীতানুবর্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।···

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।···

সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী।···

দ্রৌপদীর চরিত্রের দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প ধর্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে।'

মানব-চরিত্রে দর্প এবং ধর্ম,—এই দুইয়ের সমাবেশ অপ্রকৃত নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদী-চরিত্রের তারিফ করেছিলেন। অন্যপক্ষে, আর-একজন সমালোচক—সীতা চরিত্রের রূপায়ণে দর্পের আত্যন্তিক অভাবে বিশেষ পীড়াবোধ করে লিখে গেছেন :

'অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা তাঁর লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন রামের কোলে বসে অযোধ্যা যাত্রা করলেন। তাঁর পতিভক্তি অপরিসীম, তাঁর সহিষ্ণুতা আর ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এতটা অপমানের পর তাঁর মনে কি একটুও গ্লানি ছিল না?'*

সাহিত্যতত্ত্বের পূর্বতন সূত্রে-ভাষ্যে সুপণ্ডিত হয়েও উপভোগ-সামর্থ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বাধীন। উনিশ শতকের শেষার্ধ-পর্বে তাঁরই কলমে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল। 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমনা' প্রবন্ধে কালিদাস এবং শেকস্পীয়র পাশাপাশি জায়গা পেয়েছেন ; 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' এবং শেকস্পীয়রের 'ওথেলো' নিকট সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে ; নিজের মননের আন্তরিকতায় আস্থা রেখে বঙ্কিমচন্দ্র অকম্পিত কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন :

'কুমারসম্ভবে' একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী।†

আবার, পুরোনো আমল থেকে সরে এসে তিনি যখন তাঁর সমকালীন ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্রের রচনা পর্যালোচনায় উদ্যোগী হয়েছেন তখনও তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়নি ; সে-ক্ষেত্রেও তাঁর নিজের মতামত উচ্চারিত হয়েছে অকুণ্ঠভাবে। তবে

* বাল্মীকি-রামায়ণ—রাজশেখর বসু ; ভূমিকা পৃঃ ।৴০

† 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলোচকে-আলোচকে মতামতের গরমিল ঘটা অসম্ভব নয়। তাঁর সমকালীন দু'একজন কবির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উত্তরকালের সাহিত্য-পাঠকের রুচি বা বিচারের সম্মতি নাও পেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত এখানেই তুলে দেখানো যেতে পারে। 'বিবিধ প্রবন্ধের' 'গীতিকাব্য' নামক লেখাটিতে তিনি লিখেছিলেন :

> 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।'

প্রত্যেক কবিরই কিছু-না-কিছু বলবার কথা থাকে। নবীনচন্দ্রেরও ছিল। কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সেকালের যশস্বী কবিদের কতকটা অনুকরণধর্মী রচনা এই 'অবকাশরঞ্জিনী'তে নবীনচন্দ্র সেন তেমন স্মরণীয় কোনো মৌলিকতার পরিচয় রেখে যান নি। তাহলে প্রশ্ন এই দাঁড়ায় যে, স্থিতধী বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সঙ্গে তবু তাঁর নাম কেন স্মরণ করলেন? ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' অনুল্লেখনীয় রচনা। আর যাই হোক, 'বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য' এই দুখানি বইয়েই অনুপস্থিত। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্যটি যে তাঁর স্বাভাবিক সতর্কতা রক্ষা করে প্রয়োগ করেননি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কৈশোরের গুরু ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব বিচারকালে তিনি শুদ্ধ, সংযত চিত্তে যেমন যোগ্য গুরুদক্ষিণা দিতে পেরেছিলেন, ভারতচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঠিক তেমন যে পারেন নি, সে সত্য স্বতঃসিদ্ধ।

সমকালীন জনরুচির কাছে সত্যদ্রষ্টা এখানে যেন হার মেনেছিলেন। সেকালের 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি যে খ্যাতিমান ছিলেন, নানা সমালোচকের লেখায় তার ইঙ্গিত আছে। যুগবন্দিত কবির রচনার মূল্য নির্ণয়ের দায়িত্ব সত্যিই সতর্কতাসাপেক্ষ ব্যাপার। সমকালীন কবি মধুসূদন দত্ত সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র যথোচিত মনোনিবেশ করেন নি। মধুসূদন সম্বন্ধে তিনি দু'একটি প্রশংসার কথা বলে গেছেন বটে। কিন্তু সত্যিই আরো প্রাপ্য ছিল মধুসূদনের!*

এই রকম দু'একটি উদাসীনতার দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম নিঃসন্দেহে বন্দনীয়। 'বঙ্গদর্শনে'ই বঙ্গসাহিত্যের নবীন বিচারপদ্ধতি শুরু হোলো। 'বঙ্গদর্শন'-যুগের লেখকদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩),

* ভিন্ন প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রবিদৃষ্টির ক্ষীণতা' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। অনুরাগী পাঠক তাঁর আলোচনাটি পড়ে দেখলে খুশি হবেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫৬), ১৫২-৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, বীরেশ্বর পাঁড়ে ইত্যাদি অনেকগুলি নাম স্মরণীয়। সেকালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকার মধ্যে ছিল বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'অবোধবন্ধু' (প্রথম প্রকাশ : ১২৭৩-৭৪), কালীপ্রসন্ন ঘোষের মাসিক 'বান্ধব' (প্রথম প্রকাশ : ১২৮১—নবপর্যায় : ১৩০৮), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাপ্তাহিক 'সাধারণী' (প্রথম প্রকাশ : ১২৮০) এবং মাসিক 'নবজীবন' (প্রথম প্রকাশ : ১২৯১-৯২), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' (প্রথম প্রকাশ : ১২৮৮), দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'নব্যভারত' (প্রথম প্রকাশ : ১২৯০), সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মাসিক 'সাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ : ১২৯৭) এবং আরো কয়েকখানি কাগজ।

বঙ্কিম-প্রভাবান্বিত এই সমালোচক-পরিবারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি নতুন দৃষ্টির নতুন অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছিল সমান্তরাল ধারায়। ১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) সম্পাদনায় 'ভারতী' বেরিয়েছিল। সে-যুগে 'বঙ্গবাসী' ছিল গোঁড়ামির মুখপত্র, আর,—'সঞ্জীবনী' (প্রথম প্রকাশ : ১২৮৯—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র) ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। ১২৯৮ সালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪০-১৯৩২) 'হিতবাদী' দেখা দিয়েছিল আদর্শ একখানি সাহিত্য-সাপ্তাহিকের অভাব দূর করবার সংকল্প নিয়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার আদর্শবাণী (motto) দিয়েছিলেন—'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ'। যে-বছর 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়, সেই ১২৯৮ সালেই সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাধনা' বের করেছিলেন।

বঙ্কিম-যুগের বহু সতর্ক লেখক-পাঠকের মধ্যে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। দ্বারভাঙ্গা থেকে প্রকাশিত 'পাক্ষিক সমালোচক' সম্পাদনা করে এবং অনেক মূল্যবান সাহিত্য-প্রবন্ধ লিখে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। 'পাক্ষিক সমালোচক' অবিশ্যি বেশিকাল চলেনি। ঠাকুরদাস নিজেই লিখেছেন :

> 'আটমাস কাল সতেজে ও সম্মানের সহিত চলিয়া, সাহিত্যের সু-আহার্য্য অভাবে উহা এক বৎসর পরে এ দেশীয় অনেকানেক পত্রিকারই মত পিতৃলোকে, বিলীন হয়।'

বাংলা ১২৯০ সালের (ইং ১৮৮৪) ফাল্গুনের প্রথম পক্ষে 'পাক্ষিক সমালোচক' আত্মপ্রকাশ করে। ১২৯১ সালের পত্রিকায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রাচীন কালের সাহিত্য-গ্রন্থের টীকাকারদের সঙ্গে নব্য সমালোচনাকারদের তুলনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'তখনকার 'টীকাকারে' এবং এখনকার 'সমালোচকে' পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে,

তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না। 'টীকাকার' প্রত্যেক শ্লোকের দুরূহ পদমাত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা করেন। সমালোচক গ্রন্থটি মোটের উপর লইয়া বা তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল লইয়া তাহার 'সমালোচনা' করেন। 'সমালোচনা' শব্দ বিস্তৃতার্থ-বোধক। অতএব ব্যাখ্যাও উহার অন্যতম অংশ। তবে টীকাকারের ব্যাখ্যার ন্যায় সে ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ নহে। পুঙ্খানুপুঙ্খ হইবার প্রয়োজনও হয় না। কারণ এখন টীকাকার ও সমালোচক এক ব্যক্তি নহেন,—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু পূর্বকালে এরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না।*

সাহিত্য-সমালোচনার পথ যে এক নয়,—বিচিত্র এবং ভিন্নমুখী,—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সে-কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। কখনও বিশ্লেষণ, কখনও সংশ্লেষণ দরকার। সাহিত্যের সমালোচক সাধারণ পাঠককে সাহিত্যের খবর জুগিয়ে থাকেন, —আবার অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শী আগ্রহসম্পন্ন পাঠকের মনে তিনি বিশেষ বিশেষ রচনা সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করেন। সমালোচকের পক্ষে প্রাচীন রীতির চর্বিতচর্বণ মাত্র কাম্য নয়। ঠাকুরদাস লিখেছিলেন :

'সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সূক্ষ্মদর্শী, সুনিপুণ, শিল্পী লোক থাকেন, এমন উদার বিচক্ষণ ব্যক্তি থাকেন, যাঁহারা মৌলিকতার অত্যন্ত পক্ষপাতী।'

কিন্তু 'মৌলিকতা' মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ঠাকুরদাস জানিয়েছেন :

'রক্ষণশীলতা উন্নতিশীলতার বিরোধী নহে, উচ্ছৃঙ্খলতা উন্নতি নয়। রক্ষণশীলতা রক্ষা করে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা উন্নতির উত্তেজক। অভিনব হইলেই মৌলিক হয় না, উচ্ছৃঙ্খলতায়ও অভিনবত্ব থাকে। উচ্ছৃঙ্খলতা মৌলিকতা নহে। যাহা শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সংরক্ষণ করিয়া নিজের অভিনবত্ব দেখায়,—দেখাইতে সক্ষম হয়, তাহাই মৌলিক।'

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবিহারিণী কল্পনা-ই যে কাব্যের প্রসূতি,—সে-কথা স্বীকার করে তিনি কাব্য-সমালোচনার আধুনিক পথ নির্দেশ করেছেন। কাব্যকে ব্যাকরণ-অলংকারের বিধি-বিধানে কবিও বাঁধবেন না, সমালোচকও সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করবেন না,—এই ছিল তাঁর মন্তব্য। অতি-নিয়মে কবিতার অপমৃত্যু ঘটবার দৃষ্টান্ত যে বিরল নয়, সে-কথা তিনি স্বীকার করেছেন। কবিতার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে সেইটুকু মাত্র বিধিনিষেধ চলতে পারে —যেটুকুতে তার 'আভ্যন্তরিক অংশ' বিপন্ন না হয়। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের মন্তব্য :

'যাহা জননী কল্পনার অনন্তস্পর্শী ধরণীর সহিত একসূত্রে গ্রথিত, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম খাটে না,—নিয়ম করিলেও তাহা বহুদিন টেকে না, নির্দিষ্ট

* সমালোচনা সাহিত্য (শ্রাবণ, ১৩৫৭)—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত।

নিয়ম দ্বারা কাব্যের সে অংশের সমালোচনা চলে না। সে অংশ বিচার বিতর্কের বিষয় নহে, বুঝিবার এবং ব্যাখ্যা করিবারই বিষয়; তাহা নিন্দা-প্রশংসার বিষয় নহে; ধ্যান-ধারণার বিষয়। কাব্যের এই ধ্যান-ধারণা ভাবনা ও ব্যাখ্যা করিবার জন্যই নব প্রণালীর সমালোচনার আবির্ভাব। এই প্রণালীর মতে, কাব্য প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে হইলে, তাহার যথার্থ বিচার ও ব্যাখ্যা করিতে কবির সহিত একীভূত হইয়া কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যক। ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশের ন্যায় কাব্যেরও আধ্যাত্মিক অংশ আছে, এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ও সার অংশ। সেই আধ্যাত্মিক অংশ আধ্যাত্মিক ভাবেই অনুভবনীয়, অন্যভাবে নয়। নব প্রণালীর সমালোচনা এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক। পুরাতন প্রণালীর সমালোচনার সহিত তাহার পার্থক্য এই যে, নব প্রণালী অনুধাবন করে, প্রতিবাদ করে না, ব্যাখ্যা করে, বিচার করিলে 'রায়' লিখে না।'

এই নব্য রীতিই যে ব্যাপকভাবে গ্রাহ্য হওয়া উচিত এবং এই শ্রেণীর সমালোচকরা যে শিল্পীরই সমধর্মী,—উনিশ শতকের নবম দশকের বাঙালী সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সে-কথা বুঝেছিলেন। তিনি বিচারবিবৃতিমুখ্য প্রাচীন রীতি,—উপভোগ-মুখ্য 'আধ্যাত্মিক' বা 'দার্শনিক' রীতি—এবং 'সমালোচ্য বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিবৃতি'-মূলক 'বৈজ্ঞানিক' রীতি—সমালোচনার এই তিন পন্থাই লক্ষ্য করে সেকালের বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার সাধক-উপাসক-নবীন-প্রবীণ কর্মীদের সচেতন করে দিয়েছিলেন।

বাংলা ১২৭৯ সালের (ইং ১৮৭২) 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' সম্পর্কিত লেখাটি ছাপা হয়। তারপর ১২৮৩ সালের 'বান্ধব' পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নাটক',—১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শনে' চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য',—১২৯২-এর 'নব্য ভারত' পত্রিকায় দেবেন্দ্রবিজয় বসুর 'নভেলের শিল্প বা কবিত্ব' ইত্যাদি প্রবন্ধ-নিবন্ধ আত্মপ্রকাশ করে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিম-যুগের এই সব সাধকদেরই অন্যতম। তিনি কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন সাহিত্য-প্রকারের (types of literature) বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা যে আদৌ না করেছেন, এমন নয়—কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহ ছিল সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টি, উদ্দেশ্য আর ভাষা নির্ণয়ের অভিমুখে। তাঁর মতে, 'গদ্যে কবিতাময়ী রচনা' হোলো বিশেষ শক্তিসাপেক্ষ দায়িত্ব। 'ভাবুকতা-প্রবণ ভাষা' যার-তার কলমে ফোটে না।

'কাব্যানুভূতিমূলক, কবিতাময়ী সমালোচনা মধ্যম শ্রেণীর লেখকদিগের সাধনীয়া নয়। উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য কেবল তাঁহারাই হইতে পারেন, যাঁহাদিগের শক্তি কবি-শক্তির সহিত দৌড়াইয়া কুলাইতে পারে; যাঁহাদের

হৃদয় স্বভাবতঃই কবিতা-প্রবণ ও বুদ্ধি সম্যকরূপে সুশিক্ষা ও সুরুচি মার্জিত এবং ভাষার উপর যাঁহাদের অপরিসীম অধিকার ও আধিপত্য আছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে সে-যুগে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার নব্য রীতি প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও 'পাক্ষিক সমালোচক'এর সম্পাদক লিখেছিলেন :

'বাঙ্গালা সাহিত্যে, সমালোচনা-সাহিত্য, অদ্যাপি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তুতই হয় নাই।'

এই মন্তব্যের সময় থেকে আজকের দিন অবধি প্রায় সত্তর বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি নানা শক্তিমানের সাধনায় বাংলার সাহিত্যধারা কখনো খরস্রোতা, কখনো বা মন্দবহা নদীর মতো বিচিত্র সামর্থ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলার সাহিত্য-সমালোচনার পরিণতি ঘটেছে এই সময়ের মধ্যেই। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের * আমল থেকে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের ১২৯১ সালের লেখাটি পর্যন্ত প্রায় বত্রিশ বছরের প্রসারে বহুবিচিত্র প্রচেষ্টায় সমালোচনার পথসন্ধানপর্ব অতিবাহিত হয়েছে। তারপর পথপ্রাপ্তির কাল! পৃথক পথ নয়,—নিশ্চিততর পথ; বঙ্কিমচন্দ্রের পথ ত্যাগ করে নয়,—তাঁকে স্বীকার করে, স্মরণ করে, অভিবাদন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের নতুনতর পথিকৃৎ।

সমালোচনার আরও কথা

সমালোচকের পক্ষে তাঁর সমালোচ্য সৃষ্টির সমকালীনতা একটি দুস্তর বাধা। খুব কাছের জিনিসে দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়।

চোখের নাম চক্ষুরত্ন! সে রত্ন দিয়ে দৃশ্য জগতের রূপরস ভোগ করা যায়। কিন্তু চোখেরও সামর্থ্যের সীমা আছে। দৃষ্টিবিজ্ঞানী বলেন, চোখের মণির অতি নিকটে আছে 'নিকট বিন্দু'—সেখানে দৃষ্টিক্ষমতা ক্ষীণ, দৃশ্যজগৎ অদৃশ্য।

তবু সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার কমতি নেই। দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক-দ্বৈমাসিক-ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকার সমালোচনা বিভাগ সদা শশব্যস্ত। তাছাড়া আছে শনিবারের বিকেল এবং রবিবারের সকাল এবং আরো কতো লগ্ন এবং অবকাশ,—সাহিত্যের বিষয়ে কথা ওঠা যখন অবশ্যম্ভাবী; এবং কথা যদি ওঠেই,—তা হলে প্রধানতঃ যে বিষয়ে কথা হবে, সে হোলো সাম্প্রতিক সাহিত্য। সাহিত্যের দীর্ঘ ধারার পরিচয় লাভ করা শ্রমসাধ্য এবং সুযোগসাধ্য ব্যাপার। সে সুযোগও সকলে পান না, শ্রমও সকলের সাধ্য নয়। অল্পাগ্রহী জনসাধারণের কাছে প্রাচীনকালের

* বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৫৯)—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েকজন লেখক এবং কয়েকটি গ্রন্থনামমাত্র পরিচিত,—সেই মুষ্টিমেয় নামনীহারিকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে নিত্যখরজ্যোতিঃ, আত্মঘোষণারত, অকুণ্ঠ বর্তমান!

বর্তমান যে শুধু দাঁড়িয়েই থাকে, তা নয়। বর্তমান চলে,—এবং চলতে চলতে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একার্ধ যায় অতীতের মহলে,—অন্যার্ধ হাঁটে ভবিষ্যতের অভিমুখে। যে অর্ধ অতীতে অদৃশ্য হতে চায় তার শোওয়া-বসার অবকাশ মেলে। পুরোনো কালের সুপ্তিলোক থেকে পুরোনোতর কালের সুষুপ্তি-লোক পর্যন্ত তার গতি অবাধ হতেও বাধা নেই। আমাদের বাংলা সাহিত্যের অধুনা গতায়ু কোনো-এক বর্তমান-মঞ্চে একদা দেখা দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তিনি এখন সুষুপ্ত! আবার বাংলা সাহিত্যেরই আর-এক বর্তমান-মঞ্চে দেখা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি এখন স্বগত! তথাপি, তাঁর মর্ত্যপরিক্রমা অদ্যাপি শেষ হয়নি। নানা 'বর্তমান'-সন্ধিতে তাঁর পদধ্বনি বারে বারে শোনা যাচ্ছে।

বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, ভারতচন্দ্র-মধুসূদন-বঙ্কিম-দীনবন্ধু ইত্যাদি এবং তারপর, এই শতকের প্রথিতযশা লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতি সর্ববিদিত। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক রচনাবলীর বিষয়ে সমালোচকের চূড়ান্ত রায় দুষ্প্রাপ্য। সমালোচকদের পক্ষে সে কর্তব্য অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য, সন্দেহ নেই।

দু'-পাঁচ-দশ বছরের নিকট সমকালীনতার ক্ষেত্রে তো বটেই,— এমন কি পঞ্চাশ-ষাট বছরের ব্যবধানেও সাহিত্য সমালোচনায় দুই সমালোচকের মতের অনৈক্য ঘটা স্বাভাবিক। শ্রুতকীর্তি কোনো সাহিত্যরথী তাঁর সমকালীন কোনো রচনা সম্বন্ধে যে রায় দিয়ে ফেললেন, সেইটিই যে বেদবাক্যের মতো অভ্রান্ত হবে, তা মনে করবার হেতু নেই। সে রায় উত্তরকালে টিঁকে যেতেও পারে, না-ও পারে। বিহারীলালের কবিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রশংসা উৎসর্গ করেছেন, তার সর্বাংশ অবশ্যগ্রাহ্য নয়। আবার, ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে রায় দিয়েছেন, তা অদ্যাপি অসংগত মনে হয় না। এই দুটি জুড়ির মধ্যেই সমকালীনতার সম্পর্ক ছিল। বিদ্যাবুদ্ধির ঐশ্বর্যে বাংলা সাহিত্যের এই চন্দ্র-সূর্য,—কেউই কম ছিলেন না! বিহারীলালের পরম ভক্ত এবং বয়ঃকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ—আর, ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য এবং বয়ঃকনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র দু'জনেই ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন অনন্য-সাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অতিনৈকট্যের বাধা যে পরিমাণে কাটিয়ে উঠেছিলেন, বিহারীলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিচারে কি ততোটা নির্বিঘ্ন দৃষ্টি অনুভব করা যায়? টেনিসনের সামর্থ্য সম্পর্কে ম্যাথ্যু আর্নল্ড জোর গলায় প্রশংসা করেননি। শেলীর সঙ্গে আর্নল্ড সাহেবের সময়ের ব্যবধান ছিলো আরো বেশি। শেলীকে তিনি বলেছেন, মহাশূন্যের ব্যর্থকাম বিহঙ্গ,—অক্ষম দেবদূত!

সেণ্ট ব্যুভ্ ফ্লবেয়ার সম্বন্ধে সুবিচার করেননি। ফ্লবেয়ারের লেখায় সেণ্ট ব্যুভের নাকি মন ওঠেনি। সেই ফ্লবেয়ার সম্পর্কে আধুনিক সমালোচক সমারসেট মম বলেছেন, 'আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাসের প্রবর্তক হলেন ফ্লবেয়ার এবং তাঁর পরবর্তী সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখায় তাঁর অল্পবিস্তর প্রভাব যে পড়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের কবি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' তাঁর সমসাময়িক পাঠকদের কাছে অতি রুচিকর সামগ্রী বলে মনে হয়েছিল। আজ ক'জন সে কাব্যের খোঁজ রাখেন? দাশরথির পাঁচালীর লোকরঞ্জকতাগুণ স্বীকৃত হলেও এ-কালের ক'জন সমালোচক সেই গীতিগুঞ্জনের অতীত আনন্দের অংশীদার হতে পারেন?

প্রতিবেশীকে আমরা কতকটা ঝাপসা দেখি। তাঁর নিত্য-অভ্যাসগুলি আমাদের নিত্য-অভিজ্ঞতার সামগ্রী। তাঁর অশন-ব্যসন আমাদের সুবিদিত; তাঁর হাস্য-গাম্ভীর্য, বিষণ্ণতা-প্রসন্নতা আমাদের নখদর্পণে; তাঁর প্রীতি-অপ্রীতির সমস্ত অঙ্গভঙ্গি আমাদের পরিচিত। শুধু তাই নয়, আমাদের ব্যক্তিগত দুর্লঙ্ঘ্য সাময়িকতার নানান সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে প্রতিবেশীর পরিচয় কেমন যেন খণ্ডিত-রুদ্ধ, মিত-অপূর্ণ। তার ফলে, তাঁর সমকালীন সমালোচকের হাতে কোনো স্রষ্টাই নিজের সম্যক মূল্য পেতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথকেই কি আমরা তাঁর সম্যক মূল্য দিতে পেরেছি? শেক্সপীয়র-এর সমকালীন সাহিত্যরসিকসমাজ অতো বড়ো একজন কবি এবং নাট্যকারের একখানি প্রতিকৃতিও রেখে যাননি। প্রতিবেশীর সম্পর্কে আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের অতি-পরিচয়ই তাঁর গূঢ়তম সত্তার বিশুদ্ধ প্রকাশ-ব্যাপারকে আমাদের পক্ষে দুরধিগম্য করে রাখে— সহজে তাঁকে আমাদের দৃষ্টির আয়ত্ত হতে দেয় না। তাঁকে তাঁর বাহ্য আচরণের মুখোসের বাইরে দেখবার সুযোগ কোথায়? প্রতিবেশী তাঁর সহস্র করণীয়ের আবরণে নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজেকে ঢেকে রাখেন। লোকাচারের এবং নিত্যকৃত্যের অন্তরালে তাঁর এবং আমাদেব প্রত্যেকের নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব থেকে যায় নিত্য প্রচ্ছন্ন। লিখতে লিখতে কথা বোধ হয় ঝাপসা হয়ে আসছে? অতএব, এইবার একটি দৃষ্টান্ত খাড়া করা যাক:

দরজায় তৃতীয় আগন্তুকটি ডাকঘণ্টির 'সুইচ' টিপতেই শ্রীযুক্ত বিষাদসিন্ধু গুপ্তের পাঠকক্ষে ঘণ্টা বেজে উঠলো। সামনের দেয়ালে,—ঠিক তাঁর পড়ার টেব্‌লের ওপর দেয়ালপঞ্জীতে কৃষ্ণবর্ণ দিন-যামিনীর অবকাশহীন প্রবাহের ধারায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে, ভদ্রলোক হাতের বইখানা সশব্দে টেবিলে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অধরোষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ হোলো, চোখের দৃষ্টি অগ্নিস্রাবী হোলো;—চেয়ারখানা পিছন দিকে ঠেলে দেবার সময় যে শব্দ হোলো তা তাঁর স্বকর্ণে প্রবেশ করামাত্র তিনি সংযত হবার চেষ্টা করলেন।

সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রাত্যহিক পাঠাভ্যাসে এই তাঁর তৃতীয় বিঘ্ন! আগের দুবারের মতন এবারেও তিনি উদ্যত ক্রোধ গলাধঃকরণ করলেন, বজ্রমুষ্টি শিথিল করলেন, তাঁর স্ফুরিত নাসা সংকুচিত হোলো,—এবং তাঁর পাঠকক্ষের বাইরে গিয়ে আগন্তুক ঘন্টিবাদকের জন্যে তিনি যখন দরজা খুলে দাঁড়ালেন,—তখন কে বলবে তাঁর মানসলোকে মুহূর্তকাল আগে খর-গ্রীষ্মের উত্তাপ দেখা দিয়েছিল? তাঁর আগন্তুক ছাত্রটি দেখলো স্নিগ্ধ শিক্ষকের সদাপ্রসন্ন আমন্ত্রণ!

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই পরীক্ষার্থীটি তাঁর কাছে কী রকম নম্বর পেয়েছে, তা তিনি বললেন না। কিন্তু সেজন্যে দুঃখিত হলেও মনে মনে অধ্যাপকের স্নিগ্ধতার তারিফ করতে করতেই কৌতূহলী ছাত্রটি ফিরে গেল। একেই বলে সার্থক বঞ্চনা।

এমনি একটির পরে একটি ঘটনা ঘটতে-ঘটতে শ্রীযুক্ত বিষাদসিন্ধু গুপ্তের সম্বন্ধে তাঁর প্রতিবেশীদের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়, সে ধারণার সঙ্গে আসল বিষাদসিন্ধুর ব্যক্তিত্বের রূপে—মিলের চেয়ে গরমিলই যে বেশি হবে, তার আর ব্যাখ্যার দরকার নেই। আসল বিষাদসিন্ধু সাজঘরের ভেতরে একরকম,—সাজঘরের বাইরে আর-একরকম। আমাদের সমকালীন সাহিত্যিকদের আমরা যে শুধু সাজঘরের বাইরেই দেখে থাকি, এমন কথা এ আলোচনার প্রতিপাদ্য নয়। আমরা তাঁদের সাজঘরের ভেতরের চেহারা সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল আছি। তবে, এদিকেও সতর্কতা চাই। রামমোহন যে ঔদরিক ছিলেন, মধুসূদন যে দাম্ভিক ছিলেন, শরৎচন্দ্র যে বিশেষভাবে বেওয়ারিশ পথের কুকুর-সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন—এসব বৃত্তান্ত অনেকেরই সুবিদিত। এমন পরিচয়কে সাজঘরের ভেতরের শিল্পিপরিচয় মনে করা সুবিবেচনা নয়। এগুলি তাঁদের সর্ববোধ্য কয়েকটি বিশেষত্ব মাত্র। মধুসূদনের জীবনব্যাপী দাম্ভিকতার সঙ্গে তাঁর কাব্যের ওজোগুণ-প্রাধান্যের বেশ সংগতি আছে। মনোরাজ্যে অক্লান্তকর্মী রামমোহন যে জঠরের সামর্থ্যে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন, এও তাঁর দেহ-মনের বিস্ময়কর সংগতিরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু গণিতবিদ্ চার্লস লাটওয়াইজ ডজ্সন এবং চিরস্মরণীয় লুইস ক্যারল—এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে তেমন সহজবোধ্য সংগতি কোথায়? অথচ সাহিত্যরসিক মাত্রেই জানেন যে এঁরা দুই নামের ভিন্ন ব্যক্তি নন,—এই দুই নাম একই ব্যক্তির দুই বিরোধী দিকের সূচক—প্রথমটি যে-ভদ্রলোকের পিতৃদত্ত নাম, দ্বিতীয়টি সেই ভদ্রলোকেরই স্বনির্বাচিত ছদ্মনাম! বাংলায় যিনি পরশুরাম, তিনিই রাজশেখর বসু! এই অসংগতিই সাজঘরের ভেতরের সত্য। এই রকম স্ব-বিরোধই মানুষের স্বভাব। মনের উপরতলায় অসংগতি মনোগহনের কোনো-এক মগ্ন ঐক্যে বিধৃত। সেই অ-পরিদৃশ্য ঐক্যবোধই মানুষের সকল খণ্ডজ্ঞানকে রসের রাজ্যে পুনরায় একের মধ্যে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এ-কথাটির ইংগিত গভীর! এ-সত্য রসিকের প্রত্যক্ষ!

শুধু সাহিত্যিক বা শিল্পীদের সম্বন্ধেই নয়,—ব্যাপকভাবে জাতিগত অর্থেই বলা যায় যে, মানুষ বিচিত্র অসংগতির সমাহার। একই মানুষের মধ্যে ভালো আর মন্দ, সংযম আর অসংযম, সংগতি আর অসংগতি মিলেমিশে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় বিদ্যমান আছে। মানুষের এই রূপটি দেখবার জন্য যথোচিত দূরত্ব দরকার। সে দূরত্ব শুধু কালগত নয়। সে দূরত্ব দর্শকের মানসিক সামর্থ্যগত। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঈশ্বর গুপ্তকে ঠিক ঠিক দেখেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাছের মানুষ গুপ্ত-কবিকে তিনি সমালোচকের দূরের চোখ দিয়েই দেখেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তকে তিনি শুধু তাঁর নিজের প্রবীণ প্রতিবেশী মনে করেই ক্ষান্ত হননি।

প্রতিবেশীকে আমরা যে তাঁর যথার্থ স্বরূপে দেখতে পাই না, তার প্রধান কারণ,—আমাদের নিজেদেরই দুর্লঙ্ঘ্য স্বভাব। সমকালীন সাহিত্যস্রষ্টা স্থান এবং কালের সঙ্গে,—নিকটবর্তী নানান্ মানুষের পরস্পর-সংঘর্ষপ্রবণ নানান্ কুলশীলের সঙ্গে যথাসম্ভব সংগতি রক্ষা করবার চেষ্টায় অল্পবিস্তর হলেও—নিত্যই যত্নশীল থাকেন। সমালোচকের সামাজিক সত্তাটিও সেই একই কাজে নিযুক্ত থেকে সামাজিকতার রঙ্গমঞ্চে স্রষ্টার অভিনয় দেখতে দেখতে সেই অভিনয়কেই তাঁর আসল জীবন বলে ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারেন। সামাজিকতার রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকাল বাস করে নাট্যমন্দিরকেই বাসগৃহ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ অবস্থায় স্রষ্টামানসের উপমান যদি হয় ডন কুইক্‌সট, তাহলে তাঁর সমধর্মী অদূরদর্শী অনুরক্ত সমালোচককে বলা যেতে পারে, সাঙ্কো পাঞ্জা।

তার মানে এ নয় যে, সমালোচক স্রষ্টার প্রতি সহৃদয়তা পরিহার করবেন। সহৃদয়তা অবশ্যকাম্য। কিন্তু সহৃদয়তা মানে সমকক্ষবাসিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। স্রষ্টার সেই অপরিসীম বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য পর্যবেক্ষণই সমালোচকেব লক্ষ্যস্থল। স্রষ্টা এবং তাঁর সমালোচক যখন একই কালে, একই দেশে একই জল-হাওয়ার পরিবেষ্টনীতে বাস করেন, তখন উভয়ের সামাজিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আচরণ প্রভৃতির মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সামাজিকতার রঙ্গমঞ্চের ঘাত-প্রতিঘাতে স্রষ্টার যে মূর্তিটি তাঁর নিজের নিভৃত অবকাশে দিনে দিনে সংগোপনে বিবর্তিত হয়ে ওঠে,—প্রকৃত সমালোচক তারই অনুসন্ধিৎসু। সমকালীন সমালোচককে সমকালীন জাতীয় অভিনয়ের সর্বজনীন রঙ্গশালা থেকে স্রষ্টার অনুসরণ করে একবার যেতে হয় সাজঘরে, আবার ফিরতে হয় রঙ্গমঞ্চে; কখনো যেতে হয় শিল্পীর ধ্যানমন্দিরে, কখনো ফিরতে হয় তাঁর সভাকক্ষে। এবং এই বিচিত্র পরিক্রমার আয়োজনে-অভ্যাসে তাঁর নিজের অভ্যস্ত বিশ্বাস বা মতামত যে সর্বদা অটুট থাকা সম্ভব নয়, সে-কথা বলা বাহুল্য। শক্তিমান শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সত্যিই সংক্রামক। তাঁর সংস্পর্শ চিত্তপরিবর্তক।

সুধী সমালোচকের স্বকীয় মতামতও তিনি আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রদবদল করতে পারেন। এই অঘটন নিবারণ করবার জন্যে সমালোচকের নিজের থাকা চাই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব,—অটুট আত্মস্থতা! চাই একাধিক যুগমানসের বিচিত্র স্ফুরণধারার সম্যক জ্ঞান—কঠিনতম অভ্যাসের পৌনঃপুনিক অপসৃতির ঐতিহাসিক সত্যবোধ!

সমকালীন সমালোচকের পক্ষে এই অত্যাবশ্যক গুণগুলি আয়ত্ত করা শ্রমসাধ্য ব্যাপার বটে, কিন্তু দুঃসাধ্য নয়। তবে, এইসব গুণে গুণী হয়ে উঠলেও নিকট কালের অচ্ছেদ্য সংস্রব কি সর্বপ্রকারে পরিহার করা যায়? আর, সে-সংস্রব ত্যাগ করলেই কি সমসাময়িক সাহিত্যসৃষ্টির মূল্য নিরূপণ সহজ হয়?

বলা বাহুল্য, এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর হবে নেতিবাচক। এবং সেই উত্তরই সদুত্তর। সমকালীন সমালোচকরা তাহলে কি করবেন?—কি লিখবেন?—কি তাঁদের লক্ষ্য হবে?

সম্প্রতি এই লক্ষ্য নির্ধারণের চেষ্টায় অনেকেই আত্মনিয়োগ করেছেন এবং পূর্বসূরিবৃন্দও এ-বিষয়ে অনেক কথা বলেও গেছেন। ইদানীং এ-বিষয়ে যাঁরা মন্তব্য জ্ঞাপন করেছেন, তাঁদের বিচিত্র কথার মধ্যে একটি কথা বিশেষ স্মরণীয়। এই কথাটির কথকের নাম ডেভিড সেসিল। সমকালীন সাহিত্য-সমালোচকের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

> He must recognise that there is simply no question of his coming to a final judgment. He is merely recording a personal impression, incomplete, provisional, exploratory, and which he realises will certainly be modified by posterity.

সমকালীন সমালোচকের পক্ষে এই সহজ কথাটা জানা উচিত যে, চূড়ান্ত কোনো রায় দেবার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাঁর সশ্রদ্ধ এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত রুচি দিয়ে যা তাঁর মনে উঠেছে, সেই ব্যক্তিগত উপলব্ধিই তিনি প্রকাশ করবেন। তাঁর সেই উপলব্ধি উত্তরকালে পুনর্বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য। তাঁর উত্তরবর্তী পাঠকগোষ্ঠীর আদালতে তিনি এবং তাঁর আলোচিত গ্রন্থমালা একই কালে এবং কেবলই নতুন-নতুন কালে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত হবে। সাহিত্যে এক কালের পরে আর-এক কাল আসে,—তারপর আবার অন্য কাল! যে সাহিত্য একাধিক কালের খুশিতে বাঁধা পড়ে, সেই সাহিত্যই দীর্ঘায়ু। সাহিত্যের আলোচনায় 'মহাকাল' একটি বহুশ্রুত কিন্তু স্বল্প-উপলব্ধ শব্দ। ভবভূতি বলেছিলেন নিরবধি কালের কথা—আমরা তাকে কোন্ অর্থে মহাকাল বানিয়েছি? মহাকাল মানে সকল-কাল নয়। হিন্দুপুরাণে মহাকাল হলেন রুদ্র!

তিনি সংহারের দেবতা। মহাকাল আর যাই করুন, সাহিত্যের পুঁথিশালার অধ্যক্ষতা করেন না। সাহিত্য নির্গুণ সত্য নয়,—সগুণ এবং সবিকল্প। সাহিত্য দেশকালে বদ্ধমূল সাহিত্যিকের মানস লতিকার অনন্ত শূন্যচুম্বী কুসুম! এ কুসুম চিরস্থায়ী কি না, কে বলবে?

সমকালীন সাহিত্যিকদের রচনাবলীর মূল্য নির্ধারণের কাজ রসিকসাধ্য। তাঁদের বিষয়ে ভালো-মন্দ সমস্ত মন্তব্য সমালোচকের উত্তম পুরুষে প্রকাশ্য। এবং উত্তম পুরুষের সর্বনামের পিছনে কোনো ছদ্মনাম ব্যবহার করা এ-ক্ষেত্রে ভীরুতা মাত্র। নাম ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নামহীন থাকাও ভীরুতা। সকল কালের সকল সাহিত্য-পাঠককে ডেকে শোপেনহাবার এ বিষয়ে যে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন, সেই অমূল্য কথারত্নমালায় সত্যদ্রষ্টার শাসকচক্ষুর অমর দ্যুতিই বিদ্যমান! বহুবিশ্রুত এই দার্শনিক বলেছিলেন:

Above all, anonymity, that shield of all literary rascality would have to disappear.

এই মহাবাণীর বঙ্গানুবাদ কে করবেন? ছদ্মনাম কি শুধু নিরাভরণ নামান্তর গ্রহণের অভ্যাসেই দৃষ্টিগোচর? পৈতৃক নামের পুরোভাগে বৃত্তিপরিচয় এবং শেষান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপঢৌকনাবলীর সমৃদ্ধি প্রদর্শনও কি ছদ্মনামগ্রহণেরই নামান্তর নয়? বাংলা দেশের সাহিত্য-সমালোচকেরা এই দ্বিবিধ ছদ্মনামেই সু-অভ্যস্ত। আত্মনামপ্রকাশ-কুণ্ঠ অনামী এবং বেনামব্যবহারনিষ্ঠ খ্যাতনামা সমালোচকেরও অভাব নেই এদেশে। তবে, ব্যতিক্রম আছে বৈ কি! বঙ্কিমচন্দ্রও স্বনামধন্য, রবীন্দ্রনাথও একনামা; প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল'-ছদ্মনাম সত্ত্বেও স্বনামশ্রুত;—এঁদের পরে হাল-আমলে সাহস করে অন্যান্যদের মধ্যে আর একজন যিনি সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা করেন, তিনি প্র. না. বি. নন,—তাঁর নাম প্রমথনাথ বিশী। এবং এই-সূত্রে এ-কথাও মনে পড়া স্বাভাবিক যে, 'বিষ্ণু'র নামে যিনি সাহিত্যের কথা লেখেন, স্বনামে তিনিও বহুবিদিত,—তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। এঁরা প্রত্যেকেই অকুতোভয়।

স্রষ্টার পক্ষে—সমালোচকের প্রতীক্ষায়

সেদিন এক অধ্যাপক এক লেখককে বললেন :

—বেশ বড়োরকম, স্থায়ী রকম কিছু একটা লিখুন এবার।

জবাবের প্রতীক্ষায় মনে মনে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

লেখক জবাব দিলেন না। অন্য প্রসঙ্গ তুলে পাশ কাটালেন তিনি।

স্থায়ী লেখার লগ্ন না এলে অস্থায়ী লেখা দিয়েই দিন কাটাতে হয়। স্থায়ী লেখার লেখকরাও কখনো কখনো অভ্যাসের টানে,—খ্যাতির সংরক্ষণ-বাসনায়,—অধ্যবসায়ের ঝোঁকে,—অথবা, দক্ষিণার প্রত্যাশায় অস্থায়ী লেখা লিখেছেন বই কি!

স্বাধীনতার কিছু আগে থেকেই আমাদের দেশে সাহিত্যের স্রোতে অবিরত জোয়ার এসেছে! বিয়াল্লিশের আন্দোলন,—প্লাবন,—মন্বন্তর,—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,—স্বাধীনতা-লাভ,—দেশবিভাগ,—উদ্বাস্তু-সমস্যা,—বেকার-সমস্যা ইত্যাদি ব্যাপার আমাদের মনোজগতে কতো যে চিহ্ন রেখে গেল! 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর তুলনায় একালের নানা গোষ্ঠীর গদ্য-লেখকদের গল্প-উপন্যাস কেন যে কম স্থায়ী হবে, তা আমার বোধগম্য হয় না! তাঁদের শ্রম, আগ্রহ, সামর্থ্য সবই আছে। একালের নবীনদের মতন এমন বিপুল কর্মোদ্যম এর আগে ঘটেছে বলে মনে হয় না। তবু, আত্মজীবনী লিখতে-লিখতে,—পুরোনো কালের কথা ভাবতে-ভাবতে—প্রবীণদের মধ্যে কেউ কেউ একালের সাহিত্য-প্রয়াসের মধ্যে স্থায়ী সাহিত্যের অভাব লক্ষ্য করে বড়োই অতৃপ্তি বোধ করে থাকেন। অবিশ্যি, বর্তমানে অন্যান্য দেশে প্রতি মাসে, প্রতি বছরে স্থায়ী রসসাহিত্য কী পরিমাণে লেখা হচ্ছে, তা ঠিক ঠিক জানা ক'জনের পক্ষেই বা সম্ভব? মোটামুটি, পণ্ডিতদের কথা শুনেই আমাদের মতামত ঠিক করতে হয়। কালের প্রভাবে, পণ্ডিতরাও আবার এসব ক্ষেত্রে ঠিক নির্ভরযোগ্য নন। তথ্য সংগ্রহের দিকে তাঁরা যতো উন্মুখ, যথার্থ আত্মবীক্ষার দিকে ততো নিষ্ঠা নেই তাঁদের। ব্যতিক্রমের কথা অবিশ্যি সব সময়েই স্বীকার্য। কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়েই যাঁদের পথ চলতে হয়, তাঁরা জানেন যে, ফ্যাশানের প্রতাপ থেকে পণ্ডিতরাও আত্মরক্ষা করেন অনেক কষ্টে। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রীতি-পক্ষপাতের কথাও বিবেচ্য। এক দল অন্য দলের কৃতিত্ব দেখতে পারেন না। সব দলই ভিন্ন দলের দোষ দেখতে পটু। অমরকোষ অভিধানে 'বিদ্বান'-এর যে-সব প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি হোলো 'দোষজ্ঞ'। দোষের দিকে চোখ রাখতে রাখতে গুণের দিকে ক্রমশঃ যদি চোখ বুজে যায়, তাহলে আর তাঁদেরই বা উপায়ান্তর কি?

যাঁরা স্রষ্টা,—সমালোচকের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁরা কখনো কখনো বড়োই উপহাসের

কথা বলেছেন! সে-সব বাড়াবাড়ি বাদ দিয়ে হু'পক্ষের আদর্শের কথা বলতে গেলে 'দিব্যদৃষ্টির' কথা ওঠে। আঠারো শতকের ইংলণ্ডে পোপ যেমন বলেছিলেন :

স্বর্গ থেকেই নামুক আলো উভয় দলের চক্ষে
বিচার করতে এলেন যাঁরা,—যাঁরা লেখার পক্ষে!

সে যুগের আর-একজন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন ড্রাইডেন। তাঁর মনের ঝাঁজ লেগে আছে তাঁর এতদ্বিষয়ক প্রবাদতুল্য একটি উক্তিতে : 'কবির অধঃপতন থেকেই সমালোচকের অভ্যুদয়'—'the corruption of a poet is the generation of a critic.'। এই ধরনের মন্তব্যের সংখ্যা কম নয়। সব দেশেই সমালোচক আর স্রষ্টার মধ্যে এরকম কিছু কিছু কথা কাটাকাটি ঘটেছে। আমার তো মনে হয়, কালিদাস যখন লিখেছিলেন—'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্,'—তখন উপহাসকারী সমালোচকদের তিনি যে বেশ এক হাত নিতে পেরেছেন, সেকথা ভেবে বেশ খুশিই হয়েছিলেন তিনি। হয়তো, ঐ উক্তির সবটাই তাঁর অকপট বিনয় নয়। সকলেই জানেন যে, কালিদাসের 'রঘুবংশ' একখানি সমালোচকবিজয়ী কাব্য। রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজের রচনার সঙ্গেই একরকম আলাপ-আলোচনার ছদ্ম আয়োজন ঘটিয়ে জানিয়েছিলেন :

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান।
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায় বিদ্যেরত্ন পাড়ায়
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,

*   *   *

গান তা শুনি' গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে॥

আরো স্পষ্ট ভাষায় 'কর্মফল' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

পরজন্ম সত্য হলে
কি ঘটে মোর সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলা দেশের এ রাজধানী।

এবং পরজন্মে বাংলা দেশের রাজধানী কলকাতায় সমালোচক হিসেবে যদিই বা জন্মগ্রহণ করতে হয়,—তাহলে তিনি যা মনস্থ করেছিলেন, তা এই—

বল্‌ব, এসব কি পুরাতন
 আগাগোড়া ঠেক্‌চে চুরি।
মনে হচ্ছে, আমিও এমন
 লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।
আরো যে সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজচে ব্যথা
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন।

স্রষ্টা যে সৃষ্টি করতে পারেন, এইটেই তো তাঁর পক্ষে সর্বাধিক গৌরবের কথা। সমালোচকের বিরূপ বা বিরস সদুক্তি সহজে উপেক্ষা করবার সাবলীলতায় তাঁর সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হোলো তাঁর এই সৃষ্টিসামর্থ্যের অহংকার! অহংকার দিয়ে যিনি যুদ্ধ করেন, বিনয় দিয়েই তাঁকে ঠাণ্ডা করতে হয়।—এ শুভবুদ্ধির মূল্য স্বীকার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে নগদ লাভের পরিমাণ উৎসাহজনক নয়। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের পৌরাণিক বিবাদের কথা কে না জানেন?

অতএব অহংকারী সাহিত্যিককে যথার্থ বড়ো এবং স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লাগাতে হলে অন্যান্য দৈব ও মনুষ্যাধীন আয়োজনের মধ্যে অহংকারী সমালোচকের জায়গাও অবশ্যই স্বীকার্য। এবং দু'পক্ষের অহংকারই প্রকৃত রসবোধ আর শক্তির দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত! অশক্ত, অক্ষম মানুষের অহংকার অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। শক্তিমানের অহংকারই শোভন।

স্রষ্টার শক্তি দেখা দেয় তাঁর কল্পনার প্রসারে, রচনার নৈপুণ্যে। বিচারকের সামর্থ্য তাঁর যুক্তির সমৃদ্ধিতে,—যুক্তি এবং রসবোধের গভীর সম্প্রীতিতে,—এবং পরিশেষে, তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশের শিল্পে! অর্থাৎ দু'পক্ষেরই যথার্থ ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার,—পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব।

ব্যবহারিক জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা বাধা সত্বেও, যিনি জাত-লেখক তাঁর মনে থাকে লেখার আগ্রহ। এ-আগ্রহ শুধু নাম-যশের লোভ নয়,—আরো কিছু। নাম-যশের তাগিদ থেকে এর প্রথম সূত্রপাত ঘটা বিচিত্র নয়। তবে, অভিজ্ঞতার হাওয়া লাগলে এই প্রকাশের স্পৃহা উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। অতএব স্রষ্টার পক্ষে অভিজ্ঞতা বাড়ানো দরকার। মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে জগৎকে

দেখতে দেখতে আমাদের সাহিত্যিকরা নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠুন; এইটুকুই কাম্য।

'তথ্যসাহিত্য' মানে বই থেকে বইয়ের উদ্ভব,—জ্ঞান থেকে জ্ঞানের বৃদ্ধি,—তথ্য থেকে তথ্যজ্ঞানের বিন্যাস। কিন্তু 'রসসাহিত্য' তো সেরকম নয়। তার মূল উপকরণ হোলো ভাব। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশের দিকেই তার সহৃদয় প্রয়াস। হৃদয়ের প্রসন্নতা ছাড়া হৃদয়ের ভাব ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও এই প্রসন্নতা তাঁর অধিকারগত বলেই তিনি অহংকারী। সমালোচককেও এই হৃদয়বোধের সামর্থ্যটুকু অর্জন করতে হবে। শুধু লেখাপড়ার অহংকার থাকাটাই যথেষ্ট নয়। স্রষ্টার অমরতার রহস্য বোঝবার জন্যেই হৃদয়বোধের চর্চা দরকার। ১৩৩৫ সালে 'শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনী'র একাদশ অধিবেশনের সভাপতি প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন—'গত ১৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরাজের রাজ্য, আমাদের কর্মজীবন এখন ইংরাজ-রাজের প্রবর্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতে বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ড প্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরি নাম সাহিত্যে অমরতা। আর এ-ক্ষেত্রে সমালোচনার কাজ লৌকিক নিন্দা-প্রশংসা নয়,—এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু তা করতে হলে, মনকে আগে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হয়। কিন্তু দুর্বিনীত সাহিত্যে রাগই পুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য।'

সেদিন সেই লেখকটি উঠে যাবার পরে এই মন্তব্য শুনিয়ে অধ্যাপক একটু হাসলেন। হেসে বললেন: 'ভাগ্যিস আমি লেখক নই, মশাই। লেখক হলে ওঁকে শুধু ওঁর লেখার প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই শোনাতে পারতাম না।'

সাহিত্যে অমরতা সম্বন্ধে চৌধুরী মশাই যা বলেছেন, সেকথা শুধু ভারতচন্দ্র কেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তবে, ভারতচন্দ্রের কথা একালের সাহিত্যিকদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থার সূত্রেও তুলনীয়। দ্বারকানাথ বসুর এবং দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনার ওপর নির্ভর করে প্রমথবাবু ভারতচন্দ্রের জীবনীর খসড়া তৈরী করেছিলেন, তাতে ১১ বছর বয়স থেকে ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যুকাল অবধি তিনি কতো যে নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে। প্রমথ চৌধুরী সংক্ষেপে বলেছিলেন, 'ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়িতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন ত দূরের কথা শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট যেতে প্রস্তুত

নই; এবং চল্লিশটাকা মাস মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক, আমরা কেউ মাসিক পত্রের এডিটারি করতেও প্রস্তুত নই। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যারা কবিতা লিখত তারা সব দাঁতে হীরে ঘষত আর তাদের ঘরে রুইমাছ ও পালং শাক ভারে ভারে আসত।'

আরো অনেক কথার মধ্যে Shakespeare, Cervantes ও ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভারতচন্দ্রের বীরত্বের তিনি প্রশংসা করেছিলেন! ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখের বাধা কাটিয়ে উঠেছিলেন ভারতচন্দ্র। স্রষ্টা সাহিত্যিকের আনন্দের আর সার্থকতার আসল কারণ যে কোথায়,—তা তিনি এই ভাবে লিখে গেছেন,—অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরী এ-লেখার সেই ব্যাখ্যাই ধরেছেন :

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত, সেই সদা দুখী॥

বাংলায় রসসাহিত্য লিখে, অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস-কবিতা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখে এখন যাঁরা খ্যাতি পাচ্ছেন, তাঁদের গৌরবে দেশের পাঠকরা গৌরবান্বিত, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশে বেশিদিন সৎ সমালোচকের অভাব থেকে যাওয়াটা আমাদের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। এখনকার এই ভাবনার ভূমিকা মনে রেখে যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে এই কথাটি ভেবে দেখা দরকার।

সাহিত্যিকরা সব দেশেই দলচর বলে প্রসিদ্ধ। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। 'সোমপ্রকাশ' এবং 'বঙ্গদর্শন'-এর আমল থেকে একালের 'সবুজ পত্র', 'কল্লোল', 'শনিবারের চিঠি', 'কবিতা' প্রভৃতি কাগজের গোষ্ঠীভেদের কথা না জানেন, এমন সাহিত্যরসিক বাঙালী নেই। তারপর, গত সাত-আট বছরের মধ্যে, বরং তার কিছু আগে থেকেই যথার্থ সাহিত্যগত দলের ভাবনা ভেঙে গেছে। বর্তমানে সাহিত্যের দাম যাচাই-এর দায়িত্ব পড়েছে পাঠক-সাধারণের ওপর। সব পাঠক বই কিনে পড়তে পারেন না। গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ কতকটা পাঠকদের রুচির নির্দেশ অনুসারে, কতকটা সাময়িক পত্রের সমালোচনা এবং বিজ্ঞাপন দেখেই বই কিনে থাকেন। ফলে, বিজ্ঞাপন এখন মাঝারি লেখকদের সাহিত্য-চর্চার উৎসাহ দিচ্ছে; সাময়িক সাহিত্যের যথার্থ সমালোচনা প্রায় নিশ্চিহ্ন; এবং বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে,—'কল্লোল'-গোষ্ঠীর পরিশ্রমী কয়েকজন লেখকের এবং তাঁদের সমসাময়িক অন্যদলীয় দু'চারজনের প্রৌঢ়ত্ব-সঞ্চারের সঙ্গে-সঙ্গে, কেমন-যেন নিরঙ্কুশ, অভিভাবকহীন, অতি-প্রগল্‌ভ এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। বৃদ্ধেরা যাই বলুন, এ লক্ষণ কিন্তু অবিমিশ্র নিন্দার সামগ্রী নয়। এতে যৌবনের প্রাচুর্য আছে।

তবে, নিয়ন্ত্রণের কথাটাও তুচ্ছ নয়। এ-অবস্থায়, রাগ-দ্বেষহীন রসিক সাহিত্যবোদ্ধার সংঘ গড়ে তুলতে আমাদের নবগঠিত সাহিত্য-আকাদেমি কি সমর্থ হবেন? দুর্দম দামোদর বেঁধে দেশে যেমন চাষের জমির আয়তন বাড়ানো হোলো, তেমনি স্থায়ী সাহিত্যের সম্ভাবনা বাড়াতে হলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় আমরা অন্ততঃ রাগ-দ্বেষহীন কিছু কিছু সমালোচকের কাজের পথ সুগম করতে পারি কি না, সে বিষয়ে সাহিত্য-ব্যবসায়ী প্রকাশক-পরিচালক মহলের চিন্তা দেখা দিলে ভালো হয়। শুধু অতীত কীর্তির গবেষণাময় প্রবন্ধ নয়,—যা এখন লেখা হচ্ছে, যা আমাদের গল্প, উপন্যাস, রম্যকথা এবং কবিতার ভাণ্ডারে নগদ জমা হচ্ছে, সেই লেনদেনের হিসেব রাখবার জন্যেই সাহিত্যের-দেশ বাংলাদেশে এবার একটি সর্বমান্য পাঠকসংঘ গডে ওঠা দরকার!

কিন্তু সে কি সম্ভব হবে? কোনো দেশে তা কি সম্ভব হয়েছে? পুজোর মরশুমে আবার একবার সাহিত্যের ফসল ফলবে। 'বার্ষিকী',—'বিশেষ সংখ্যা', 'বিশেষ সংকলন' ইত্যাদির অতি-বর্ষণের আগে এই অব্যবহারিক পরিকল্পনার কথা মনে জাগবার দু'একদিন পরেই সেই অধ্যাপকের সঙ্গে আবার দেখা হোলো।

সব শুনে তিনি বললেন, ওসব সংঘে আর সাধারণতন্ত্রে কিছু হবে না, মশাই। ব্যক্তিকেই লোকে মানে; সংঘকে ভয় করে, ফাঁকি দেয়, উপেক্ষা করে।

আমি বললাম,—সে কি কথা? ফাঁকি দিতে হলে ব্যক্তিকে ফাঁকি দেওয়াই সহজ। সংঘকে ফাঁকি দেওয়া দুরূহ।

তিনি বললেন,—তা মানি, কিন্তু সংঘের চরিত্র তো ব্যক্তি সমষ্টির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ এবং কর্মশক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়! প্রবল ব্যক্তিই হবেন সংঘের নায়ক। সংঘের সান্ত্বনা থাক্ রাজনীতির রাজ্যে! সাহিত্য-সংঘ করে বলশালী সাহিত্যিককে কে রুখবে? আসরে একটি বঙ্কিমচন্দ্র এলেই সর্বপ্লাবী জ্যোৎস্না ফোটে,—একটি রবীন্দ্রনাথ এলেই সর্বজয়ী সূর্যালোক আসে।

আমি বললাম,—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। একনায়কত্বের দিন শেষ হয়েছে। 'বহুশক্তিশালী অল্পসংখ্যকের' বদলে এখন 'অল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক' লেখক দেখা দিয়েছেন। গদ্যে-পদ্যে কী প্রগল্‌ভ এই নবযুগ!

পরিহাসের হাসি হেসে তিনি বললেন,—যেমন 'প্রগতি'-যুগ, 'কল্লোল'-যুগ, 'পরিচয়'-যুগ। দেশে সমালোচক নেই বলেই 'যুগ' কথাটা এতো চালু হয়েছে, মশাই!

আমার মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল কিনা জানি না। হঠাৎ সন্ত্রস্ত বোধ করে তিনি বললেন,—এই দেখুন, কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেললুম,—আপনি রাগ করলেন নাকি? আপনার লেখা আমার খুবই ভালো লাগে। আমি শুধু এই বলছিলুম যে, নিন্দক,

তোষক আর অহংকারী অক্ষমের হাত থেকে,—ব্যবসায়ী গবেষকের হাত থেকে, আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা এবার সত্যিকার স্রষ্টার হাতে আসুক।

এরকম অদ্ভুত, অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে নিজের লেখার এ-ধরনের প্রশংসা শুনে কার না বিরক্তি দেখা দেয়!

আমি আমার হাত-ঘড়ির দিকে বার-বার দৃষ্টিক্ষেপ করছি দেখে তিনি উঠে পড়লেন। যাবার আগে বললেন,—'আজ যা বললুম আপনাকে,—সবই হোলো গিয়ে সমালোচকের পক্ষে! কথার চটক, অনুকরণের রকমফের, দলের বিজ্ঞাপন এবং রসের বিকার থেকে সাহিত্যকে যাঁরা সত্যিই মুক্তি দিতে পারেন, নিজেরা গল্প-উপন্যাস-কবিতা না লিখলেও যাঁরা এসবের দরদ বোঝেন,—স্রষ্টার প্রতীক্ষাতেই যাঁদের বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা থাকে চিরনিষ্ঠ, সেই সমালোচকের পক্ষেই আমার যা কিছু বক্তব্য। নিন্দা, ব্যাজস্তুতি আর অন্যায় প্রশংসার চলতি রেওয়াজ ছেড়ে আমাদের দেশে চলতি সাহিত্যের স্থায়ী সমালোচনা দেখা দিক্।' এই বলেই তিনি উঠলেন।

কথার শেষ সিঁড়িতে পৌঁছে দেবার ভঙ্গিতে আমি স্পষ্ট করে জিগেস করলুম,—তাহলে আমাদের বর্তমান সাহিত্য-জগতের আলোচনায় আপনি হলেন সমালোচকের পক্ষে, এবং স্রষ্টার প্রতীক্ষায়?

অধ্যাপক বললেন,—স্রষ্টার পক্ষে, সমালোচকের প্রতীক্ষায়!

লেখক ও পাঠক

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'ত্রিবেণী' বইখানির শেষ কবিতা 'অবসান'-এর মধ্যে পাঠক-সমাজকে সম্বোধন করে বলেছিলেন:

করেছি কর্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা
করেছি অন্যায় যাহা সেইটুকুই খরচ দিও বাদ
তোমাদিগে যেটুকু দিয়েছি দুঃখ কোরো ভাই ক্ষমা
তোমাদিগে যেটুকু দিয়েছি সুখ কোরো আশীর্বাদ।

কিন্তু সব পাঠকও সেভাবে লেখকসমাজকে গ্রহণ করেন না, সব লেখকও নিজেদের এই সীমাটুকু বুঝতে চান না। সাহিত্যের সমালোচনা সেই কারণেই কখনো কখনো বড়ো অশান্তির জিনিস হয়ে ওঠে। এই দু'পক্ষের মধ্যে যাঁরা পরস্পরের দায়িত্ব যথাযথভাবে বুঝতে বিমুখ নন, তাঁরাই পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারেন। সমালোচক নিজেও একজন পাঠক। পাঠক হিসেবে তাঁর অধিকারের সীমা যতো প্রসারিত হয়, তাঁর সমালোচনার সামর্থ্যও ততোই বাড়তে থাকে।

উভয় পক্ষেরই মনের ঔদার্য দরকার। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কথা মনে পড়ে।

মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর সেকালের অনাদরের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু 'চিন্তাকুসুম'-এর মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতচিন্তা' প্রকাশিত হতে দেখে, সেই প্রবন্ধগুলি পড়ে তিনি চার স্তবকের যে কবিতাটি লিখেছিলেন তারই চতুর্থ স্তবকে বেশ আবেগের সঙ্গেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল :

দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষা বলে কোন্ জন
যেখানে এ রত্ন আছে কোথা লাগে তার কাছে
কুবেরের ধনাগার—অতুল ধরায় ?
অতুল সে কবিবর নিরুপম চিত্রকর
চিত্রিত 'নীরব কবি' যার তুলিকায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতা যাঁর ভালো লাগেনি,—কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতচিন্তা' প্রবন্ধ পড়ে সেই লেখাকেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করতে তাঁর যে বাধেনি, একালে সে হয়তো প্রত্যাশিত ব্যাপার বলেই ভেবে নেওয়া যেতে পাবে, কিন্তু সেকালের শান্তস্বভাব কোনো সৎ পাঠকের পক্ষে কাব্যবিশারদের সমালোচনার আদর্শ ব্যক্তিগত ভাবাবেগে কতকটা যে অতি-সংকুচিত মনে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল,—আজ সে কথা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

ব্যক্তিগত আবেগ থাকলেই সেটা যে দোষ বলে গণ্য হবে, সে-কথা নয়। তবে লেখার ওপরেই ব্যক্তিগত আবেগের প্রকৃতি নির্ভর করা উচিত,—লেখকের নাম-ধাম দেখে সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশের উত্তেজনা জাগলে, সেটা দমন করাই বোধ হয় সুবিবেচনা। এই সূত্রে আর-এক কথা মনে পড়ে। ১০ই পৌষ ১৩৩৪ তারিখের 'পত্র' থেকে মণিবজ্র ভারতীর এই গল্পটিও মনে রাখবার মতন :

'সেটা সমাজপতি-সাহিত্যের যুগ।

'সাহিত্য' কাগজখানির পিছনের কয়েক পাতায় মাসিক সাহিত্যের জনসোনিয়ান সমালোচনা থাকতো।

সমাজপতি সুখ্যাতি করলে তাকে আকাশে তুলতেন আর নিন্দা করলে তাকে জাহান্নমে পাঠাতেন। লেখকদের দুর্ভাগ্যবশে নিন্দাটাই বেশি থাকতো।

...এই কঠিন সমালোচনার ভয়ে অনেক নূতন লেখক রণে ভঙ্গ দিতেন।

এর উপায় বোধ করি, রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকে প্রথম বার হোলো।

'ভারতী' আর 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনের সময় তিনি লেখার উপর কি নিচে থেকে লেখকদের নাম তুলে দিয়ে কাগজের প্রচ্ছদে লিখে দিতেন, এই সংখ্যার লেখক অমুক অমুক।

বছরের শেষে কে কি লিখেছেন তা সূচীপত্র থেকে জানা যেতো।

এর ফল ভালই দাঁড়িয়েছিল। ছিদ্রান্বেষণ করে তীব্র সমালোচনা বার করা মুস্কিল হোতো।'

এই ঘটনার আরো কয়েক বছর আগেকার ঘটনা : 'কৃষ্ণচরিত্র' ছাপা হয়ে বেরিয়েছে তখন। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যামবাবুর জামাতা কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচকড়িকে খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি জিগেস করেছিলেন—'কৃষ্ণচরিত্র পড়ে তুমি কি বুঝেছ?'

পাঁচকড়ির নিজের লেখা থেকেই এই-কাহিনীর শেষটুকু এখানে স্মরণ করা যেতে পারে :

'আমি মস্তক অবনত করিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিলাম,—'পাওনীয়রে দেখেছেন ত কান্দাহারে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে, সে কৃষ্ণ পোষাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি পাঠান,—পাঠানের আব্বাজাব্বা পরা, পাঠানী পাগড়ীর উপর ময়ূর-পাখা আঁটা, যেমন জন্ম, যেমন কর্ম, যেমন সংসার, কৃষ্ণও তেমনি ফুটিয়াছে।'

এইটুকু বলিয়া আমি নীরব হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।'

সত্যিকার সমর্থ লেখকের প্রত্যয় যে কটু বা তীব্র সমালোচনাতেও তিল-মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, এ-ঘটনা সেই সাধারণ সত্যেরই আর এক উদাহরণ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রবন্ধ

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ছিলেন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইন্দ্রনাথের আনুকূল্যে এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের উৎসাহে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'তে জানিয়েছেন যে, 'তিনি ইং ১৮৯২ সনে (?) 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেন।' 'বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ'-এর ছাপা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে ১৮৯৫-এর শেষাশেষিই তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৮৯৬-এর ৬ই আগস্ট ভাগলপুরে 'টী-এন-জুবিলী কলেজিয়েট ছাত্রবৃন্দ' তাঁকে যে বিদায় অভিনন্দন দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার প্রথমদিকে, পাদটীকার মধ্যে তারই একটু অংশ ছেপে দেওয়া হয়েছে।

ভাগলপুরের ছাত্রদল তাঁদের শিক্ষক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এই বলে শোক প্রকাশ করেছিলেন যে—

'গিয়েছিলে দেব নয় মাস তরে
আশা ছিল প্রাণে ইহা,
হেরিব চরণ, কিন্তু আজি হায়
ভাসিয়া ডুবিল তাহা।'

আঠারো শ' ছেষট্টি খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের কুড়ি তারিখে, ভাগলপুর শহরেই পাঁচকড়ির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। চব্বিশ পরগনার হালি-শহরেতেই তাঁদের নিবাস ছিল বটে, তবে বেণীমাধব যেহেতু ভাগলপুরে কালেক্টরী আপিসের কেরানি ছিলেন, সেজন্যে পাঁচকড়ির বাল্যজীবন কেটেছিল সেই ভাগলপুরেই। আঠারো শ' বিরাশি-তে ভাগলপুর জেলা ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার তিন বছর পরে পাটনা কলেজ থেকে তিনি 'ফার্ষ্ট আর্টস্' পাশ করেন এবং তারপর আঠারো শ' সাতাশি খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত 'অনার্স' নিয়ে বি-এ পাশ করেন। সেই বছরেই ভূধর চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক 'ধর্মপ্রচারক' নামে এক ধর্মালোচনার পত্রিকা প্রকাশ করেন। পাঁচকড়ির প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল সেই আমলেই। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি সমাজচিন্তাশীল লেখকদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের 'ভারতবর্ষীয় আর্যধর্মপ্রচারিণী সভা' এবং 'সুনীতিসঞ্চারিণী সভা'র জন্যে পাঁচকড়ি যে খুবই পরিশ্রম করেছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ সে-কথাও বলে গেছেন। কলেজ ছাড়বার পরে তিনি যে কিছুদিন ভাগলপুর কলেজের ইস্কুলে শিক্ষকের কাজ করেন, সে-কথাও বলা হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর প্রকৃতি বিশ্লেষণের ফলে তাঁর প্রধান যে তিন-রকম প্রবণতা চোখে পড়া স্বাভাবিক; ইতিমধ্যে সেই তিনটি দিকের কথাই বলা গেল। প্রথমতঃ তাঁর প্রচারকর্ম,—দ্বিতীয়তঃ তাঁর শিক্ষাবৃত্তি—এবং তৃতীয়তঃ তাঁর সংস্কৃত-শিক্ষা। তাঁর মানস-প্রকৃতির এই তিনটি অভিমুখিতার ফল ফলেছিল তাঁর সাহিত্যকর্মে। বি-এতে সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে 'সাম্মানিক' পাঠ তো তিনি নিয়েইছিলেন,—তা'ছাড়া বি-এ পাশ করবার অল্পদিন পরেই কাশীর সংস্কৃত-সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধিও পেয়েছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ সে-কথাও জানাতে ভোলেন নি। আর, ইংরেজিতেও পাঁচকড়ি যে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন, তার নজীর দেখাতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ তেরো শ' কুড়ি সালের পৌষ সংখ্যায় 'বঙ্গবাণী' থেকে পঞ্চানন তর্করত্নের একটি লেখা স্মরণ করে গেছেন। পঞ্চানন লিখেছিলেন: 'বঙ্গ-সাহিত্যসিংহ অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার সমক্ষে ও পাঁচকড়ির

অসাক্ষাতে পাঁচকড়িবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত তদানীন্তন দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র 'টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু ছিলেন।' শুধু তাই নয়,—'সে সময়ে 'বঙ্গবাসী'র সর্বস্ব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁহাকে সর্বগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া মনে করিতেন।'

প্রথমে কংগ্রেস-বিরোধী 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার,—তারপর সে-পত্রিকা ছেড়ে কংগ্রেস-সমর্থক 'বসুমতী' সাপ্তাহিকেরও সম্পাদক হয়েছিলেন পাঁচকড়ি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁকে এই দ্বিতীয় নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তার দু'বছর পরে উনিশ শ' এক খ্রীষ্টাব্দের পয়লা মার্চ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রবর্তিত 'রঙ্গালয়' বের হয়। পাঁচকড়ি 'বসুমতী' ছেড়ে তখন 'রঙ্গালয়' পত্রিকায় যোগ দেন। উনিশ শ' আট খ্রীষ্টাব্দে তিনি দৈনিক 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন। আরো চোদ্দ বছর পরে উনিশ শ' বাইশের জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকায় তিনি লিখতে শুরু করেন। আঠারো শ' পঁচানব্বই খ্রীষ্টাব্দে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সেই প্রসিদ্ধ বন্ধু সুরেশ সমাজপতির মৃত্যুর পরে, ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা থেকেই তিনি 'সাহিত্য' সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। 'স্বরাজ' পত্রিকায় যোগ দেবার প্রায় চার বছর আগে,—উনিশ শ' আঠারো খ্রীষ্টাব্দের পয়লা অক্টোবর তিনি সরকারী 'পাবলিসিটি বোর্ড'-এর বাংলা-অনুবাদক নিযুক্ত হন। সেই সরকারী নিয়োগ ঘটবার দশ-পনেরো বছর আগে, স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক 'সন্ধ্যা'তেও তিনি লিখতেন। হিন্দী দৈনিক 'ভারতমিত্র'ও কিছুদিন তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এইসব পত্র-পত্রিকা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকখানি পত্রিকার যোগ ছিল। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ সে-সব পত্রিকারও নাম করে গেছেন—এবং তাঁর সংবাদিক জীবনের এইসব সংস্পর্শের তালিকা পরিবেষণের পরে, খুবই সংগতভাবে, তেরো শ' তিরিশ সালের পৌষ-সংখ্যায় 'মানসী ও মর্মবাণী' থেকে তিনি মন্মথনাথ ঘোষের এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছিলেন:

> 'পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ জানান হয়, তাঁহার মতস্থৈর্য ছিল না। বাস্তবিক আজ তিনি কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে একপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন।...
>
> পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তাহা এই যে তিনি সম্পাদকীয় লেখনী সময়ে সময়ে এরূপ অসংযতভাবে ব্যবহার করিতেন যে, তাহাতে অনেকে মর্মাহত হইতেন।...'

তাঁর রাজনৈতিক মতামতের অসংগতি সম্বন্ধে এই রকম অভিযোগের জবাবে তিনি নিজে নাকি এই বলতেন যে, দারিদ্র্যের জন্যেই তিনি নিজস্ব কোনো মত পোষণ করতে পারেন নি! আর, অসংযত মন্তব্য প্রয়োগের জন্যে মামলা উঠলে তিনি অভিযোগকারীর অভাব দেখে আন্তরিক পরিতাপ প্রকাশ করতেন!

তাঁর সম্বন্ধে এইসব তথ্য দেখলে এ-কথা মানতেই হয় যে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের একজন অসাধারণ লেখক ছিলেন। এই অসাধারণ লেখক সম্বন্ধে বাংলার আর একজন অসাধারণ সাহিত্যিকের প্রবল অনুরাগের কথাও সুবিদিত। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র তাঁর কথা অনেকবার, অনেক জায়গায় বলে গেছেন। শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' যে-বছর প্রথম বই হয়ে বেরোয়, সেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের পনেরোই নভেম্বর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সাতান্নো বছর।

তাঁর প্রকাশিত বইয়ের তালিকা মোটেই বড়ো নয়, কিন্তু সাহিত্যপরিষদ্-সংস্করণ 'রচনাবলী' ছাপা হবার আগে পর্যন্ত নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেটা তুচ্ছ নয়। ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী', এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের একখানি সংস্করণ (বসুমতী)—তাঁর এই দুখানি বই-ই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯০১-এ বেরিয়েছিল 'উমা' (গৃহচিত্র)), তারপর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'রূপলহরী'। ১৯০৯-এ 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। সরকার সে-বইখানি বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯১৫-তে বের হয় 'বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়'! তাতে তিনি বর্তমান শতাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গের বর্ণনা করেন। ১৯১৯-২০ সালে যথাক্রমে পর-পর তাঁর দু'খানি উপন্যাস 'সাধের বউ' এবং 'দরিয়া' ছাপা হয়।

উপন্যাস, অনুবাদ-রচনা এবং অন্যান্য লেখার প্রসঙ্গ উহ্য রেখে,—কেবল তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধের আলোচনা করতে গেলেও প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর জীবনের সেই তিনটি অভিমুখিতার কথা। প্রথম যৌবনেই তিনি প্রচার-কর্মে মন দিয়েছিলেন,—অল্প কিছুদিনের জন্যে শিক্ষক-জীবনও যাপন করেছেন তিনি,—আর, সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর বেশ আগ্রহ ছিল। উত্তরকালে সাংবাদিক জীবনই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। এইসব অবস্থা-গুণে এবং এইসব ঘটনাচক্রে পড়ে তাঁর ভেতরকার সাহিত্য-রসিক, সাহিত্য-সাধক মনটি যে নানাভাবে এবং নানা অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এবং তাঁর রচনাবলীর ভূমিকাতে সম্পাদকরা যা বলেছেন, সে-মন্তব্যও ভাববার কথা। ভূমিকার সেই কথাটি এই :

'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থায়ী সাহিত্যকীর্তি যৎকিঞ্চিৎ, দুই একখানি উপন্যাস

বা দুই চারিটি কথাচিত্র। ইহাই মাত্র সম্বল হইলে তাঁহাকে স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইত না। বাংলা সংবাদপত্রের ত্বরিত-ভঙ্গুর পৃষ্ঠায় একান্ত সাময়িক প্রয়োজনে তিনি সাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাসম্ভব একত্র দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহার এতকাল পরে হইবে, তিনিই পরিতাপ ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করিবেন শিল্পীর কি বিচিত্র শক্তি দৈনন্দিন সামান্য কাঠকাটা-জলতোলার কাজে ব্যয়িত হইয়াছে, মূল্যবান কাঠখোদাই শিল্পমূর্তি হেঁসেলের চুলায় কিভাবে দগ্ধ হইয়াছে।'

বাংলা এবং বাঙালীর বিষয়ে তাঁর অনেক অনুসন্ধান এবং চিন্তার নজীর আছে তাঁর অনেকগুলি লেখাতে। 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা', 'বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি' ইত্যাদি 'বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয়' সম্পর্কিত লেখাগুলি এদিক থেকে স্মরণীয়। আবার 'বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়' নামে সুদীর্ঘ লেখাটির মধ্যে বাঙালী প্রকৃতিতে জৈন, বৌদ্ধ, সহজিয়া ইত্যাদি নানামতের সমন্বয়ের কথাও তিনি বলে গেছেন। ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর সমাজ বিন্যাস' সম্পর্কিত নিবন্ধগুলিতে তিনি এই বাঙ্গালী জীবনের কথা ভাবতে-ভাবতেই সাহিত্যের সমালোচনারীতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের আশা এবং আদর্শের কথা বলেছিলেন। তাঁর সে-কথাও এখানে অবান্তর নয়। তিনি বলেছিলেন :

'আমার বড় সাধ যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত যুবজন Scientific method বা ন্যায়ানুগত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আদিম ও মধ্যযুগের বাঙ্গালী মহাকাব্যসকলের analysis বা বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতার পরিচায়ক সামাজিক ইতিহাসের বেদী সৃষ্টি করেন। তাই শুধু অনুসন্ধিৎসা যোগাইবার উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছি যে, কোন্ মহাকাব্যের আলোচনা করিলে সমাজের কোন্ চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পরে যদি বিধাতা অবসর সৃষ্টি করিয়া দেন ত ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঙ্গল, এই তিন প্রধান ধারার মাঙ্গলিক মহাকাব্য সকলের বিশ্লেষণ করিয়া আমার উক্তি সকলের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।'

সমাজের বিভিন্ন স্তর এবং বিচিত্র আশা-নৈরাশ্যের পরিবর্তনশীল, বৃহৎ পটের কথা মনে রেখে,—সেই ভূমিকার সঙ্গে দেশের সাহিত্যধারার যোগটি উপলব্ধি করবার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু নানা কাজে তাঁকে সব সময়েই ব্যস্ত থাকতে হোতো। তাই ধারাবাহিক ভাবে—অথবা সম্পূর্ণভাবে এ-কাজ সম্পন্ন করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে, বিচ্ছিন্নভাবে সে-কাজ তিনি করে গেছেন। বাংলা চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের বিষয়ে তাঁর আলোচনার কথা এইসূত্রে মনে পড়ে। আবার তাঁদের

ব্যবহৃত 'সন্ধ্যাভাষা' সম্বন্ধেও পাঁচকড়ির নিজস্ব ধারণার কথা মনে পড়ে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—'সহজিয়া ধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যাভাষায় লেখা। সন্ধ্যাভাষা মানে, আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না, অর্থাৎ এই সকল উচ্চ অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়।' পাঁচকড়ি সে-ধারণার প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন—'ভাগলপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, সাঁওতাল পরগনা এবং বীরভূমের পশ্চিমাংশ, এই ভূ-ভাগকে সন্ধ্যা দেশ কহে, অর্থাৎ ইহা আর্যাবর্ত এবং বঙ্গদেশের সন্ধিস্থলে অবস্থিত; এই প্রদেশের ভাষাকেও সন্ধ্যাভাষা কহে। শাস্ত্রী মহাশয় যদি ভাগলপুরের ছেকাছেকি নামক প্রচলিত ভাষা জানিতেন, এ-পারে রাজমোহন, ও-পারে কাড়াকাণ্ড নগরের ভাষা জানিতেন, পঞ্চকোট হইতে হেতমপুর পর্যন্ত যে সকল নানা বিভাষা প্রচলিত, তাহার যদি পরিচয় তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে তিনি স্পষ্টই বুঝিতেন যে সিদ্ধাচার্যগণের অবলম্বিত দোহা পদসকলের ভাষা এই দেশেরই সন্ধ্যাভাষা বা বিভাষা।…তবে, সিদ্ধাচার্যগণের রচিত সকল দোহা ও পদ যে ঐ হিসাবের সন্ধ্যাভাষায় লিখিত, ইহা বলা চলে না।' শুধু তাই নয়, পাঁচকড়ি একথাও বলেছিলেন যে—'এই সন্ধ্যাভাষা একটু পূর্বদিকে ঢলিয়া পড়িয়া বাঙ্গালার আলোক পাইয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা হইয়াছে, তাহার পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাবে ইহা খাঁটি বাঙ্গালী ভাষার আকার ধারণ করিয়াছে।' এই ধরনের আলোচনাতে পাঁচকড়ির খুবই ঝোঁক ছিল।

তবে এ-সব ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য-বিচারের সামর্থ্যের কথা ওঠে না। এতে তাঁর ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান, ইতিহাসবোধ এবং ভূগোলবোধ, ঐতিহাসিক সন্ধান ইত্যাদি ব্যাপারই ধরা পড়ে। সহজমতের তিনটি পন্থা অবধূতী, চণ্ডালী এবং ডোম্বী বা বাঙ্গালীর কথা তুলে তিনি তাঁর আলোচনার মধ্যে যখন বলেছিলেন যে 'দেশবাসী বাঙ্গালী—বঙ্গ-দেশবাসী বাঙ্গালী, এমন পরিচয় মোগল-পাঠানের যুদ্ধের পূর্বে পাই নাই,'—'ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসীই বাঙ্গালী বা ডোম্বী সাধন করিলে বাঙ্গালী নাম ধরিত'—'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়ের অধিবাসী ব্রাহ্মণের শ্লাঘার কথা আছে,…পরন্তু পঞ্চকোট হইতে শ্রীহট্ট পর্যন্ত ব্যাপ্ত যে বাঙ্গালা, তাহার অধিবাসীবর্গের নাম বাঙ্গালী, এমন প্রয়োগ মোগল আমলের পূর্বে কোন কাগজপত্রে বা পুঁথিতে তেমন স্পষ্টভাবে পাই নাই'—ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তখন এই সবের মধ্য দিয়ে প্রধানতঃ তাঁর তথ্যসন্ধানী মনটিরই পরিচয় পাওয়া গেছে। এবং এই সব উল্লেখের পরেই তিনি সেখানে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—'বৌদ্ধধর্ম, সিদ্ধাচার্যগণের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা, সহজ মতের বিশিষ্টতা, বাঙ্গালী ও ডোম্বী সাধনা বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশীয় জাতিসকলকে

ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে ; মনে হয়, এই বিশিষ্টতাকে চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আদিশূর কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ indent বা আমদানি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার ফলে এবং পরে বঙ্গদেশের সকল প্রদেশে ব্রাহ্মণ জমিদার ও ভৌমিক প্রধান হওয়াতে একটা ব্রাহ্মণ veneer বা পালিশ বাঙ্গালী সমাজ পাইয়াছিল বটে, পরন্তু মাঝে মাঝে সে পালিশ কাটাইয়া সহজমত নিত্য-নূতন আকারে প্রকট হইয়াছিল, এখনও হইতেছে—পরেও হইবে। সরোরুহ বা সরহ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।'

তাঁর এ-কথাও সাহিত্যতত্ত্বকথা নয়। আবার, যেখানে তিনি 'পুরাণ' শব্দের পারিভাষিক অর্থের আলোচনাসূত্রে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত—পুরাণের এই পঞ্চ-লক্ষণের উল্লেখ করে,—পুরাণ-কথাকে কেন 'কান্তাবাণী' বলা হয়,—অথবা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে পুরাণের শ্রেণীগত পার্থক্য কি কি ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন, তাঁর সেই 'পৌরাণিকী কথা'-ও যথার্থ সাহিত্য আস্বাদনের নমুনা নয়। ১৩২১ সালের 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর এই লেখা প্রথম ছাপা হয়েছিল। সেকালে এই ধরনের ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্বঘেঁষা সাহিত্য-আলোচনার বেশ প্রচলন ছিল। পাঁচকড়ি সেই ধারাতেই তাঁর এই লেখাগুলি লিখে গেছেন। তাঁর 'গতি ও স্থিতি' ('নারায়ণ', শ্রাবণ ১৩২২), 'শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব' (ঐ, কার্তিক, ১৩২২), 'নববর্ষ' (ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩২২) ইত্যাদি লেখাগুলিও একই পর্যায়ে পড়বার মতন। তাঁর বাংলা ও বাঙালী জীবন সম্পর্কিত লেখাগুলির সঙ্গেই 'বঙ্গের ভাস্কর্য' ('সাহিত্য', কার্তিক ১৩১৯) প্রবন্ধটি এক শ্রেণীতে জায়গা পাবে। তাঁর 'উপাসনাতত্ত্ব' ('সাহিত্য', কার্তিক ১৩১০) বা 'শারদীয়া পূজা'-ও ('সাহিত্য' কার্তিক ১৩২০) সাহিত্য-আলোচনা নয়। কিন্তু 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' ('নারায়ণ' বৈশাখ ১৩২২), 'নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান' ('সাহিত্য' মাঘ ১৩১৫), 'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' ('সাহিত্য' বৈশাখ ১৩১৮), 'দুইটি গান' ('সাহিত্য' পৌষ ১৩১৯), 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' ('সাহিত্য' আষাঢ়, ১৩২০) ইত্যাদি লেখাগুলির মধ্যে সাহিত্য আস্বাদনের কথা আছে,—তাঁর সাহিত্যরসিক অন্য এক মনের প্রচ্ছন্ন আত্মকথা আছে। আবার, 'আশা-পথে' ('প্রবাহিণী' ১৭ ফাল্গুন, ১৩২১), 'আমার কথা' (ঐ, ২৮ অগ্রহায়ণ ২৩২১), 'আমার সাধ' (ঐ ৬ই পৌষ, ১৩২১) ইত্যাদি আর এক-জাতের প্রবন্ধ। এই শেষের লেখাগুলিতে তাঁর কলমে যে রম্য-রচনার ভঙ্গি দেখা দিয়েছিল, সেটা বঙ্কিমী ঢঙে হলেও ইন্দ্রনাথেরই কাছাকাছি। কিন্তু আপাততঃ সে কথা থাক্‌। তাঁর সাহিত্য-প্রবন্ধগুলির কথাই এখানে প্রধানতঃ বিবেচ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' প্রবন্ধে পাঁচকড়ি আদিতেই বলে নিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

প্রথমদিকের উপন্যাস ক'খানিতে 'কাব্যসৃষ্টি, ভাবসৃষ্টি এবং রসের সৃষ্টি'তেই মন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্বে, তিনি গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে স্পষ্টই বলেছিলেন যে, অনুশীলনতত্ত্ব—একটা 'কল' করে বুঝিয়ে দেওয়াই নাকি তাঁর অভিপ্রায় ছিল! পাঁচকড়ি বলেছেন—'সে কল তাঁহার শেষের তিনখানি উপন্যাস। এই তিনখানি উপন্যাসের বিন্যাস বুঝিতে পারিলে, বুঝা যাইবে—বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতত্ত্ব, কিভাবে এবং কোন্ দিক দিয়া বুঝিতেন।' এই আদিকথার পরেই পাঁচকড়ির দ্বিতীয় কথা হোলো ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলার হিন্দু-সমাজে আচার-ব্যবহারগত কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাও স্বাভাবিক। সেই পরিবর্তনকে দেশের ও জাতির প্রকৃতির অনুকূল করিয়া পরিচালিত করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই কর্তব্য।' তৃতীয়তঃ, কোম্‌টের দার্শনিক মতবাদ 'পজিটিভিজম্'-এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মনে। চতুর্থতঃ, 'বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় প্রাদেশিকতার ভাবটা সর্বপ্রথমে ফুটাইয়া তোলেন।' এই মন্তব্যটি নানা দিক থেকেই স্মরণযোগ্য। এবং বিষয়টি আরো বিশদ এবং সুবোধ্য করেই তিনি পুনরায় জানিয়েছেন—'কবি রঙ্গলাল হইতে হেমচন্দ্রের প্রথম দশা পর্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক কবিগণ গোটা ভারতবর্ষ লইয়া দেশহিতৈষণা বা দেশাত্মবোধের চর্চা করিতেন। তখন বাঙ্গালার কবি রাজস্থান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, পুরাণেতিহাস লইয়া দেশগীতি গান করিতেন। তখন বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় নাই, তখন বাঙ্গালী ইংরেজের দেওয়া কাপুরুষতার তুরপনেয় কলঙ্কলেপে কলঙ্কিত ছিলেন। এ কলঙ্ক ভঞ্জনের চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাগ্রে করেন।' 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' এবং 'সীতারাম' উপন্যাস-ত্রয়ীর মধ্যেই বাঙালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করবার প্রথম প্রয়াস দেখা গেছে। তাই পাঁচকড়ি বেশ জোরের সঙ্গেই বলে গেছেন: 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিতমাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক, সমগ্র ভারত-বর্ষের নহে।' আরো সূক্ষ্মভাবে বিচার করে তিনি বলেছেন: 'এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা state বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্যায় দেখাইয়াছেন।'

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রতিবেশপ্রভাব সম্বন্ধে খুবই বিশ্বাসী ছিলেন,—এবং তাঁর সে বিশ্বাস যে কোম্‌টেরই প্রভাবজনিত ব্যাপার, পাঁচকড়ি সেই কথাই

ব্যক্ত করেছেন। 'বাঙ্গালা জাতির সহিত কাজ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'—এই বিশ্বাসের বশেই বঙ্কিমের এই শেষ তিনখানি উপন্যাসে সন্ন্যাসী চরিত্রের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তারপর তাঁর নাকি এ বিশ্বাসও ছিল যে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ, এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া সমাজের বিশেষ কোনো ভাঙাগড়া হয় নি,—তাই তাঁর এই তিনখানি উপন্যাসে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ছবিই উজ্জল হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ির নিজের কথা পুনর্বায় তুলে দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন:

'আনন্দমঠে মহেন্দ্র সিংহ সন্তান বটে, কিন্তু সন্ন্যাস পান নাই। দেবীচৌধুরাণী ব্রাহ্মণকন্যা; সীতারাম কায়স্থ ভৌমিক ও সেনাপতি। আনন্দমঠে তিনি ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবে সমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে শক্তিকে সর্বসিদ্ধির আধারভূতা করিয়া বঙ্গীয় মানবতার উন্মেষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন; সীতারাম উপন্যাসে শক্তি বিরূপা হইলে, পুরুষ মোহান্ধ হইলে, কেমন বাড়া ভাতে ছাই পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীত্বের শ্লাঘা ও অপহ্নব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে একদিকে এই ইতিহাসবোধ,—বাংলার ও বাঙালীর জীবন-সমস্যার বিশেষ ভাবনা-চিন্তা,—অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য ধারায় মানুষের প্রতিবেশপ্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার প্রভাব,—এবং তৃতীয়তঃ উনিশ শতকের ইংরেজি রোম্যান্টিক ভাবে তাঁর বিশেষ আগ্রহই পাঁচকড়ির এই প্রবন্ধটির মধ্যে বিশ্লেষিত হয়েছে। বঙ্কিম যে মূলতঃ আদিরসের মহাকবি, তিনি সেই কথাই সুকৌশলে দেখিয়েছেন। আবার তাঁর নিজের কথা মনে পড়ে:

'তিনি বাঙ্গালার ইংরেজীনবীশ বা উদ্ধত নায়ক-নায়িকাই ভাল করিয়া আঁকিয়াছেন, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সখা, অন্য কোন ভাবের কথাই ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। শেষের তিনখানা উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও তিনি আদিরসের হাত এড়াইতে পারেন নাই। আদিরসের মৈনাকের উপর তাঁহার অনেক ভাবের নৌকা ফাঁসিয়া গিয়াছে।'

তবে, উদ্ধৃতির এই শেষ বাক্যে যে তিরস্কারের সুর আছে, পাঁচকড়ির কলমে সেটি আর বেশি তীব্র হতে পারে নি! তিনি তাড়াতাড়ি বঙ্কিমের পক্ষ অবলম্বন করেছেন! বঙ্কিমের অনতিউচ্চারিত নির্দেশ তিনি যেন নিজেই ব্যাখ্যা করতে বসেছেন! বঙ্কিম নিজেই নাকি বাঙালীকে তার অবনতি, দুর্দশা এবং পতনের পথ দেখিয়ে দিতে

চেয়েছিলেন এবং বাঙালীকে সতর্ক করে দেওয়াই নাকি তাঁর অভিপ্রায় ছিল। বঙ্কিম নাকি এই বলতে চেয়েছিলেন যে—

'যদি ইয়োরোপের আদর্শে দেশাত্মবোধের অর্ণবযান বাঙ্গালার ভাবের লহরের উপর ভাসাইতে হয়, তাহা হইলে সাবধান, আদিরসের চোরাবালির উপর, ডোবা পাহাড়ের উপর দিয়া নৌকা চালাইও না…।'

কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে পাঁচকড়ি আরো অসংকোচে বঙ্কিমের ত্রুটি দেখিয়ে দিতেও ভোলেন নি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনার মধ্যে যে ঐতিহাসিকতা বজায় রাখা দরকার, বঙ্কিম তাঁর এই তিনখানি উপন্যাসে সে ইতিহাস-আনুগত্য দেখান নি! তিনি ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক আবহ-রক্ষার চেষ্টা সর্বত্র সার্থক হয় নি। সমালোচক লিখেছেন :

'Detail বা খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে তাঁহার আলেখ্যের ক্ষেত্র আধুনিকতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে এ দোষ পরিহার করিতে পারিতেন না, তাহা নহে; তিনি উপন্যাসের Purpose বা উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলেন।'

পাঁচকড়ি বঙ্কিমের আরো এক ত্রুটির কথা বলেছেন। সেটা অক্ষমতা নয়, সে তাঁর অজ্ঞানতা বা সমুচিত জ্ঞানের অভাব। বিস্ময় আর বেদনার মিশ্র আবেগে তাই পাঁচকড়িকে বলতে শোনা গেছে :

'তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার অনেক বিস্মৃত কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার নারী চিরদিন এমন বিহ্বলা ও অবলা ছিল না। তিনি ত জানিতেন না, যে, বাঙ্গালার অধ্যাপক-গৃহিণী স্বামীর অনুপস্থিতিকালে ছাত্রদের ন্যায় ও অলঙ্কারের পাঠ দিতেন। তিনি ত বাঙ্গালার ভৈরবী দেখেন নাই, এমন কি বাঙ্গালার শেষ ভৈরবী বিন্দুবাসিনীকেও দেখেন নাই।… ডেপুটি ম্যাজেষ্টরী চাকরি করিতে করিতে বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহাকে ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেকের মুখে অনেক গালগল্প, অনেক কিম্বদন্তী তিনি শুনিয়াছিলেন। তাহারই উপর স্বীয় অপূর্ব কল্পনা চড়াইয়া তিনি শান্তি, শ্রী, নন্দা, প্রফুল্ল প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন। ঐ সকল চিত্র ঠিক বাঙ্গালার নহে; অথচ উহাদের উপরে বাঙ্গালীত্বের মোটা গালার রঙ, বেশ জোর করিয়া বসান আছে।'

আবার বঙ্কিমের গেরুয়া-প্রীতি সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির মধ্যে যে অন্য ভাব এবং অন্য লক্ষণ দেখা যায়, সে-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাঁচকড়ি লিখেছেন :

'জার্মান পণ্ডিত ফিক্তের (Fichte) Individual and Common Culture ব্যষ্টি এবং সংহতির অনুশীলনটাই তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া,

বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে। উহা যেন বিলাতের Lake Poets দিগের Susquehama প্রদেশে Utopia সৃষ্টির জন্য আদর্শ,—প্রটেস্ট্যান্ট Monk দিগের অনেকটা অনুরূপ। গেরুয়াও থাকিবে এবং ঘরে পত্নীও থাকিবে, ব্রত উদ্‌যাপনের পরে সে পত্নীকে লইয়া ঘর করিবার আশা তুষানলের মতন হৃদয়ে সদা জ্বলিতে থাকিবে, এমন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ছিল না—হয় নাই।'

এই বিশ্লেষণ এবং মন্তব্যের নির্ভীকতা ভোলবার নয়। পশ্চিমের যে কড়া রঙে বঙ্কিমচন্দ্রের মন রাঙিয়ে উঠেছিল, পাঁচকড়ি সেকালের সেই রঙটাই স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে, সমষ্টির কল্যাণসাধনই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের সুখ-দুঃখটা গৌণ ব্যাপার। এই জীবনদর্শনের সঙ্গে 'আনন্দমঠের' রচনাকালের সমকালীন এক আন্দোলনের কথা জড়িত ছিল বলে মনে করেছেন সমালোচক পাঁচকড়ি! তাঁর কথা এই:

'যখন আনন্দমঠ রচিত হয়, তাহার পূর্বে জর্মন জাতির সমন্বয় বা জলভরীণ হইতে National Cohesiveness বা জাতিসংহতি লইয়া ইউরোপে এবং আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ফলে একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কার্ডিন্যাল নিউম্যান এ পক্ষে অনেক কথা সে সময়ে কহিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয়, যে, আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের মসলা অনেকটা আছে।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ, বিচার-বিতর্ক এবং সিদ্ধান্ত প্রকাশের এই রকম আন্তরিকতা আর সাহস দেখা যায়। তবু, নিজেকে তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অযোগ্য শিষ্যমাত্র' বলে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখাতে তিনি অতিমাত্রায় স্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, assertiveness ব্যাপারটাই প্রতিভার সঙ্গে জড়িত! তাঁর নিজের লেখাতেও প্রতিভার সে লক্ষণ সুস্পষ্ট। সেই সঙ্গে তাঁর তথ্যজ্ঞান এবং অধ্যবসায়ের কথাই কি আর ভোলা যায়? প্রধানতঃ তিনি ছিলেন সাংবাদিক। আর, তাঁর অন্তরের টান ছিল সাহিত্যিক চরিতার্থতায় পৌছোবার দিকে।

সাহিত্যিক প্রয়োজনে,—বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আদর্শে বাংলায় গদ্যের অনুশীলন আরম্ভ হয় উনিশ শতকের প্রথমেই। লিখিত মূর্তিতে তার আগের আমলের বাংলা গদ্য যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তা নয়। বৈষ্ণব তত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি পুঁথিতে,—বিদেশে রোমক লিপিতে মুদ্রিত এক খ্রীষ্টান যাজকের একটি বইয়ে,—প্রাচীন কয়েকখানি চিঠি-পত্রে এবং কোনো কোনো দলিল-দস্তাবেজে অতীত কালের বাংলা গদ্যের নমুনা আজও সংরক্ষিত আছে। সেইসব নমুনা দেখে গবেষণার স্পৃহা মেটে বটে, কিন্তু সাহিত্যরসের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় না। কারণ, সাহিত্য রচনার প্রেরণায় সে-সব রচনার জন্ম হয়নি।

উনিশ শতকের আগে সাহিত্যের প্রশস্ত বাহন হিসেবে পদ্যই এদেশে প্রধানতম মর্যাদা লাভ করেছে। বাঙালী সাহিত্যিকের মননের যাবতীয় সম্পদ পদ্যবাহনেই প্রকাশ কামনা করে এসেছে। বৈষয়িকতার স্থূল মাটিতে ঐরাবতের মতন এগিয়ে গিয়েছে বাংলা পদ্য,—আবার, দরকার মতো, স্বপ্নরাজ্যে পাড়ি দেবার প্রযত্নে পারাবতের মতো শূন্যলোকে ভেসে গিয়েছে সেই একই বাংলা পদ্য! চর্যাগীতি রচনার সময় থেকে খ্রীষ্টাব্দের আঠারোর শতক অবধি বাংলায় একা গদ্যই এই দুই পৃথক বাহনের পৃথক পৃথক দায়িত্ব পালন করে এসেছে। এই পৃথক পৃথক দায়িত্বের পার্থক্য যে কতো ব্যবহিত, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে শ্রীচৈতন্যের অল্প পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে,—যখন একদিকে গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি কবিরা পদাবলী লিখছিলেন,—অন্যদিকে তাঁদেরই নিকট-সাময়িক বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা এবং বৈষ্ণব তত্ত্বপ্রসঙ্গ বর্ণনা করছিলেন বহু শ্রমনিষ্ঠ, বহু ভারসহ, স্থিতিস্থাপক বাংলা পয়ারে। পদ্যবাহনের এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যতম স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।

বিদেশী শাসক ও যাজক সম্প্রদায়ের স্বার্থের তাগিদেই গদ্যের সাধনা এদেশে ব্যাপক অধিকার বিস্তারে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের নীতিকথাগুলি বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বাসনায় খ্রীষ্টান যাজক বাংলাভাষার দিকে আকৃষ্ট হলেন। দেশের শাসনযন্ত্রের মসৃণতা অব্যাহত রাখবার তাগিদে দেশের ভাষা আয়ত্ত করবার যুক্তি যে অকাট্য,—বিদেশী শাসকদের মনেও সে-কথা যথাসময়ে প্রবেশ করে। ইচ্ছা থেকেই উপায় দেখা দেয়। ফলে, প্রাক্তন বাংলা সাহিত্যের পদ্যসর্বস্বতা এঁদের চোখে পড়ে—এবং অবিলম্বে সেই দৈন্য ঘুচিয়ে দেবার সাধনাও শুরু হয়ে যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরের বছর,—১৮০১-এর এপ্রিল মাসে উইলিয়ম কেরি সেই কলেজে বাংলা আর

সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হল। বাংলা গদ্যে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ-আয়োজন এইভাবে প্রথম দেখা দেয়। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ কেরি সাহেবের তত্ত্বাবধানে,—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের চেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাচীন বহু গ্রন্থনামে 'প্রবন্ধ' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বাংলায় 'প্রবন্ধ' শব্দটি প্রধানতঃ গদ্যবাহিত যে তত্ত্বালোচনামূলক রচনাশ্রেণী নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যার্থ-নিরপেক্ষভাবে 'প্রবন্ধ' শব্দের সে-রকম ব্যবহার নেই। সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' প্রকৃষ্ট বন্ধনের রূপগত দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেও গদ্যরীতিকে তার একমাত্র অবিচ্ছেদ্য বাহন হিসেবে গ্রহণ করেনি। সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' গদ্যে-পদ্যে উভয় বাহনেই লেখা হয়েছে। তাছাড়া সেখানে 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' ছিল নানা অর্থসূচক অভিধা;—ছন্দের বন্ধন, বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, সর্গ-অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনাক্রমের পারম্পর্য ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাহিত্য দর্পণ'-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যের রচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গেও 'প্রবন্ধ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্য-নাটকাদির বিভিন্ন উপাদানগত আবশ্যিক সংগতির নামও 'প্রবন্ধ'। তা থেকে 'প্রবন্ধৌচিত্য' কথাটি সংস্কৃতে বহুবার আলোচিত হয়েছে,—কুন্তক বলে গেছেন 'প্রবন্ধ-বক্রতা'র চারুকৃতি-কথা। এইসব বিচিত্র প্রয়োগে সংস্কৃত 'প্রবন্ধ' আর ইংরেজি 'Essay' পরস্পরের প্রতিশব্দরূপে প্রযুক্ত হয়নি। Aristotle যাকে বলেছিলেন শিল্প-বস্তুর আভ্যন্তরীণ ঐক্য বা Unity, সংস্কৃতের অলঙ্কারশাস্ত্রে 'প্রবন্ধ' অনেকটা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সম্বন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ-প্রণেতাদের মনোভাবটি সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত:

'সকল জুড়িয়া একটা বিশেষ প্রবাহ বা পরিণতিই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।'*

কাব্যমীমাংসার লেখক রাজশেখর বলেছেন 'অকুজ্ঝিতার্থ সম্বন্ধত্বই' প্রবন্ধের লক্ষণ, অর্থাৎ, যে রচনায় অর্থসম্বন্ধ কোনোভাবে পরিত্যক্ত হয়নি বা ব্যাহত হয়নি, তাকেই বলা যাবে 'প্রবন্ধ'।

বাংলায় 'প্রবন্ধ' শব্দের পাশাপাশি 'নিবন্ধ', 'সন্দর্ভ', 'প্রস্তাব,' 'রচনা' প্রভৃতি শব্দ সমার্থবোধক প্রচলন লাভ করেছে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁর আলোচনায় এইসব ভিন্ন শব্দের পৃথক পৃথক ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, গ্রন্থের বৃত্তি বা টীকা অর্থে 'নিবন্ধের' ব্যবহার সংস্কৃতে সুপ্রশস্ত; আর, 'সন্দর্ভ' কথাটির মানে হোলো—সম্যকরূপে

* বাঙলা সাহিত্যের একদিক: পৃঃ ১৮

গ্রন্থন, রচন বা সংগ্রহণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে জীবগোস্বামীর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ষট্‌সন্দর্ভ'। রচনা বিশেষের গূঢার্থের প্রকাশক হিসেবেও 'সন্দর্ভ' কথাটির প্রয়োগ দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে।

উনিশ শতকের প্রথমে, যখন, নবজাত সাহিত্যিকগুণান্বিত বাংলা গদ্যে বাঙালী মনীষীরা ব্যাখ্যানমূলক বা বর্ণনমূলক রচনায় উদ্যত হলেন, তখন 'প্রস্তাব' শব্দটিরও বহুল ব্যবহার শুরু হয়। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি লেখকদের নানা গদ্যরচনা 'প্রস্তাব' নামে অভিহিত হয়েছে।

এইসব ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উল্লেখ করে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাংলায় ইংরেজি 'Essay'-র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত প্রধান দুটি শব্দ 'প্রবন্ধ' এবং 'রচনা'-র মধ্যে এক-রকম পার্থক্য কল্পনা করেছেন। ইংরেজিতে Essay-র দুই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে—এক, Familiar অথবা Personal Essay,—দ্বিতীয়তঃ Expository Essay। প্রথম শাখার নামকরণে অধ্যাপক দাশগুপ্ত বাংলা 'রচনা' শব্দের উপযোগিতা এবং শেষোক্তের সম্বন্ধে 'প্রবন্ধে'র ঔচিত্য স্বীকার করেছেন। কালক্রমে বাংলায় এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রকৃতি যদি এই দুটি পৃথক নামে বোধগম্য হয়, তাহলে, দাশগুপ্ত মশায়ের কাছে আমাদের স্থায়ী কৃতজ্ঞতা থাকবে। কিন্তু এই পার্থক্যবোধক পৃথক শব্দযুগলের আনুগত্য স্বীকার করবার পূর্বে এই শব্দ দুটির সম্পর্কে তাঁর নিজের টীকা-টিপ্পনী একবার বিচার করে দেখা উচিত। তিনি বলেছেন:

'বাংলায় ইংরেজি Essay শব্দের প্রতিশব্দরূপে যে কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে তাহার ভিতরে 'রচনা' শব্দের প্রয়োগকেই আমরা সুষ্ঠুতম বলিয়া বিবেচনা করি।......'রচনা' শব্দটির ভিতরে একটা সৃষ্টির কথা অনুস্যূত হইয়া আছে; রচনা বলিয়া সাহিত্যের শ্রেণীটির ভিতরেও যে একটা অসাধারণ চমৎকার-কারিণী নির্মিতি রহিয়াছে, ঐ শব্দটির ভিতরেই তাহার বেশ একটা ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইখানেই আমরা প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং রচনা-সাহিত্যের ভিতরে একটা ভেদরেখা টানিতে চাই। প্রবন্ধ সাহিত্যিক সৃষ্টি নহে, রচনা সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইংরেজি Essay এবং Treatise. Discourse, Dissertation শব্দের ভিতরে যে তফাৎ, রচনা এবং প্রবন্ধের ভিতরে আমরা সেই তফাৎ কল্পনা করিতে পারি।'

দাশগুপ্ত মশায় নিজেই স্বীকার করেছেন:

'যে পার্থক্যের কথা এখানে বলিতেছি তাহা ঐতিহাসিক নহে,—তাহা অনেক-খানিই অর্থগত। তবে এই অর্থগত ভেদকে অবলম্বন করিয়া আমরা 'প্রবন্ধ'

এবং 'রচনা'র ভিতরকার এই প্রভেদকে যদি এখন হইতে মানিয়া লই, তাহা হইলে একটি সাহিত্যিক শ্রেণী হিসাবে রচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং পরিধি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।'

তাঁর এই প্রস্তাবের আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি ঔদাসীন্য যখন নিষ্ঠাবান ছাত্রের পক্ষে পরিত্যাজ্য, তখন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী,' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'নানা প্রবন্ধ', রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রবন্ধমালা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'—'প্রবন্ধ'-নামধেয় এতোগুলি,—এবং এ ছাড়া, সমনামলাঞ্ছিত অন্যান্য বহু গ্রন্থাবলীর অস্তিত্ব মনে রেখে তাঁর উপরি-উদ্ধৃত উক্তির অধোরেখ মন্তব্যটি মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য।

ইংরেজি Essay এবং Treatise,—Discourse, Dissertation প্রভৃতি শব্দের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে, সন্দেহ নেই। শেষোক্ত শব্দত্রয়ের অর্থ সুস্পষ্ট। এই আলোচনার পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে যে, Essay-র দুই শ্রেণী আছে; এক হোলো, ব্যক্তিগত মননপ্রধান শ্রেণী, অন্যটি ব্যাখ্যান-লক্ষ্য শাখা। Lamb-এর Old China, Hazlitt-এর Old Familar Faces, R. L. Stevenson-এর Travels with a Donkey—এগুলিও প্রবন্ধ (Essay),—আবার Newman-এর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত রচনাও 'প্রবন্ধ' নামেই অভিহিত হয়। ইংরেজিতে Essay শাখাটিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে, একাধিক উপশাখার একাধিক নাম দেওয়া হয়েছে। বাংলায় সুদীর্ঘব্যবহৃত 'প্রবন্ধ' শব্দটিকে কেন্দ্রচ্যুত করবার বৈপ্লবিক অপপ্রয়াস পরিহার করে, ইংরেজি সাহিত্য-সংজ্ঞানির্মিতির আদর্শ অনুসরণ করে, সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত গদ্যসন্দর্ভের মূল শাখার নাম প্রবন্ধ, এবং তার দুই উপশাখার জন্যে যথাক্রমে 'ব্যক্তিগত মননপ্রধান প্রবন্ধ'—এবং 'ব্যাখ্যানলক্ষ্য প্রবন্ধ'—এই নাম দুটি ব্যবহার করলে প্রাজ্ঞজনের আপত্তি হবে কি? দাশগুপ্ত মশায় নিজেই বলেছেন:

'ল্যাম্বের রচনাকেও Essay বলা হয়, বেকনের রচনাকেও Essay বলা হয়, আবার লকের দার্শনিক তথ্য ও যুক্তি-তর্ক সমন্বিত সুদীর্ঘ গ্রন্থকেও Essay on Human Understanding বলা হয়।'

এই জাতীয় প্রয়োগের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য:

'Essay শব্দটিও ইংরাজীতে অতি ব্যাপক ভাবে এবং অসাবধানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।'

সে হয়তো ঠিকই। তাছাড়া, আরো একদিক থেকে ব্যাপারটি ভেবে দেখা যেতে পারে।

বাংলা উপন্যাস হোলো বাংলা সাহিত্যের বয়ঃকনিষ্ঠ কীর্তিমালার অন্যতম,—উপন্যাসও গদ্যে লেখা এবং বাংলা প্রবন্ধের তা প্রায় সমবয়সী। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী এবং বিষবৃক্ষ, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন এবং শ্রীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি এবং ঘরে-বাইরে—বাংলায় এক 'উপন্যাস' নামেই এরা সবাই অভিহিত হয়! বছর পনেরো আগে পাশ্চাত্য গদ্য-Romance-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় ' রমন্যাস' কথাটি চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল। সে চেষ্টা প্রত্যুষেই অস্তমিত হয়। Novel এবং Romance-এর মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে; তা-ছাড়া Novel-এরও আবার নানা ভেদ আছে। কিন্তু সেজন্যে 'Novel'—এই দীর্ঘব্যবহৃত, সুপরিচিত শব্দটিকে বাতিল করে ইংরেজি সাহিত্য-সেবকরা তো নতুন নতুন শব্দমালার জন্যে কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন প্রকাশ করেননি! বরং, যুগোপযোগী প্রয়োজনের খাতিরে তাঁরা Historical novel, Domestic novel, Social novel, Psychological novel ইত্যাদি বিশেষণ-সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন অভিধা প্রয়োগ করে Novel-এর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁদের সচেতনতার পরিচয় রেখে এসেছেন। তেমনি 'প্রবন্ধের' সাহিত্যিক দায়িত্বটুকু অগ্রাহ্য না করে, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের সংজ্ঞা-বিধানকল্পে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-যোগে, পৃথক পৃথক শ্রেণীর নির্দেশনা চলতে পারে। কিছু-কাল পূর্বে Ernest Rhys সম্পাদিত Modern English Essays নামে পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ যে প্রবন্ধসংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে গুরু-লঘু বিভিন্নধর্মী প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে,—সেই গ্রন্থে বাচ্যার্থপ্রধান এবং বাচ্যার্থ-অতিশায়ী বিভিন্ন রচনা ঐ এক Essay-নামেই আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐ বইটির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে স্বনামধন্যা লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্ফ্ 'প্রবন্ধ' সম্পর্কে যা বলেছেন, সেই উক্তিটি অনুধাবন করলে ডক্টর দাশগুপ্ত Treatise, Dissertation, Discourse-এর প্রতি কেন যে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, তা বোধ হয়, ঠিকভাবে অনুমান করা যাবে। শ্রীমতী উল্ফ্ বলে গেছেন :

> 'There is no room for the impurities of literature in an essay Somehow or other by dint of labour or bounty of nature, or both combined, the essay must be pure—pure like water or pure like wine, but pure from dullness, deadness and deposits of extraneous matter.'*

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' এই অর্থে pure, অর্থাৎ, বিবিধ মিশ্রণ সত্ত্বেও সে হোলো খাঁটি সাহিত্য। সে রচনাকে Treatise বা Dissertation বা Discourse বলে বাতিল করবার কোনো হেতু নেই। 'বিবিধ প্রবন্ধ' রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধমালা। দাশগুপ্ত

* The Common Reader

মশায় রসিকসাধ্য এই স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেননি,—কেবল রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধকে 'প্রবন্ধ' বলতেই তাঁর আপত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ যে সাহিত্যপদবাচ্য রচনা তাতে সন্দেহ কিসের? বরং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একাধিক প্রবন্ধ নীরস Dissertation-এর পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। সেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে দাশগুপ্ত মশায় 'রচনাকার' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'রচনা' সম্বন্ধে তাঁর স্ব-প্রবর্তিত বিশেষ অর্থ টি ভূদেবের প্রতি আরোপ করে দাশগুপ্ত মশায় নিজেও যে স্বস্তি বোধ করেননি, তার প্রমাণ আছে তাঁর নিজেরই মন্তব্যে। তিনি বলেছেন:

> 'ভূদেবের তৃতীয় ধরণের লেখাকেই আমরা সত্যকারের সাহিত্যিক রচনা বলিয়া গ্রহণ করিব;...'

অর্থাৎ ভূদেবের গদ্য-সন্দর্ভ যে সর্বাংশে সাহিত্যিক-গুণমণ্ডিত নয়, সে-বিষয়ে ডক্টর দাশগুপ্ত নিজেও নিঃসংশয়। তথাপি, তাঁকে 'প্রবন্ধ-রচয়িতা' (দাশগুপ্ত মশায়ের নিজের অভিধা অনুসারে) না বলে 'রচনাকার' বলবার যুক্তি কোথায়? এখানে পুনরায় স্মরণীয় এই যে, 'রচনা' ও 'প্রবন্ধের' এই সাহিত্যগুণঘটিত নামবৈষম্যের কল্পনা তাঁরই স্বকৃত কীর্তি। কিন্তু স্ব-প্রচারিত নামের প্রয়োগে তিনি নিজেই অসতর্ক হয়ে পড়েছেন!

এ-রকম প্রমাদ এ অবস্থায় মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, যে অনৈতিহাসিক ভিত্তির ওপর তিনি তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন, সেই ভিত্তিই দুর্বল। বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' কথাটি উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের অদ্যাবধি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, সে-অর্থ টি উপেক্ষা করে লাভ নেই। ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজ পত্রের' মুখপত্রে লিখেছিলেন:

> 'আমাদের স্বল্পায়তন পত্রে, অনেক লেখা আমরা অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য, শিশুপাঠ্য, স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধ সকল, অনাহূত কিংবা রবাহূত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান করতে বলতে পারব; কারণ আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করতে হবে না।' এর লাভ যে কি, তিনিই বুঝতে পারবেন, যিনি জানেন যে, যে কথা একশ'বার বলা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম ও কর্ম। যে লেখায় লেখকের মনের স্থান নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।'

এই উক্তিতে সাহিত্যিক গুণশূন্য প্রবন্ধের প্রতি অনাদর ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু সেজন্যে 'প্রবন্ধ' নামে নীরস গদ্যবাহিত আলোচনার একটি পৃথক শ্রেণী সূচনার কোনো

প্রয়াস ঘটেনি। পক্ষান্তরে তথ্যময় শিশুপাঠ্য আর স্কুলপাঠ্য প্রবন্ধই যে যথার্থ 'প্রবন্ধ' নামবাচ্য,—এই হোলো দাশগুপ্ত মশায়ের ইঙ্গিত। যে গদ্যসন্দর্ভে 'লেখকের মনের ছাপ আছে', তাকে তিনি 'রচনা' বলতে চেয়েছেন!

তাঁর আলোচনা দেখে পাঠকের অস্বস্তি উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠাই স্বাভাবিক; কারণ, তিনি যে শুধু 'রচনা' এবং 'প্রবন্ধ' এই দুটি শব্দের দুটি পৃথক অর্থ ঘোষণা করে ক্ষান্ত হয়েছেন, তা নয়; 'রচনা' শব্দের ব্যবহারে তাঁর ঈপ্সিত অর্থের সম্যক অনুসৃতি এই গ্রন্থভুক্ত তাঁর অন্যান্য মন্তব্যে তিনি নিজেই স্বীকার করেননি। যেমন তিনি বলেছেন:

> 'আমরা পূর্বেই আভাস দিয়াছি এবং পরে আরও বিশদভাবে দেখিতে পাইব যে একজন রচনাকারও মূলতঃ একজন কবি এবং সত্যকারের একটি সাহিত্যিক রচনা ব্যাপক অর্থে একটি গদ্য-কবিতা।'

এই ঘোষণার পরে যখন দেখা যায় যে তিনি নিজে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মশায়কে 'রচনাকার' নামে অভিহিত করেছেন, তখন পাঠকের মনে ন্যায়সঙ্গত যে প্রশ্নটি জেগে ওঠে, সেটি এই যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আচার-প্রবন্ধ'ও কি গদ্যকাব্য? ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত অবশ্যই তা মনে করেন না!

এবার, ডক্টর দাশগুপ্ত মশায়ের আর-একটি মন্তব্যের কথা বলে নিয়ে এই আলোচনার উপসংহারে পৌঁছোনো যাক। এই মন্তব্যটি বর্তমান আলোচনায় এর আগেই আংশিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,—এখানে পুরো উক্তিটিই তুলে দেওয়া গেল:

> 'ইংরেজিতে যাহাকে Essay Literature বলা হয়, সেই অর্থেই আমি 'রচনা-সাহিত্য' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছি।'

কিন্তু তাই যদি তিনি করতেন, তাহলে 'রচনা' এবং 'প্রবন্ধ' এই দুটি শব্দ নিয়ে এতো কথার প্রয়োজন হোতো না। কারণ, ইংরেজিতে 'Personal Essay-ও Essay, আবার Expository Essay-ও Essay। একথা বর্তমান আলোচনায় একাধিকবার বলা হয়েছে। সাহিত্য-সংজ্ঞার ব্যাখ্যানমূলক একখানি ছাত্রপাঠ্য ইংরেজি বই থেকে এ বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেখা যেতে পারে:

> 'An essay by Bacon consists of a few pages of concentrated wisdom, with little elaboration of the ideas expressed; an essay by Montaigne is a medley of reflections, quotations and anecdotes; in an essay by Addison, the thought is thin and diluted, and the tendency is now towards light

didacticism and now towards personal gossip; Lock's Essay concerning Human Understanding is a ponderous volume close-packed with philosophic matter; the essays of Macaulay and Herbert Spencer are really small books.' *

অধ্যাপক দাশগুপ্ত ইংরেজি ভাষায় Essay শব্দটির অর্থব্যাপকত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, ওপরের এই উদ্ধৃতি সে মন্তব্যের সমর্থক। সুতরাং বাংলা প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বোঝাবার জন্যে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের উদ্যম যে শ্লাঘনীয়, সে-বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কিন্তু আপত্তির কারণ এই যে, 'প্রবন্ধ' শব্দটির সম্বন্ধে তিনি একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং 'রচনা' কথাটির ওপর একটু বেশি মাত্রায় বলপ্রয়োগ করেছেন। সাহিত্য-পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের দীর্ঘ-অভ্যস্ত সংস্কারের তা বিরোধী। তিনি যখন বলেন, 'সত্যকারের একটি সাহিত্যিক রচনা ব্যাপক অর্থে একটি গদ্য কবিতা'—তখন তাঁর ঈপ্সিত অর্থটি হোলো—a truly literary essay is broadly speaking a lyric in prose। কিন্তু বঙ্গানুবাদে ঐ উক্তির যে ভাষান্তরিত চেহারাটি দেখা যাচ্ছে, তাতে বাঙালী পাঠকের অর্থবোধে ভ্রম ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ইংরেজি composition-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'রচনা' কথাটির বহুল ব্যবহার আছে। 'সাহিত্যিক রচনা' বললে বাঙালী বুঝে থাকেন literary composition;—literary essay-র বোধটি জাগিয়ে তুলতে হলে রচনা কথাটিকে বোধ হয় বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিলে ভালো হয়,—লিখতে হয় 'রচনা'। বাংলা ভাষায় যখন উপযুক্ত শব্দের অভাব নেই, তখন, অনর্থক ঊর্ধ্ব কমার আড়ম্বর বাড়িয়ে কী লাভ হবে?

দাশগুপ্ত মশায়ের 'বাঙলা সাহিত্যের একদিক' তাঁর পাণ্ডিত্যের বহু অভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ। তাঁর নামকরণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁর ভক্ত পাঠক হিসেবেই এখানে আমার পাঠককৃত্য সারা হোলো।

'রচনা' বললে কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, আলোচনা—সব কিছুই বোঝা গিয়ে থাকে,—অতএব 'প্রবন্ধ' কথাটা চলুক বিশেষভাবে Essay-রই প্রতিশব্দ হিসেবে,—Essay-র শাখাভেদ আছে,—'প্রবন্ধ'ও হোক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত,—আর, 'আলোচনা' চলুক Treatise, Dissertation, Discourse-এর প্রতিশব্দ হিসেবে। আশা করা যায়, সহানুভূতিশীল পাঠকেরা এতে আপত্তি করবেন না!

* An introduction to the study of Literature—W. H. Hudson p. 442.

লিরিক ও উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকবিতা সংকলন

গীতিকবিতা বললে 'লিরিক'-এর প্রতিশব্দ বুঝিয়ে থাকে। অতি প্রাচীন কালে শুরু হয়ে সাহিত্যের এই ধারা আজও অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে কবিতার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অলংকারশাস্ত্রসম্মত যে-সব ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ প্রচলিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধের মধ্যে কাব্যের আকার-প্রকারের কথা বলতে গিয়ে সেই শ্রেণীগত বিভিন্নতার সরল সারকথাটুকু এইভাবে বলেছিলেন: কাব্যের 'রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে'—অর্থাৎ বাইরে থেকে কেবল চেহারা দেখেই কোনো রচনাকে বিশেষ কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করা ঠিক নয়। একটি বিভ্রমের উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। তাঁর সেই উদাহরণটি একালেও অচল হয়ে যায়নি। তিনি বলেছিলেন, 'এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে।'

না, চেহারামাত্র দেখে কোনো রচনাকে 'নাটক' বলাও সংগত নয়, 'গীতিকবিতা' বলে মেনে নেওয়াও সুবিবেচনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া সংক্ষিপ্ত শ্রেণীব্যাখ্যাটি এই: 'তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা, প্রথম, দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; দ্বিতীয়, আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।' এবং—'খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে।'

অতঃপর গীতিকাব্যের বস্তুপ্রকৃতি এবং ভাবপ্রকৃতির ব্যাখ্যায় উদ্যত হয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে গীতের স্বরচাতুর্য এবং কবিতার শব্দচাতুর্য,—আদর্শ গীতিকবিতার অবলম্বন প্রধানতঃ এই দুই উপাদান।

কিন্তু আবার তাঁরই কথায় বলা যেতে পারে—'দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল। কাজে-কাজেই একজন গীত রচনা করেন আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত

হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে।' এই ইতিহাসটুকু বলে নিয়ে তিনি পরিশেষে গীতিকবিতার এই সূত্র দিয়েছিলেন: 'গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়স্পন্দন ব্যতিরেকে গীতিকবিতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত! হৃদয়ে কোনোরকম সুখ-দুঃখের ঢেউ দেখা দিলে মানুষ তার কতকটা হয়তো ব্যক্ত করে, কিছুটা কিন্তু অব্যক্তই থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাট্যকারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বাসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান ভেদ বলিয়া বোধ হয়।'

অতএব গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাতে ভাবুকের হৃদয় ধরা পড়ে। কথাতে সুরেতে এমন এক সম্মিলন ঘটে যায়, যার ফলে কথার অতিশায়ী ব্যঞ্জনা দেখা দেয়। ভাবের প্রগাঢ় ঐক্য এবং সুখ-দুঃখের অপরিসীম নিবিড়তা প্রকাশ করাই গীতিকবিতার লক্ষ্য। সব ভালো জিনিসের মতন ভালো গীতিকবিতাও তাই সত্যিই বিরল!

ফরাসী 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী আঁদ্রে জিদ্ লিখেছিলেন: 'মহাভারতের ২১৪,৭৭৮ শ্লোক, এবং রামায়ণের ৪৮০০০ শ্লোকের পর গীতাঞ্জলি,—আঃ, কি আরাম! হায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ভারতবর্ষকে অবশেষে স্বল্পতাদোষে দোষী হইতে হইল,—সে জন্য আমি তাঁহার নিকট কত না কৃতজ্ঞ! এই যে দৈর্ঘ্যের বদলে মহার্ঘতা, ভাবের বদলে সার,—এ পরিবর্তনে আমাদের কত না লাভ! কারণ, গীতাঞ্জলির ১০৩টি ক্ষুদ্র কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই যথেষ্ট সারগর্ভ।' ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর প্রসিদ্ধ অনুবাদ থেকে তাঁর এই উক্তিটুকু প্রায়ই মনে আসে। বাংলা বইয়ের আয়তন একালে বাড়তির মুখে। কেবল উপন্যাস বা প্রবন্ধের বইয়েতেই যে এই আধুনিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তা নয়। স্মৃতিকথা, আত্মকথা, আত্মজীবনী বা আপন কালের কথা বলতে গিয়ে আজকাল লেখকদের কথা যেন ফুরোতেই চায় না! কিন্তু গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে সে-রকম অতিব্যাপ্তি যতই ঘটুক, এবং বাংলা কবিতার ধারা সাম্প্রতিককালে যতোই পরিস্ফীত দেখাক না কেন, কোনো আধুনিক বাঙালী কবিকেই এখন আর ভূরি পরিমাণে লিখতে দেখা যাচ্ছে না। এ-অবস্থায় উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার প্রায় আটশ' পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি সংকলন হাতে পেয়ে মনটা প্রথমেই কিঞ্চিৎ দুলে ওঠা অসংগত নয়। ১৮৬০ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উৎপন্ন মোট

পাঁচশ' বাংলা গীতিকবিতা একসঙ্গে বেঁধে দিতে হলে গুচ্ছটির কায়িক স্থূলতা নিবারণ করবার উপায় থাকে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত উনিশ শতকের বাংলা কবিতার এই অতিস্ফীতি তাই প্রথম নজরেই চোখে পড়ে। এই পাঁচ শ' কবিতার লেখক সর্বসমেত পঁচাত্তর জন। ছ'টি খণ্ডে কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে। এই ষট্-বিভাগের শিরোনাম যথাক্রমে: প্রেম-কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা, বিষাদ-কবিতা এবং তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা। সম্পাদকদের বিচারে প্রেম, দেশপ্রেম এবং গার্হস্থ্য জীবনের কবিতাগুলিই সর্বাধিক সার্থক বলে মনে হয়েছে। তাঁরা এ-পর্বে বাংলার কবিসমাজকে প্রকৃতিবর্ণনা বা বিষাদভাবনা বা তত্ত্বচিন্তার কাব্যাবেগ প্রকাশে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ এবং কম ইচ্ছুক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 'প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা' আলোচ্য সময়ে যে খুবই কম লেখা হয়েছে, সে-কথাও তাঁরা জানাতে দ্বিধা করেননি এবং আলোচ্য ক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ উহ্য রেখেই এ-সব মতামত জানানো হয়েছে। জন্মকালের পারম্পর্য ধরলে ঈশ্বর গুপ্ত (জন্ম ১৮২২) থেকে শুরু করে পঙ্কজিনী বসু (জন্ম ১৮৮৩) পর্যন্ত খ্যাত-অখ্যাত নানা কবির সুদীর্ঘ একটি তালিকা এখানে ভিন্নভাবে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত পর্যায়ে সাজানো হয়েছে বলে বোঝা যায়। তবে কবিদের আয়ুষ্কালের সন-তারিখে হয়তো কিছু গরমিল আছে। বৃহৎ ব্যাপারে সে-রকম ঘটাও স্বাভাবিক। সেটা এ-রকম সংকলনের প্রধান আলোচনার বিষয় নয়। অতীতের পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতার সংকলন থেকে প্রধানতঃ দুটি প্রসঙ্গ জানতে ইচ্ছে হয়—প্রথমতঃ এতে সত্যিকার কাব্যগুণ ছিল কী পরিমাণে,—দ্বিতীয়তঃ এঁদের দৃষ্টি বা আগ্রহ বা মনন-কল্পনার ব্যাপ্তি কী রকম!

সম্পাদকদ্বয় বলেছেন যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলা গীতিকাব্যের আধুনিক স্তরের সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য, এ-কথাটা বড়োই চিত্তচমৎকারী! তাঁরা এই যুক্তি দিয়েছেন যে, বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', 'বন্ধুবিয়োগ' এবং 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'প্রেমপ্রবাহিণী'—হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর প্রথম খণ্ড, ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রসূন' কাব্য, বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্যকলাপ' ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল,—এতএব এঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, আধুনিক কালের গীতিকবিতা বাংলায় সেই বছরেই 'প্রতিষ্ঠিত' হয়েছে! সেইসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, '১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিহারীলালের 'সঙ্গীত-শতক' কাব্যটি রোম্যান্টিক গীতিকাব্যের নিঃসঙ্গ অগ্রপথিকরূপে স্মরণযোগ্য।' আর, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখসূত্রে এঁরা চমকপ্রদ ভঙ্গিতে বলেছেন—'বর্তমান সংকলনে ধৃত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাত্মক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই

যে, গত শতকের গীতিকাব্যের বিভিন্ন ধারার সমন্বয় রবীন্দ্রকাব্যে হইয়াছে, এই সমন্বয় হইতে এক উন্নততর কবিকৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং শতাব্দীর সাধনার পূর্ণ ফল তাঁহাতেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।' 'তুলনাত্মক আলোচনা'র পরিশ্রম ব্যতিরেকেই এ-কথা অবিশ্যি যে-কেউ বলতে পারতেন! তবে ভূমিকার আর-একটি মন্তব্য দেখে এঁদের তুলনা-প্রয়াসের প্রকৃতি বা অনুসৃত আদর্শ সম্বন্ধে মনে খট্‌কা দেখা দেয়। সে-মন্তব্যটিও বলে নেওয়া দরকার। কথাটি এই: 'এই সংকলনে পদ্য ও গান আমরা গ্রহণ করি নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র এবং আঁদ্রে জিদের কথা সেই সূত্রেই একসঙ্গে মনে এলো। ১৮৬০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চেয়ে প্রবীণতর এবং তরুণতর, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবিই সত্যিকার গীতিকবিতা লিখেছিলেন। বাকি সবই পদ্য! সেই ভাবরসনিবিড় সত্যিকার গীতিকবিতার লেখকসংখ্যা পঁচাত্তরের চেয়ে সত্যিই অনেক কম।

কিন্তু পঁচাত্তরেও আপত্তি নেই। পঞ্চাশ বছরের বাংলা গীতিকবিতার ধারাটি পাঠকের ধারণায় সঞ্চার করতে হলে সরবরাহের কাজটি একটু বেশি পরিমাণেই করা হয়তো ভালো। অনেক কবিই সম্পদহীন, অসহায়, বিস্মরণযোগ্য। সম্পাদকের দাক্ষিণ্য ব্যতিরেকে কাব্যানুরাগীর স্মৃতি অধিকার করে ভবিষ্যতে টিঁকে থাকবার সামর্থ্যবর্জিত তাঁরা। অতএব, তাঁদের সংরক্ষণ কতকটা প্রত্নানুশীলনের এলাকাভুক্ত। বাংলা বইয়ের বাজারে সত্যিকার কাব্যরসের চাহিদা বাড়লে, তবেই হয়তো সার্থকতর, নিবিড়তর, কৃশতর,—অর্থাৎ অন্যতর সংকলন প্রকাশের আয়োজন সম্ভব হতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ কবিতার সঙ্গে গবেষণা এবং কাব্যসুখের সঙ্গে বহুতর তথ্যপীড়া একই পাত্রে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকবেই। অধ্যাপক-যুগলকে আবহাওয়ার এই দুরবস্থা মেনে নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। তা না হলে শ্রীকুমারবাবুর মতন অধিকারী ব্যক্তি কোনো কারণেই কি কুঞ্জলাল রায় বা গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বা নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর প্রগল্ভতাকে 'পদ্য' না বলে 'গীতিকবিতা' বলতেন? না-কি রমণীমোহন ঘোষের 'দেবশিশু'-কে গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা বলতে তিনি বা তাঁর তরুণ সহযোগী অরুণকুমার রাজী হতেন? ঐ 'দেবশিশু'র বিষয়বস্তু মোটেই গার্হস্থ্য নয়। একটি শিশু একলা পথের ধারে বসে খেলা করছিল,—চোরে চুপিচুপি তার গা থেকে সোনার গয়না খুলে নেয়,—শিশু কিন্তু তাতে কাঁদে নি,—'কেবল উঠিল হাসি'! এবং ফলে,

নিমেষের তরে রিক্ত-ভূষণ
গৌর শিশুর পানে
চাহি'—কি বেদনা উঠিল জাগিয়া
চোরের কঠোর প্রাণে!

চোরের এই চিত্তদাহ রোম্যান্টিক বটে,—কিন্তু এ-রচনা আর যাই হোক গার্হস্থ্যজীবনে রোম্যান্টিক গীতিকবিতা নয়! একে বরং স্থনীতিব্রতী পদ্য বলা যেতে পারে!

কিন্তু সম্পাদকরা এ-ক্ষেত্রেও অসহায়! কারণ, তাঁদের সংকলন থেকে এ-ধরনে লেখা বাদ দিতে হলে বাংলাদেশের বহুশ্রুত কবিত্বের খ্যাতি সত্ত্বেও সে-পর্বের বাংল কবিতার তিন-চতুর্থাংশই হয়তো বর্জিত হওয়া দরকার! সে দিকে নজর রেখে, তাই এ-ক্ষেত্রে এইকথাই বক্তব্য যে পদ্যের প্রতি উপেক্ষার ভাবটুকু পরের সংস্করণের ভূমিক থেকে তাঁরা প্রত্যাহার করতে পারেন কি না ভেবে দেখবেন। বিষয়বিভাগের যে পরিকল্পনা তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সেটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়বস্তুর বিভাগে আপত্তি নেই, কিন্তু তা কাব্যগুণের অধীনস্থ থাকা দরকার। অর্থাৎ, আগে কাব্যগুণ আছে কিনা তাই বিচার্য,—তার পরে বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

আরো একটি কথা ভেবে দেখা উচিত। অসংখ্য মন্দকবির মধ্যে সত্যিকার ভালো কবিও ভিড়ে হারিয়ে যান। খুব বুড়ো কবিদের কথা আলাদা। কিন্তু এখানে 'ভালো কবি' মানে মাঝারি কবি। এবং মাঝারি যাঁরা, ভিড়ের মধ্যে তাঁদের হারাতে দেওয়া কখনোই সমীচীন নয়। প্রস্তুত সংকলনে সম্পাদকরা সেদিকে দৃষ্টি রাখলে পাঠক সুখী হতেন।

কিন্তু আমাদের দেশ, কাল, রুচি এবং সামর্থ্যের পরিসীমা সম্বন্ধে অবহিত থেকে ১৮৬০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত, মোট পঞ্চাশ বছরের বাংলা গীতিকবিতা এবং বাংলা পদ্যধারার ভেতর দিয়ে বাঙালী জীবনের অন্তরালোড়নের প্রকৃতিটি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া কি অসম্ভব? এই সময়সীমার শেষ প্রান্ত সম্বন্ধে আপত্তি নেই বঙ্গভঙ্গের ঢেউ নেমে যাবার তারিখ মোটামুটি ঐ ১৯১০। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় সর্বস্বীকৃত আদর্শ। কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন আর কেউই ছিলেন না। বাংলা কবিতার ধারায় সে-কালটিকে বিশেষ এক পর্বান্ত এবং পর্বসূচনার সন্ধি বলে মনে মেনে নিতে প্রবল কোনো আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু ১৮৬০-এর ঐ আদি-সীমা থেকে কয়েক বছর পিছিয়ে যেতেই বা আপত্তি কি? ভূমিকায় সম্পাদকরা বলেছেন: 'নবজাগ্রত কাব্যরসপিপাসু বাঙালি চিত্তের উদ্বোধন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" কাব্যে।' মধুসূদনের 'অন্তর্মুখী গীতি-কবিতার রোম্যান্টিক বিষাদের সুরটি' যেহেতু আরো কয়েক বছর পরের ঘটনা,—তাঁর 'আত্মবিলাপ' যেহেতু ১৮৬১ তে প্রকাশিত হয়, সেজন্যে ১৮৬০ থেকেই আলোচ্য পর্বটি সূচিত হয়েছে। বেশ, তাও স্বীকার্য। কিন্তু কবিতার রাজ্যে নতুন ভাবাদর্শের প্রবর্তন-প্রয়াস আরো কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। রঙ্গলাল তাঁর বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব শুনিয়েছিলেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫০ থেকে ১৯০০ হলেই এখানকার পর্ববিস্তারটি হয়তো

সমীচীন হোতো। তবে, ১৮৫০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেও বাধা নেই। এবং এই বিস্তারের মধ্যে বাংলা কবিতায় দেশের মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং পারমার্থিক ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কী-ভাবে আবর্তিত হয়েছে, সেটা ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করবার সুযোগ ছিল এ-রকম সংকলন-প্রয়াসের মধ্যেই। এই দিকটি বিশদ করবার জন্যেই একটি দৃষ্টান্ত মনে আসছে। কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাপারের কথা হলেও, সে-কথা এই সূত্রে পরিবেষণ করলে ভাবের দিক থেকে দুরান্বয় দোষ ঘটবে না।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃতি নিরীক্ষার কাজে নেমে একজন অধ্যাপক এই ধরনের বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস অবিশ্যি এক জিনিস,—ইংরেজি কবিতার সংকলন অন্য ব্যাপার! ইতিহাসে যা বলা যায়, কাব্য-সংকলনের মধ্য দিয়ে ঠিক সে-কাজ কি করা যায়? না তা যায় না। কিন্তু সে-রকম সংকলনের আদর্শও ইংরেজিতে আছে কিছু কিছু। যাই হোক, কোনো একটি পর্বের কবিতা সংকলনের কাজে উদ্যত হলে ইতিহাস প্রদর্শনের ঝোঁকটুকু মেনে নিতে পারলে ভালো হয়। সে-জন্যেই এ-প্রসঙ্গের অবতারণা। ইংরেজিতে আলোচ্য ধরনের বই অনেকেই আছে। এখানে তারই একখানির কথা তোলা গেল।

বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই ইংলণ্ডের রাজনীতিতে সংরক্ষণপন্থী দলের পরাজয় এবং উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য ঘটেছিল। উনিশ-শ' ছয় খ্রীষ্টাব্দে সে-দেশের উদারপন্থী দল ক্ষমতা হাতে পাবার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জনসাধারণের যাতে উপকার হয়, এ-রকম কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ডব্লিউ. কানলিফ তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বইয়ের মধ্যে সংক্ষেপে এইসব ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (Workers' Compensation Act), ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র-ভূ-সম্পত্তি আইন (Small Holdings Act),১৯০৮-এ বার্ধক্য-ভাতা-ব্যবস্থা (Old Age Pensions), ১৯১১-এতে জাতীয় বীমা আইন (National Insurance Act),—এবং ১৯১২ সালে ন্যূনতম বেতন আইন (Minimum Wage Act) চালু হয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কয়েক বছর আগে লয়েড জর্জ জাতীয়-বীমা-আইন বিধিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের সেই দীনবন্ধু লয়েড জর্জই যুদ্ধের ধাক্কায় পড়ে অতঃপর যুদ্ধ-বিজয়ের নেশায় মেতে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়। যুদ্ধের দুর্যোগের মধ্যে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া সারা য়ুরোপ প্রচুর পরিমাণে অ্যামেরিকার কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। উনিশ-শ' উনিশ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-চুক্তির সাহায্যে ছিন্ন-ভিন্ন য়ুরোপের আর্থিক দুর্গতি রোধ করবার ক্ষীণ চেষ্টা দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের বুকে দুর্ভাগ্য তার আগেই তার চরম আঘাত হেনে গেছে।

রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে তখনকার সেই ব্যাপক দুর্গতির আবহাওয়া গভীর কোনো শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল যে ছিল না, সে-কথা বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই। সমাজে যখন ব্যাপকভাবে অবসাদ আর অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে, সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রেরণাও তখন দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়।

বিশ শতকের সূচনাপর্বে ইংলণ্ডে অর্থনীতি, বিজ্ঞানসাধনা এবং ধর্মবিশ্বাস, এই তিন ক্ষেত্রেই নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী ইংলণ্ডের যুব-চিত্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে চার্লস ই. জি. মাস্টারম্যান লিখেছিলেন যে, নানা তথ্য ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তই তাঁর কাছে গ্রাহ্য মনে হয়েছিল যে, ইংলণ্ডে খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসে বা খ্রীষ্টানোচিত মনোধর্মে তখন ভাঁটা লেগেছে,—খ্রীষ্টান ইংলণ্ড তখন 'পেগ্যান' হয়ে পড়েছে! এ মন্তব্য যাঁদের কাছে প্রকৃত অবস্থার অতিরঞ্জন বলে মনে হবে, অধ্যাপক কানলিফ তাঁদের জন্যে ধর্মযাজকপুত্র ই. এফ্. বেন্সনের একটি লেখা থেকে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে 'ধর্মবিমুখতার ঢেউ' ('A wave of irreligion') কথাটি স্মরণ করেছেন। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত সারা ইংলণ্ডে এই ঢেউয়ের প্রবলতা অনুভব করা গেছে। যুদ্ধের আগে থেকেই এর সূত্রপাত হয়,—এবং যুদ্ধের চার বছরের মধ্যে তার তীব্র প্রকোপ দেখা যায়। আর, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বার্মিংহামের বিশপ তাঁর লেখার মধ্যে এইকথাই বলে গেছেন বলে কানলিফ উল্লেখ করেছেন।

ধর্মবিশ্বাসের এই দুরবস্থার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। সমুচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক সে-কথাও বুঝিয়েছেন। যে প্রবল অধ্যাত্মবিশ্বাসের জোরে শেক্স্‌পীয়র হ্যামলেটের মুখ দিয়ে বলতে পেরেছিলেন—

'There's a special providence in the fall of a sparrow',—

কিংবা— **'There's a divinity that shapes our ends,**
Roughhew them how we will,

সেই ধর্মবিশ্বাস, পরলোক-ধারণা এবং ঈশ্বর-স্বীকৃতি যদি শেক্স্‌পীয়রের সমকালীন পাঠকচিত্তে একেবারেই না থাকতো, তাহলে তাঁর কথা শুনতো কে? ওয়ার্ডস্বার্থের লেখা থেকেও অধ্যাপক কানলিফ এইরকম অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ের উদাহরণ তুলে দিয়েছেন। শেক্স্‌পীয়রের দু'শো বছর পরে এসে, কবি ওয়ার্ডস্বার্থও বলতে পেরেছিলেন যে, মানব-জীবনের বিচিত্র ঘটনাধারার যাবতীয় বিষাদসত্যের অস্তিত্ব উপেক্ষা না করেও একথা মানতে বাধা নেই যে, অসীম শক্তি ও অশেষ করুণাময় কোনো এক সত্তার সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যেই আমাদের জীবনের যাবতীয় উত্থান-পতন আশ্রিত! আমাদের খণ্ডিত দৃষ্টিতে যে-সব ব্যাপার আপতিক বা পূর্বাপর-সংযোগহীন বলে মনে হয়, সে-সব ঘটনাও আমাদের অগোচর কোনো এক পরমকারুণিক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যবোধের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত![1] তারপর উনিশ শতকের মধ্যপর্বে কবি টেনিসনের 'In Memoriam'-এর মধ্যে দেখা যায় যে কতকটা ক্ষীণভাবে হোলেও তিনিও সেই একই প্রত্যয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন :

'Stretch faint hands of faith, and grope
And gather dust and chaff, and call
To what I feel is Lord of all,
And faintly trust the larger hope.

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্বে পৌঁছে এই আশাবাদ, আস্তিক্য এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাসের জোর আরো কমে গিয়েছিল। অধ্যাপক কানলিফ বলেছেন যে, গত শতকে বিজ্ঞানের প্রতি অতিশ্রদ্ধার ফলে যে অধিযান্ত্রিক নিয়তিবাদ (Mechanistic determinism) দেখা দিয়েছিল,—বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে অন্ধ বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, বিশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যায় নতুনতর গবেষণার ফলে সে-গোঁড়ামির গোড়া আলগা হয়ে যায়। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক স্যর জেম্‌স জীন্‌স্ এবং স্যর আর্থার এডিংটনের আবিষ্কার এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কেম্ব্রিজের গণিতবিদ্ বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই নব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কারণেই লিখেছিলেন যে, আমাদের এতোকালের অভ্যস্ত নিউটনীয় ঘনবস্তুতত্ত্বের ধারণা হরণ করে এ-বিজ্ঞান ক্রমশঃ এক অবাস্তব স্বপ্নমায়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে! ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্ জানান যে, বৈজ্ঞানিকরা আজ জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা পেয়েছেন, সে হয়তো তাঁদের আপন মনেরই ধারণা মাত্র,—মনের বাইরে হয়তো আর কিছুই নেই,—বিজ্ঞান বহু প্রযত্নে যে জ্ঞানের চর্চা করছে, সে হয়তো শুধুই স্বপ্ন, আর আমরা সেই স্বপ্নদ্রষ্টার মস্তিষ্কের কোষ ছাড়া অন্য আর কিছুই হয়তো না হতেও তো পারি![2]

এও অধ্যাপক কানলিফের দেওয়া উদ্ধৃতি। জীন্‌সের কথার পরেই তিনি অক্সফোর্ডের আর-এক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জন স্কট হ্যালডেনের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন যে, হ্যালডেন বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের গুরুত্ব বেশি বলে স্বীকার করেছেন, কারণ বিজ্ঞান

১। 'That the procession of our fate, howe'er
Sad or disturbed, is ordered by a Being
Of infinite benevolence and power;
Whose everlasting purposes embrace
All accidents, converting them to good.'

২। "The universe which we study with such care may be a dream, and we brain-cells in the mind of the dreamer."—Eos, or the Wider Aspects of Cosmogony (1929).

তো আমাদের শ্রেয়ের কথা ভাবে না,—অপর পক্ষে, ধর্ম যে আমাদের শ্রেয়ের দিকে চালিত করে!

ধর্ম এবং নীতিজ্ঞান হয়তো পরস্পরের প্রতিশব্দ! তবে, ধর্ম তো শুধু সঞ্চয়যোগ্য জ্ঞান নয়,—কর্মের মধ্যেই ধর্ম আপনার সার্থকতা খোঁজে। বিশ শতকের শুরু থেকে ইংলণ্ডে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষীণতা আর নৈতিক শৈথিল্য তাই পাশাপাশি অথবা যুগপৎ দেখা দিয়েছিল। লণ্ডনের বস্তিজীবন সম্বন্ধে জন মার্টিন নামে এক ভদ্রলোকের উল্লেখযোগ্য আলোচনা ছাপা হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সে বইখানির নাম '*A Corner of England*।' তাতে জন মার্টিন জানিয়েছিলেন যে, সে-সময়ে বস্তি অঞ্চলের ইংরেজ অধিবাসী চুরি বা মোটর-ডাকাতিতে নাম করতে পারলে পাড়ায় তার মর্যাদা বাড়তো! হয়তো বস্তি-জীবনের নৈতিক আদর্শ সব দেশেই সমান! ইংলণ্ডের ক্ষেত্রেই বা সে লোকব্যবহারে ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? কিন্তু মার্টিনের এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কানলিফ আরো একটু মন্তব্য জুড়ে দিয়ে জানিয়েছেন যে, বস্তির বহির্বর্তী সম্মানিত ভদ্রসমাজের মধ্যেও পুরোনো নীতিবোধের বিচ্যুতি একালের অনস্বীকার্য ঘটনা।

এইভাবে গত শতকের সঙ্গে বর্তমান শতকের তুলনার ফলে পাঠকের মনে এরকম বিশ্বাস দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় যে, উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকের ইংরেজ বুঝি জাতিগতভাবে হীন হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক বেশ জোরের সঙ্গে সেটাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সে দেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম এবং সুখসম্পদের উত্তরোত্তর উন্নতিই চোখে পড়ে। অতএব অধ্যাপকের এ-সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত যে, বর্তমানে সৃজনী প্রতিভার লালনের পক্ষে সেদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা যতোই প্রতিকূল মনে হোক, সেখানকার সাহিত্যিক-মহলে বস্তুজগতের আনুকূল্য একালে বেড়েছে বই কমেনি। তাছাড়া উনিশ শতকের শেষ দশকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব-আইন প্রবর্তিত হবার ফলে ইংরেজ লেখক-পাঠকের কাছে মার্কিন সাহিত্যের প্রচার বেড়ে গেছে; ; নাটক আর উপন্যাসের মহলে উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ ঘটেছে; ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি জেম্‌স্ তো তদানীন্তন নবীন ইংরেজ কথাসাহিত্যিকদের যৌন-প্রসঙ্গবীক্ষার সৎ-সাহসের প্রশংসাই করে গেছেন; মনোবিজ্ঞানের আগ্রহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ফলে নিঃসংকোচ বিশ্লেষণেরও আর কোনো বাধা রইলো না! নারীজগতেও স্বাধীনতাবোধের এবং দায়িত্ববুদ্ধির সুযোগ এলো। অধ্যাপক কানলিফ দেখিয়েছেন যে, এই শতকে নানাবিধ প্রচারের কাজে উপন্যাস এবং নাটকের প্রচলন তো বেড়েইছে, তাছাড়া রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের দিকে এরকম ব্যাপক আগ্রহ ইতিপূর্বে আর কখনোই দেখা যায়নি।

আর বেশি কথা নিষ্প্রয়োজন। একজন বিদেশী অধ্যাপকের লেখা বিদেশের সমাজ

এবং সাহিত্যের এই বিশ্লেষণ এখানে এই উদ্দেশ্যেই স্মরণ করা গেল যে, উনিশ শতকের শেষার্ধ আর বর্তমান শতকের প্রথম দশকান্ত মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ-ষাট বছরের বিস্তারে, সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থ সম্পর্কের ঢেউ খেতে খেতে এ-পর্বের বাঙালী কবিদের মন যে কী পরিমাণে বদলেছে, এ-সময়ের কবিতাবলীর আদর্শ একখানি সংকলনের ভেতর দিয়ে সেটা ভালোভাবেই দেখিয়ে দেবার সুযোগ ছিল। কিন্তু আলোচ্য সংকলনের সম্পাদকরা আহরণে যতোটা উৎসাহী, নির্বাচনে সে-রকম নন। বাংলায় এ-রকম বিশ্লেষণভিত্তিক একখানি কবিতাসংকলন সম্পাদিত হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ?[৩]

আধুনিক বাংলা কাব্য প্রসঙ্গে

কনফুশিয়াসের কথামৃতের মধ্যে লক্ষ্যভেদের কথা দেখেছিলাম। তীরন্দাজ তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সে বাণ লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধলো না। তখন তাঁকে নিজের বিজ্ঞানের কাছেই পুনরায় ফিরে যেতে হয় ; নিজেকেই জিগেস করতে হয়, নিজেকেই বিচার করতে হয়, নিজের সামর্থ্যের ত্রুটি নিজেকেই শুধরে নিতে হয়। কনফুশিয়াস বলেছিলেন যে, সংসারে একদল লোক আছেন, যাঁরা কর্তব্যজ্ঞানে যথোচিত সমৃদ্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন,—আর এক দলকে সেটা অনেক কষ্টে দিনে-দিনে পেতে হয়, ঠেকে শিখতে হয়। কিন্তু যে-ভাবেই হোক্, সে জ্ঞান একবার যখন আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন আর ভাবনা থাকে না—কারণ, কেউ সেটা সহজে মেনে চলে, কেউ বা প্রচুর প্রয়াসে।

কবিতার জন্মরহস্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনো মীমাংসায় পৌঁছোনো আজও সম্ভব হয়নি, সত্যি। কবিদের লক্ষ্যভেদ-ব্যাপারটা কি নিছক প্রেরণা, না-কি ঐকান্তিক প্রয়াস ? সে কি সজ্ঞানে শব্দ, ছন্দ, রূপক ইত্যাদির বিন্যাস, চর্চা, সম্ভোগ,—না-কি অজ্ঞানে বিশেষ বিভূতি-লাভ ? কবি অপার কাব্যসংসারের প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো নিরঙ্কুশ,—না-কি তিনি পাঠকের প্রত্যাশী, সামাজিকের সমবেদনা-প্রার্থী ? বাংলা কবিতার গত বিশ-পঁচিশ বছরের ইতিহাসে একদল পণ্ডিত-কবির ভঙ্গিমাগত দুরূহতার ফলে পাঠকরা এ-সব কথা কখনো সরবে জিগেস করেছেন, কখনো বা নীরবে। কিন্তু সমাধান অসম্ভব ! কারণ, নূতনত্বের নেশা দুর্নিবার ! এবং যথার্থ শিল্পরূপের সীমা নির্ণয় করে দেওয়া একমাত্র তাঁদেরই সাধ্য, যাঁরা নিজেরা শিল্পী। পাঠক যেহেতু কবি নন, সেই কারণেই তিনি উপেক্ষার পাত্র—এই মনোভাব হয়তো কবিদের মজ্জাগত। তাঁরা মুখে না বললেও এরই প্রকাশ দেখা যায় কারো কারো পাণ্ডিত্যের ঢঙে, কারো-বা ভাবনার ভঙ্গিতে।

৩। উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মডার্ন বুক এজেন্সি। কলিকাতা ১২। মূল্য বারো টাকা।

আরো মুশকিলের কথা এই যে, য়ুরোপ-মার্কিনমুলুকে নতুন নতুন কসরতের যেন অন্ত নেই! আমরা হয়তো সেই দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হয়েছি। সত্যিকার বেগবান, বলিষ্ঠ মন চাঞ্চল্য এড়িয়ে যে একেবারেই না-চলতে পারে, তা নয়। কিন্তু যেখানে চারদিকের দৃশ্যক্ষেত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে, অতীতের দেহভস্মে বর্তমানের নবাঙ্কুর যেখানে অনিবার্যভাবে দৃশ্যমান,—একটা প্রথা দেখা দিতে না দিতেই আরো কচি এবং আরো কাঁচা কোনো কায়দার কনুইয়ের জোরে দুদিনেই তা উৎপাটিত হয়ে যায়,—এবং আর-একটা প্রথা এসে একরাত্রির জোনাকির মতন তখুনি জ্বলে ওঠে, সেখানে সজ্ঞানে নতুন নতুন কায়দা দেখানো একটা ব্যাপক জাতীয় স্বভাবে পরিণত হতে পারে! পশ্চিমে যে হুবহু তাই হচ্ছে, সে-কথা নয়। কিন্তু কবিতা লিখতে বসে ভাবনার ধারাচিহ্নের এখানে-ওখানে কিছু-কিছু মুছে দিয়ে বিষয়টি দুর্বোধ্য করে তোলবার খেলা,—দূর, দূর প্রসঙ্গের অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটিয়ে পাঠককে প্রতিকূলভাবে বিচলিত করবার ব্যসন এবং আরো সব বিচিত্র নতুনত্বের উৎপাত সে-দেশে কম ঘটেনি। তবু, এসব অভ্যাস থেকেও সেখানে শক্তিমান কবির অভ্যুদয় ঘটছে। ইংরেজি বা ফরাসি যাঁদের মাতৃভাষা নয়, এ-সব ভাষাতে যৎসামান্য বিদ্যা অর্জন করেই কি তাঁরা সে-সব অভ্যুদয়ের যথার্থ স্বাদ পেতে পারেন? মধুসূদন বিদেশ থেকেই অমিত্রাক্ষর এনেছিলেন বটে। কিন্তু সেটা ছিল অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য চাহিদা। ভাবের প্রবাহ যান্ত্রিক অথবা কৃত্রিম কোনো বাধা মানবে না, এটা বুঝতে সেকালেও বিশেষ দেরি হয়নি,—যদিও দু-দশ জন তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলেন এবং একা মধুসূদন ছাড়া আর-কারও কলমেই সে ছন্দ ঠিকমতন ধরা দেয়নি। তাঁর অন্যান্য আমদানির মধ্যে চতুর্দশপদী, মহাকাব্য, আধুনিক নাট্যরীতি ইত্যাদিও একালের অন্যান্য আমদানির তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব শিল্প-প্রয়োজন মিটিয়েছিল। কিন্তু শুধু কায়দার জন্যেই কায়দা, নতুনত্বের জন্যেই নতুনত্ব—বাংলাদেশের এই নেশা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে 'আধুনিক' কবিদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর মতো প্রথা ভেঙেছেনই বা ক-জন? তাঁর মতো আত্মস্থতা পাওয়া অবিশ্যি ভাগ্যের কথা! কিন্তু শক্তিমান শিল্পী-মাত্রেই কিছু যে ভাঙবেন, কিছু যে গড়বেন,—এবং দর্শক, পাঠক ও শ্রোতার সহযোগিতা তাঁরা প্রত্যাখ্যান যে করবেন না,—বরং সত্যিকার অভিজ্ঞতার তাড়নায় শিল্পী তাঁর নতুন অধিকার প্রবর্তিত করবেন এবং অন্য পক্ষ সে নতুনত্ব সাগ্রহে মেনে নেবেন,—এটাই তো স্বাভাবিক প্রত্যাশা! আর যাই হোক, স্বাধিকারপ্রমত্ত মানুষের সঙ্গ প্রীতিকর নয়! জগতে লেনদেন চাই, যোগাযোগ চাই,—আদান না হলে প্রদান ঘটবে কী উপায়ে?

বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে,—দুজন প্রতিষ্ঠিত কবির দুখানি সাম্প্রতিক কবিতা-সংগ্রহ একসঙ্গে হাতে পেয়েই এসব কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এঁদের প্রাবীণ্য আর পরিণতির ভাবনা এখন ভাবতেই হয়,—সেই ভাবনার সঙ্গে গত বিশ-পঁচিশ বছরের কি তারও বেশিদিনের বাংলা কবিতার ভাবনা নিশ্চয় আনুষঙ্গিকভাবে জড়িত। 'শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর'-এর পরে বুদ্ধদেবের 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বেরুলো। আজকাল আর দুর্বোধ্য কবিতার দিকে বিষ্ণু দে-র মন নেই; তিনি এখন সহজ হয়েছেন,—এ-জনমতের অনুকূল সাক্ষ্য দেবে তাঁর 'আলেখ্য'। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-জানানো কবিতা এঁরা দুজনেই লিখেছেন। বুদ্ধদেবের এই আলোচ্য বইয়েতেও একটি আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'প্রতিযোগিতার পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়'; তিনি কেবল চেষ্টাই করেছেন বা করে থাকতেন,—রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন অন্তত সেই সব লোকের মনে এরকম ধারণা দেখা দেওয়া কোনোকালেই যে সম্ভব ছিল না, সেকথা বুদ্ধদেব ঠিকই বলেছেন এবং আরো ঠিক বলেছেন—

'যেন তুমি কখনো করো নি
চেষ্টা, কিংবা যেন কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।'

অথচ চেষ্টার নানান উৎকট লক্ষণ দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্র-গোধূলি পর্বের খ্যাতিমান 'আধুনিক'দের মধ্যে। সেটা অসংগত হলেও অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে গ্রহান্তরে যেতে হলে একটা বিপরীত উদ্যম দরকার হয়। তাঁরা সেইরকম অভিপ্রায়বশেই নতুন ভঙ্গির উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তিরিশের দশকের পরে চল্লিশের দশক গেছে, পঞ্চাশও যায়-যায়! এখন এবং ইতিমধ্যে দেশের এবং বিশ্বের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের বাঁধুনি আজকাল আলগা হয়ে গেছে কিংবা তার ভিৎ ভেঙে যাচ্ছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব সেই ভিতেই যাঁদের নির্ভর, সেইসব শিল্পীর রচনাতে আমাদের এ পরিবর্তন যে যথেষ্ট চিহ্ন রেখে যাবে, সেটা আশা করা অনুচিত নয়। বিষ্ণু দে-র 'আলেখ্য' সে-বিষয়ে পুনরায় অনুকূল সাক্ষ্য দেবে। মোট সাতচল্লিশটি কবিতার অনেকগুলিতেই পারিপার্শ্বিক জীবন-সংবাদ আছে,—সে শুধু সংবাদ নয়, আলেখ্য! তাতে ব্যাখ্যা, সংকেত, আত্মজিজ্ঞাসা এবং হৃদয়ের বক্তব্য আছে। উল্টাডিঙি, নাকতলা, শেয়ালদা অঞ্চলের অতি স্থূল, পরিদৃশ্যমান পারিপার্শ্বিকতার [আলেখ্য—৮] কথাই শুধু নয়,—মানুষের অন্তরের কথা আছে, আছে গভীরের প্রতিধ্বনি! যেমন—

'শক্তিকে বড়ই ভয়, শক্তি কিংবা শক্তির লুব্ধতা
অথচ এও তো জানি : শক্তির সাহায্য বিনা কিছু সাধ্য নয়।'

এবং,

'শক্তি বড় ভয়ানক, যে-কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের
যে-কোনো সুযোগ।'

এমনকি, শিল্পীর নিগূঢ় সৃষ্টি-শক্তিকেও তিনি যথেষ্ট নিরাপদ মনে করতে পারেননি। আমাদের বর্তমান সময়ের চিহ্ন আছে তাঁর এই মননে। পরিশেষে এক কাল থেকে অন্য কালে এগিয়ে যাবার আশা ফুটেছে তাঁর রচনায়:

'শক্তি বড় ভয়ানক, হোক যত আবশ্যিক, সিদ্ধকাম, দুর্নিবার;
তার চেয়ে ভয়ানক অনভ্যস্ত শক্তির লুব্ধতা।
শক্তিকে ছড়াব কবে জনে জনে ঘরে ঘরে দেশে দেশে
হাওয়ায় যেমন বাষ্প তাপ হিম থাকে স্তরে স্তরে! (—হাওয়ায় যেমন)'

তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যপ্রবাহ থেকে এসব কথা যাঁরা আলাদা করে তুলে দেখবেন, তাঁদের চোখে পনেরো-বিশ বছর অথবা তারও আগেকার চিন্তা-চেষ্টাময়, প্রদর্শন-প্রয়াসী বিষ্ণু দে-ই হয়তো অপরিবর্তন এক স্বভাবের প্রতীক হিসেবে পুনরায় প্রতিভাত হবেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে না দেখলে তাঁর একালের আসল পরিচয় সম্বন্ধে সংশয় দূর হবে না। বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দে, দুজনেরই পঞ্চাশ বছর বয়স হোলো। এ বয়সে ভাবুকের মন অন্তর্মুখী না হয়ে পারে না। সে অন্তর্মুখিতার চিহ্ন আছে আলোচ্য দুটি বইয়েতেই। বিষ্ণুবাবুর 'সনেট', 'স্মৃতির গোধূলি', 'বহুরূপী', 'এক যুগের সংলাপ',—বুদ্ধদেববাবুর 'শিল্পীর উত্তর', 'কবি: তরুণ ও প্রৌঢ়', 'পঞ্চাশের প্রান্তে' প্রভৃতি তারই নমুনা। তফাত এই যে, বিষ্ণু দে যত নিবিড়, বুদ্ধদেব তাঁর এ-বইয়ে ততটা নন। বরং তাঁর শীতের প্রার্থনা আরো স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়েছিল। সেখানকার কুকুরের প্রতীকও বিষয়গুণে সার্থক ছিল। তাঁর যাত্রী-মনের বিষাদ, প্রশান্তি, জিজ্ঞাসা ফুরোয়নি বটে, কিন্তু আবার বেশ জোর করে নেমেছে আঙ্গিকের আড়ম্বর, প্রযুক্তির ঘষা-মাজা! হয়তো সেই কারণেই 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এতে আলোর চেয়ে অন্ধকার কিছু বেশি মনে হয়। তবে এও ঠিক যে, সে অন্ধকারের সবটাই মেকি নয়। তাতে আত্মচিন্তাময় কবিরও কাজ আছে এবং সেই সঙ্গে আত্মবিস্মৃতিময় ভঙ্গিরও উৎপাত ঘটেছে। প্রাচীন কাব্য-পুরাণের দিকে উভয়েই উন্মুখ। বিষ্ণু দে আগেও তাই ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সে ঝোঁক আগে অপেক্ষাকৃত কম ছিল, আজকাল বেড়েছে। 'জন্মাষ্টমী—১৩৫৪'-তে বিষ্ণু দে পর-পর কপিলগুহা, নচিকেতা, ত্রিশঙ্কু, চিত্রগুপ্ত, ভীষ্ম, ভগীরথ ও জহ্নুমুনির নাম করেছেন। অন্যান্য অনেক লেখাতেই অনুরূপ লক্ষণ আছে। বুদ্ধদেব বসু-র কচ-দেবযানী প্রসঙ্গ সেদিক থেকে একসূত্রে স্মরণীয়। কিন্তু মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের পরে তৎপ্রসঙ্গে তিনটি রচনার পরম্পরান্বয় পরিবেষণ করেও বুদ্ধদেব পূর্বগামীদের

এতৎপ্রাসঙ্গিক সিদ্ধির বহু যোজন দূরে থেকে গেছেন। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে এসে কচ-দেবযানীর সুদূর ও চিরন্তন হৃদয়বেদনায় 'ক্ল্যাসিক' মূর্তিটাই মন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ভাষার গাম্ভীর্য ভেঙে দেওয়াটা সব ক্ষেত্রে সংগতও নয়, সাধ্যও নয়—এই সূত্রে সেই কথাটাই বিশেষভাবে মনে পড়ে।

'মণি, আমার মণি, আমার সোনা,
তোমার পরে নাস্তি শুধু
রইলো আরাধনা।'

—বিচ্ছিন্নভাবে এ-ভাষার অথবা এ-সুরের যে স্বাদই থাক,—'দেবযানীর স্মরণে কচ', এই শিরোনামের ইশারা মনে রাখলে অভিপ্রেত বোধও পীড়িত হয়, বাঞ্ছিত বেদনাতেও পৌঁছোনো সম্ভব হয় না। তবে, এ-সব কথা অনুরাগী মনের সহজ বিনয়সহকারে প্রকাশ করা গেল। বলতে গিয়ে ভয় হয়, ভুল বোঝবার সম্ভাবনা রয়ে গেল বুঝি! তাই সংক্ষেপে পুনরায় বলা যেতে পারে যে, 'মণি, আমার মণি, আমার সোনা'—এই উচ্ছ্বাসটা কেমন যেন হালকা মনে হয়। কচ-কে এতকাল পরে হালকা হতে দেওয়া একরকম নতুনত্ব বটে, কিন্তু সব নতুনত্বই কি আদর্শ? কচ-দেবযানী প্রসঙ্গ ছাড়া বুদ্ধদেব বসুর এ-বইয়ে 'অর্জুনের প্রতি—কোনো নামহীনা' নামে একটি কবিতা আছে। তাতেও পুরাণ বা প্রাচীন কাব্যের প্রতি আগ্রহের যথেষ্ট গ্রাহ্য কারণ নেই। তবে, সেরকম নিমিত্তান্বয় ব্যতিরেকেও সেটি সুখপাঠ্য। তেমনি এ-বইয়ের গ্যেটের অষ্টম আর নবম প্রণয়ের ওপরে লেখা দুটি কবিতা। 'স্মৃতির প্রতি' শিরোনামে,—'রাত তিনটের সনেট' পর্যায়ে—এবং 'না-লেখা কবিতার প্রতি', 'আটচল্লিশের শীতের জন্য', 'প্রেমিকের জন্য'—এ-সব প্রসঙ্গেও তিনি পর্যায়ক্রমিক একাধিক কবিতা লিখেছেন। হয়তো একই বিষয়ে একাধিক লেখা আপনিই এসেছে। বইয়ের মধ্যে পর্যায়বন্ধের ঝোঁকটা হয়তো সত্যিই আপতিক ব্যাপার। তবু এ-কথাও মনে জাগতে পারে যে, বাংলা কবিতায় এ বোধ হয় আর-এক কৌশলের খেলা! বিষ্ণু দে-র 'একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা'ও একই আঙ্গিকের নমুনা। তাঁর 'জন-তিনেক ভগ্নহৃদয়',—বইয়ের নাম-কবিতা 'আলেখ্য',—'রাগমালা' ইত্যাদিতেও প্রসঙ্গগত ঐক্য বজায় রেখে একাধিক রচনা-সংযোগের খেয়াল ধরা দিয়েছে। একই কালের এক বা একাধিক কবি যখন একই খেয়ালের বশবর্তী হন, তখনই কবিতার এক-একটা বিশেষ অভ্যাস বা মুদ্রাদোষের জন্ম হয়। লক্ষণটি সেদিক থেকেও উল্লেখ দাবি করে। আর, লাইন সাজানোর খেয়ালে বুদ্ধদেব বিবিধ কৌশলময়। একটি পুরো কবিতা তুলেই দেখা যাক:

'আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ: এই দেহ ম্রিয়মাণ;

দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ ;
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়

অবিরাম চলে অধঃপাত
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।'

চোদ্দ লাইনের বিন্যাসে প্রথমে চার-চার লাইনের গুচ্ছ বাঁধা হয়েছে ; শেষে তিন-তিন লাইনের আর-দুটি গুচ্ছ দেখা যাচ্ছে এখানে। অন্ত্য-মিলের দিকে নজর দিলে প্রথম দুটি গুচ্ছে দেখা যায় কখখক এবং গঘঘগ—বিন্যাস ; আর, শেষ দুটির অন্ত্যস্বভাবটা মিশ্র হলেও চচঝটঝট—সমাবেশ চোখে পড়ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কবির মনে ভাবনার স্রোত বা ঢেউ বা আলো বা অন্ধকার কি ঠিক এই ধরনের লাইনবন্দী চেহারার জন্যে উন্মুখ ছিলো ? যদি লেখা যায়—

'আমাদের পরিবর্তনের অর্থ—
এই দেহ ম্রিয়মাণ ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান।
তাও শুধু—
পিতৃহননের নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরায়।'

—তাহলে এ কবিতার প্রথম পাঁচলাইনের যা বক্তব্য, তার কি কোনোরকম হানি হয় ? মিল, লাইন, স্তবক—বুদ্ধদেব বাবুর লেখায় এ-সবই অশেষ চেষ্টায় বানানো, সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন ? কনফুশিয়াসের সেই তীরন্দাজ কি অতঃপর আত্ম-জিজ্ঞাসায় উদ্যোগী না হতেন ?

বিষ্ণু দে-ও কায়দা দেখান বটে, কিন্তু 'আলেখ্য' বইখানির মধ্যে উগ্র কোনোরকম

কলাপ্রদর্শনী নেই। বরং বুদ্ধদেবের 'মরুপথ'-এর শেষ দু-লাইনে এসে পাঠককে ভাবতেই হয় যে, একজনের স্বভাব অন্যজনের মধ্যে বর্তালো নাকি? মরুভূমির খরতাপে পুড়ে-পুড়ে লোকটা শেষে যখন একটু জলের হদিস পেয়েছে, এবং—

'হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে, আঙুল পাগল হয়ে খুঁড়ে তোলে জল :

তখন—

'অল্প জল, তৃষ্ণার যথেষ্ট নয়। তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর বীজাণু ছড়িয়ে দেয়;
সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফলে ওঠে ফল ;'

সাধারণ বাঙালী মরুভূমি, মরীচিকা, উট, বালি, উত্তাপ, মরূদ্যান ইত্যাদি মরুপ্রসঙ্গের অনেক খবর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল; কিন্তু 'কনুইয়ের লোমকূপে ফলে ওঠে ফল'—ব্যাপারটা তাঁদের কাছে যদি দুর্ভেদ্য মনে হয়, তাহলে সে কি তাঁদেরই মূঢ়তা মনে করতে হবে—না-কি কনফুশিয়াসের সেই তীরন্দাজের গল্পই কবির পক্ষে সেক্ষেত্রে পুনরায় স্মরণীয়? কবিতার সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে এই বইয়েরই 'মিল ও ছন্দ' লেখাটার মধ্যে বুদ্ধদেব নিজে বলেছেন :

'অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে দূর
কিছুই বলে না, শুধু ভেদ করে বেজে ওঠে সুর—
সুর নয়, শূন্যতায় তার বেঁধে নিঃশব্দে বাজায়
দেবতা, নির্জ্ঞান মন, নাকি এক চতুর শয়তান?'

মনস্তত্ত্বের কথা মনস্তাত্ত্বিক ভাবুন। কবির আত্মবিশ্লেষণের মর্জিতেই বা আপত্তি হবে কেন? কিন্তু তর্ক, তত্ত্বজ্ঞান, গুরুপাণ্ডিত্য,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস,—কবিতার বৃহৎ আশ্রয়ে এদের প্রত্যেকেরই যদিও জায়গা হওয়া অসম্ভব নয়, তবু এদের পৃথক-পৃথক অথবা সমাহারময় তান্ত্রিকতার নাম কবিতা নয়! নয়, নয়, নয়!

পাঠকের পক্ষে এর বেশি নিবেদন নেই। 'যে আঁধার আলোর অধিক'-এর সামগ্রিক আবেদনের কথাসূত্রে শুধু এইটুকু মনে আসছে যে, কবি তাঁর পূর্বকথাই এতে পুনরায় প্রকাশ করেছেন। বইয়ের নাম দেখে 'আলো'-র প্রত্যাশী ছিলাম, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বিষাদবোধ, নৈরাশ্য এবং তর্কবিতর্কই এতে আর-একবার দেখা গেল। বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেছেন :

'হতে হবে আর কতকাল
একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল!'

অর্থাৎ কবির চেতনায় দুঃখের কাঁটা বিঁধে আছে। সে দুঃখ থেকে সত্যিকার বড়ো সৃষ্টি কি সম্ভব হবে?

অপরপক্ষে বিষ্ণু দে শুধু 'সহজ'-ই হননি—তিনি নতুন উৎসাহে আরো যেন 'সুখী'

হয়েছেন। বুদ্ধদেব যেমন তাঁর একটি কবিতায় গভীর রাত্রির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে লোকে যাকে 'রাত' বলে, সে-রকম রাত্রিমাত্র নয়! নক্ত, যামিনী, নিশীথিনী, রজনী ইত্যাদি অনেক শব্দের মধ্যে কবিমনের সেই গভীর অভিজ্ঞতার 'রাত' ছড়িয়ে আছে,—বিষ্ণু দে-র 'আলেখ্য' পড়তে পড়তে তেমনি তাঁর সম্বন্ধে 'সুখী' কথাটাই প্রথমে মনে এল। আরো ভেবে দেখলে ও-কথা বদলে দিয়ে হয়তো অন্য কিছু বলবার ইচ্ছে হবে। হয়তো, তাঁর প্রৌঢ় পরিণত মনের এ-এক পূর্ণতার আভাস! হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অভ্যাস থেকে বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে যাওয়া! সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অভীপ্সিতার একাত্মতা তাঁর বোধে এল। কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের থেকে এ মর্জির ব্যবধান যৎসামান্য। তবু, একে নতুন বলতেও বাধা নেই!

'বৃষ্টি নামে, পৃথিবী তো আর-এক নাম
তোমারই, কোথায় তুমি? কর্মরত, দৃঢ়বদ্ধনীবি
যেখানেই থাকো তুমি, বৃষ্টি নামে, মেঘে মেঘে যাই,
একাকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মেদিনীমেখলা
অথবা পাহাড় শাল অরণ্যের খাড়াই উৎরাই
ঢাকি একই আলিঙ্গনে বিদ্যুতে ও বজ্রে দিই ডাক
তোমাকে, যেখানে থাকো বাষ্পে বাষ্পে জড়াই চঞ্চলা!'

(—বৃষ্টি চলে, বৃষ্টি অবিরাম)

অবশ্য জীবনের আরো নানা দিক আছে। প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যও তিনি এ-কালের চোখ দিয়েই দেখেছেন। সে সৌন্দর্যের নাম 'বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরাম'। কথাটা তাঁর উপলব্ধিরই ইশারা। তাঁর এইসব কবিতার বিশেষ-বিশেষ শিরোনামে, এবং অনেক লাইনের মধ্যেও সত্যিকার সংহতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। 'শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে',—'শান্তি নেই জীবনের এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে' এবং এই ধরনের আরো কোনো-কোনো উক্তির মধ্যে সংযতবাক্, সুরসিক, মগ্ন অথচ সজাগস্বভাব যে-কবিকে বেদনা প্রকাশ করতে শোনা গেল, তিনি হতাশ নন, বিষণ্ণ নন, ব্যঙ্গমুখর নন। তাঁকে আমাদের সম্বন্ধে সমবেদনাময়, একজন আধুনিক, শক্তিমান এবং সুখী কবি বলেই চেনা গেল।*

[রচনাকাল ১৩৬৫]

* 'যে-আঁধার আলোর অধিক'—বুদ্ধদেব বসু। এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ২'৫০
'আলেখ্য'—বিষ্ণু দে। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য ২'৫০

এ যুগের মন ও মহাকাব্য

১৩৬৩ সালের আষাঢ় মাসে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশায়ের 'কি লিখি' বইখানি বেরিয়েছিল। সে-বইয়ের মোট এগারোটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশকালের দিক থেকে প্রথমটির নাম 'প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ'। ১৩২৪-এর বৈশাখ সংখ্যার 'প্রতিভা' পত্রিকায় সেটি ছাপা হয়েছিল। ১৩৫৭ সালের তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যার 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বাংলা বিরামাদি চিহ্ন' সে-বইয়ের সাম্প্রতিকতম প্রবন্ধ। বাংলার প্রাচীন পুঁথি, বানানেব বিশেষত্ব, বিরামাদি চিহ্ন, 'বাংলা ভাষার লিখন পঠন' ইত্যাদি বিষয়ই তাঁর নিজস্ব বিষয়, সন্দেহ নেই। 'বাংলা ভাষাব প্রসার চিন্তা' নামে একটি প্রবন্ধ আছে এতে; ১৩৫৬-র আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সেটি প্রথম ছাপা হয়েছিল। তাঁর মন ব্যাকরণ-ঘেঁষা এবং তাঁর স্বভাব পণ্ডিতজনোচিত। বাংলা ভাষারীতির দুটি প্রসিদ্ধ রূপভেদ বোঝাতে গিয়ে সাধারণতঃ 'সাধুভাষা' আর 'চলিতভাষা' বলা হয়ে থাকে; কিন্তু যোগেশচন্দ্র তাঁর 'কি লিখি' প্রবন্ধে এই দুটি শ্রেণীর নাম দিয়েছেন 'লৈখিক' ও 'মৌখিক'। সাহিত্যের অভিপ্রায়গত শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে তিনি 'জ্ঞান-সাহিত্য', 'ক্রিয়া-সাহিত্য' এবং 'ইচ্ছা-সাহিত্য' এই তিনটি অদ্ভুত ধরনের নাম ব্যবহার করেছেন। ব্যাখ্যা-সূত্রে এই বিভাগের জের ধরে তিনি বলেছেন, 'যে রচনায় পাঠকের অন্তর্জ্ঞান-বৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা জ্ঞান-সাহিত্য। যেমন দর্শন। কর্ম শিখাইবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ, সে-উপদেশ ক্রিয়া-সাহিত্য। যেমন ইতিহাস, বিদ্যা ও কলা। যাহাতে মিথ্যা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয়, সেটা ইচ্ছা-সাহিত্য।'

এই 'জ্ঞান', 'ক্রিয়া', 'ইচ্ছা'র বিভাগ যথার্থ সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের পক্ষে কতদূর উপযোগী, সে-বিচার সময়-সাপেক্ষ। উপন্যাস প্রভৃতিতে মিথ্যা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয় বটে, অতএব উপন্যাস 'ইচ্ছা-সাহিত্যে'র পঙ্ক্তিভুক্ত! 'ক্রিয়া-সাহিত্য' ব্যাপারটি একটু অস্পষ্ট। কবিতাকেই বা কি বলা যাবে? 'কর্ম শিখাইবার অভিপ্রায়ে' ইতিহাসই বা কী ভাবে লেখা হয়?

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' পড়তে পড়তে এসব কথা মনে এলো। ভক্তের দল এ-রচনায় গভীর আবেদন বোধ করে থাকেন। অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতরাও বইখানির প্রশংসা করেছেন। এতে গভীর কথা বলা হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-সব যাই হোক, এ-কাব্যের কাব্যমূল্য কী? এ-কালের মন থেকেই এ-কালের মহাকাব্য দেখা দিতে পারে। কবিতার অভ্যস্ত ধারণা বদলাতেও আপত্তি নেই। কবিতা আমাদের অন্তর্জ্ঞানও বাড়াতে পারে। যাঁরা কর্মী অথবা দার্শনিক, স্বভাবের দিক থেকে তাঁরাও

কবি হতে পারেন। যেমন, জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান-মন্দির জাতির কল্যাণার্থে সমর্পণ করবার সময়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর বত্রিশ বছরের বিজ্ঞান-চর্চার কথাসূত্রে জগতের নানা বিচিত্রতার অন্তর্নিহিত ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা গেছে যে, সেই অনুষ্ঠানের তেইশ বছর আগে নিজের গভীর মনে তিনি এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, একজন মানুষের পক্ষে যতটা আগ্রহ, আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান চর্চায় উদ্যত হওয়া যায়, তাঁর দিক থেকে সে-রকম আত্মনিয়োগে কার্পণ্য ঘটবে না! তারপর, কাজে নেমে, নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি একদিকে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে শারীরবৃত্ত,—ক্রমশঃ এই দুই শাস্ত্রের সঙ্গম-সন্ধিতে এসে পৌঁছেছিলেন। প্রাণী এবং অ-প্রাণী,—এই দুই পৃথক জগতের প্রভেদ মুছে গিয়েছিল তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে। ইংলণ্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি'র প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি যখন তাঁর সে আবিষ্কারের কথা জানান, তখন সেই পণ্ডিতসমাজের মধ্যে যাঁরা ছিলেন শারীরবৃত্তবিদ্, তাঁরা স্ব-ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠ থাকবার পরামর্শ দেন—অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষক শারীরবৃত্তের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ না করলেই সমীচীন হয়,—এই ছিল তাঁদের অভিমত।

পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র সে-পরামর্শ শুনেও ছিলেন, এবং তা ভেবে দেখতেও তিনি আপত্তি করেন নি। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় নেমে জ্ঞানের গণ্ডি অত্যন্ত সীমিত করে রাখবার সংকীর্ণতা তাঁর পছন্দ হয় নি। মানুষের সব রকম জিজ্ঞাসার পরম সমাহার এবং অখণ্ড সমাবেশের মধ্যেই সত্যসন্ধানীর যথার্থ অবস্থান! পৃথক পৃথক বিজ্ঞানশাখায় পারস্পরিকতা তো বটেই, এমন কি বিজ্ঞানের সঙ্গে ললিতকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগের আবশ্যিকতাও তিনি বিশেষ আবেগের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন। ১৯১৭ সালের সেই বক্তৃতার মধ্যে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

> 'In this Institute, this Study and Garden of Life, the claim of art has not been forgotten, for the artist has been working with us, from foundation to pinnacle, and from floor to ceiling, in this very Hall. And beyond that arch, the Laboratory merges imperceptibly into the garden, which is the true laboratory for the study of life.'

পরীক্ষাগারের ইট, কাঠ, যন্ত্র-সমাবেশের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির এই আশ্চর্য সংযোগের উপলব্ধি তাঁর কবিমনের পরিচায়ক। কেবল পৃথকের সমাবেশবোধ মাত্র নয়,—বিচিত্রের অন্তর্লীন গভীর ঐক্যের অনুভূতি ছিল তাঁর মনে। শেষ জীবনে

নিজের প্রথম জীবনের স্মৃতিকথা বলতে বলতে তাঁর 'অব্যক্ত' [প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩২৮] বইখানির শেষ প্রবন্ধ 'হাজির'-এর শেষ দিকে তিনি জানিয়েছিলেন—'কলে কেন ক্লান্তি হয়? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল। সে-সব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবন-হীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্পাধিক-কালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।'

পাশ্চাত্ত্য জগতের আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার কথাসূত্রে তিনি ১৯১৭ সালের সেই ইংরেজি রচনার মধ্যেই বলেছিলেন :

'Excessive specialisation in the West has led to the danger of losing sight of the fundamental fact that there can be but one truth, one science which includes all the branches of knowledge.'

এই সত্যবোধই তাঁর মনে আর এক প্রশ্ন জাগিয়েছিল :

'How chaotic appear the happenings in Nature ! Is Nature a cosmos in which the human mind is some day to realise the uniform march of sequence, order and law ?'

শুধু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই নয়, এ-কালের শিক্ষিত মনমাত্রেই কিছু না কিছু পরিমাণে এ-অনুভূতির অংশীদার। কবিদের মধ্যেও আত্মচিন্তার সঙ্গে সত্যচিন্তার অন্বয় ক্রমেই ব্যাপক ও আবশ্যিক হয়ে উঠছে। সত্যকে অখণ্ড রূপে অনুভব করতে আর যে বাধাই থাক, কাব্যের আদর্শগত কোনো বাধা নেই। তবে পাঠকের পক্ষে এককালের ধারণা থেকে অন্যকালের ধারণায় প্রবেশের পথে কিছু বিচার-বিতর্ক দেখা দেওয়া,—এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনান্তর ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। কবিতার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ইচ্ছা, কর্ম, জ্ঞান সবকিছুই জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বড়ো বড়ো কবিদের নাম আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের জগৎ স্বতন্ত্র! তাঁদের রচনার মাধুর্য কি একই রকম? পৃথিবীতে এক মাধুর্যের সঙ্গে অন্য মাধুর্যের কি পুরোপুরি মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তবে, কথাটা এই যে—কবিতায় বিষয়বস্তুর মাধুর্য, রীতি ও আঙ্গিকের মাধুর্য থেকে আলাদা করে দেখবার জিনিস নয়।

পাটের ব্যবসাদারের সঙ্গে গানের সমজদারের তুলনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না ; সে বলে, আমাকে শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না, আমাকে শুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুশি হইয়া দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।'

প্রসিদ্ধ 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে এক জাতের মিষ্টতাকে তিনি বলেছিলেন 'নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট' ; আর, অন্য শ্রেণীর মিষ্টতাকে বলেছিলেন 'মনের নিজের আবিষ্কার'। প্রথম শ্রেণীর স্বীকৃতি 'ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্যের' গুণে। জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' এই জাতের সৌন্দর্য। কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের 'পর্যাপ্তপুষ্প স্তবকাবনম্রা'-র ধ্বনিমাধুর্য সত্যিই ভিন্ন জাতের জিনিস! রবীন্দ্রনাথের মতে 'ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতি-প্রত্যক্ষ নহে ; তাহা নিগূঢ় ; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায়না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়।'

কালিদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিদের প্রসঙ্গ 'রবীন্দ্রনাথের কেকাধ্বনি' প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক মনন মাত্র। উদাহরণ দিতে তাঁর জুড়ি খুঁজে মেলে না। রূপক, প্রতীক, সাদৃশ্য ইত্যাদির সাহায্যে কবি-মন আপনার গূঢ় ধারণাগুলি কতোভাবেই যে ব্যক্ত করেছে! মানুষের মানসিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে একরকম আত্মাদর নিহিত। 'কেকাধ্বনি'-র মাধুর্য সেই মননের গুণেই অধিগম্য। কথাসূত্রে তিনি বলেছিলেন : 'আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।' কবিমানসের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের এই ধারণাটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে :

'All art starts from the sensuous and sensible, or takes it as a continual point of reference or, at the lowest, uses it as a symbol and a fount of images; even when it soars into invisible worlds, it is from the earth that it soars; but equally all art worth the name must go beyond the visible, must reveal, show us something that is hidden; and in its total effect not reproduce but create'.

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই কবিমন বিশেষ বিশেষ চিত্র বা প্রতীক আবিষ্কার করে থাকে ; কবির সৃষ্টি তো কেবলমাত্র চোখে দেখা রূপের প্রতিলিপি নয়,—কবি শুধু নকলনবীস নন,—তিনি গূঢ় সত্যের উদ্ঘাটনপটু,—তিনি স্রষ্টা, তিনি গুহাহিত রহস্যের অভিব্যক্তা! অন্তরের ভাবকে রূপায়িত করে তিনি রসিকের সঙ্গে সত্যের যোগ ঘটিয়ে দেন। এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ধারণা। জেম্‌স্‌ কাজিন্‌স্‌-এর 'New ways in English Literature' বইখানির প্রশংসাসূত্রে সাহিত্যে আদর্শবাদ এবং বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তিনি আধুনিক-কালে কবিমনের প্রতিক্রিয়ার কথা তুলেছিলেন। কথায় কথায় একদিকে সাহিত্যের বর্ণনাপ্রধান রীতি এবং অন্যদিকে নাটকীয় রীতি, এই দুই রূপ-রীতির প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছিল। মেটারলিঙ্ক, ইয়েট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন গীতিধর্মী কবিতায় সিদ্ধহস্ত, তবু এঁদের কলমেও কোনো কোনো সময়ে নাট্যরূপের চর্চা আবশ্যিকভাবেই দেখা দিয়েছিল। যেমন আদর্শ এবং বাস্তবের বিপরীত অভিমুখিতা, তেমনি বর্ণনামুখ্য ভঙ্গি এবং নাটকীয় ভঙ্গির মধ্যেও একরকম বৈপরীত্য আছে সন্দেহ নেই। তবু কবির সাধনায় কিছুই বর্জনীয় নয়। 'The Future Poetry' বইখানির মুখবন্ধে ঐ মেটারলিঙ্ক, ইয়েট্‌স্‌ আর রবীন্দ্রনাথের কথাসূত্রে শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন :

> 'Who shall lay down rules for creative genius or say what it shall or shall not attempt ? It follows its own course and makes its own shaping experiments.'

এই উদ্ধৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী'র প্রসিদ্ধ 'আমি' কবিতাটি মনে পড়ে :

> 'ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
> মানুষের সীমানায়,
> তাকেই বলে 'আমি'।
> সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম
> দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।'

কবিদের এই বিশেষ 'আমি'ত্বই তো কাব্যের নিয়ন্তা। কিন্তু এই গহন, গোপন, রহস্যময়, অন্তর্লীন 'আমি'-কেও সমুচিত লগ্নের জন্যে কার ওপর যেন নির্ভর করতে হয়,—প্রতীক্ষা করতে হয়! ১৯৩৫ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথেরই আর-একটি কবিতা মনে পড়ে। ফুর্তির ঝোঁকে কয়েকজন বন্ধু গিয়েছিলেন সিমুল পাহাড়ে পিকনিক করতে। সেই দলেরই একজনের কথা :

'শিখরে গিয়ে পৌঁছলেম অবারিত আকাশে,
সূর্য নেমেছে অস্তদিগন্তে
নদীজালের রেখাঙ্কিত
বহুদূরবিস্তীর্ণ উপত্যকায়।
পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।'

দার্জিলিঙে সিঞ্চল পাহাড়ে এই সূর্যাস্ত-শোভার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছে :

'মন্ত্র রচনার যুগে জন্ম হয়নি
মন্ত্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।'

এবং এই বেদনাবোধের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পিছন ফিরে তাকিয়েছেন। কি দেখছেন তিনি ?

'এমন সময় পিছন ফিরে দেখি
সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।
যেন সুরলোকের সভাকবির
সদ্যোবিরচিত কাব্যপ্রহেলিকা
রহস্যে রসময়।'

কবিমনের এই যে অভিজ্ঞতা,—সিঞ্চল পাহাড়ে উঠে কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবে এই যে নিস্তব্ধ পৃথিবীর উন্মুখ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা,—এবং সেই দৃশ্য দেখে মন্ত্র রচনার প্রেরণাবোধ,—তারপর সহসা পূর্ণচন্দ্রের 'রহস্যে রসময়' বিস্ময়রাগ,—সেই বিশেষ লগ্নের অভ্যুদয়ের জন্যে তাঁকে তো অপেক্ষা করতে হয়েছে! এ-কবিতার পরের স্তবকে সেই কথারই ইশারা আছে :

'গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।
একদিন যখন কেউ কোথাও নেই
এমন সময় সোনার তারে রুপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হোলো
যা আর কোনোদিন হয়নি।'

বিস্ময়ের অভিব্যক্তি সব ক্ষেত্রে ঠিক যে একই রকম হতে হবে, সে কথা মনে করা ঠিক নয়। বিস্ময়ের প্রকৃতি অনুসারে প্রকাশেও পার্থক্য ঘটে থাকে। অনির্বচনীয়, বৃহৎ কোনো ব্যাপ্তির কিংবা সুবিপুল কোনো গভীরতার আস্বাদন থেকে লেখকের মনে যে প্রকাশ-রীতির তাগিদ জেগে ওঠে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই রীতি সম্বন্ধে ইশারা দিয়ে 'মন্ত্র' কথাটির ওপরে জোর দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্য-চিন্তা-সম্পর্কিত লেখাগুলির মধ্যেও মন্ত্র-রীতির উল্লেখ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যেও 'মন্ত্র' কথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। সে-সব অবিশ্যি তাঁর নিজস্ব ধারণার কথা। তাঁর ১৩২০ সালের ১৫ই মাঘের প্রবন্ধ 'একটি মন্ত্র' কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাকক্ষে পড়া হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন:

'যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কী তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব? যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারল না, সেইখানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী তবে কোথায় যাব? যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয়, সেইখানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে, তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই; কেন না, মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়—যেখানে আজও সে পৌঁছোয়নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়।'

মন্ত্রের রীতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্ট কোনো বিশ্লেষণ নেই বটে, তবু এই ক'লাইনের মধ্যে এমন এক অনুভূতি বা ভাবলোকের কথা আছে যেখানে না পৌঁছলে উপলব্ধির নিগূঢ়, সংহত, রূপকধন্য প্রকাশ সম্ভব হয় না। আধুনিক কালে বিচিত্র বিজ্ঞান, জটিল রাষ্ট্রচিন্তা,—ব্যক্তি, সমাজ এবং বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, কবি-মনের বিশেষ অনুভূতির ফলে, একাধিক দেশে মহাকাব্যের নতুনতর যে-সব প্রয়াস দেখা গেছে, সেইসব প্রকাশের মূলে এই রকম অনুভূতিরই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এ তত্ত্ব পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে দেখতে হলে বেশ কিছু ধৈর্য, কিছু সমবেদনা এবং বিশেষ অনুসন্ধানের পরিশ্রম স্বীকার করে নিতে হয়। এই সূত্রে শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'র কথা প্রথমেই মনে আসে। বইখানি কঠিন তো বটেই,—গূঢ় বোধ-বিদ্যার সমবায়ে এ কাব্য যে বেশ জটিল হয়ে উঠেছে, সে-কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তিনজন অধ্যাপকের ভূমিকা-সংবলিত একখানি শিল্প-শাস্ত্রের বইয়ের কথা মনে পড়ছে। বইখানির নাম **History of**

World Art। অধ্যাপকত্রয়ীর নাম যথাক্রমে—প্রথম Everard M. Upjohn, দ্বিতীয় Paul S. Wingert, তৃতীয় Jane Gaston Mahler। তাঁরা ভূমিকায় বইখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু'কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, ঐতিহাসিক ধারা অনুসারে বিভিন্ন শিল্পকলা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য মনে রেখেই সে-বই সম্পাদিত হয়েছে। চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য,—এই তিন দিকেই তাঁরা মনঃসংযোগ করেছেন, এবং য়ুরোপ, উত্তর-আমেরিকা, এশিয়া, মিশর আর মেসোপোটেমিয়া, এই ক'টি দেশের শিল্প সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করেছেন।

অনেক দেশের, অনেক কালের, নানান শিল্পপরিচিতির ছবিতে ছবিতে বইটির প্রথম এবং বেশ বড়ো একটি অংশ ভরিয়ে দিয়ে [মোট ৬৫৪ খানি ছবি আছে] সাধারণভাবে শিল্পসৃষ্টির বিষয়ে ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে। আর্ট কাকে বলে,—কী তার উপকরণ, কী-ই বা তার উদ্দেশ্য,—এই ধরনের প্রশ্ন মনে জাগলে এঁদের এই বইখানির একটি অতি সহজ কথা প্রথমেই মনে পড়ে—'A work of art is like a triangle whose sides are content, expression and decoration. These three factors are interdependent, but not necessarily equal.' আর্ট-ত্রিভুজের এই তিন বাহুর একটিকে বাংলায় বলা যেতে পারে বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়টিকে প্রকাশ বা অভিব্যক্তি [যদিও প্রকাশ এবং অভিব্যক্তির বদলে অন্য কোনো শব্দ থাকলে ভালো হোতো বলে মনে হয়],—তৃতীয়টি অলংকরণ। এই তিনটি কিন্তু পরস্পর সমান নয়! 'In any given example the artist may choose, or circumstances may compel him, to develop one phase beyond another.' কোথাও বিষয়বস্তু, কোথাও অভিব্যক্তি, কোথাও বা অলংকরণ প্রাধান্য পেতে পারে। 'সাবিত্রী'তে প্রথমটির প্রাধান্য সন্দেহাতীত।

১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর তৃতীয় খণ্ডে [Letters of Sri Aurobindo : Third series] কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য কতকগুলি তথ্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ছাপা হয়েছে। ১৯১৪ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে 'আর্য' পত্রিকায় তাঁর বিশেষ সাধনার সময় গেছে। সেই পর্বেতেই ঐ পত্রিকায় তিনি 'The Future Poetry' সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রের তৃতীয় খণ্ডে সে-প্রবন্ধের উদ্ধৃতি নেই বটে, কিন্তু তাতে কবিতার সত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণার আরো অনেক নজীর সংকলিত হয়েছে। এই পত্রগুচ্ছ সম্পাদনায় ন'টি আলাদা বিভাগের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে এবং শেষ বিভাগের মধ্যে Poets—Mystics—Intellectuals শিরোনামে সংকলিত প্রথম রচনাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'The Poet and the Yogi'। এই পর্যায়ের মধ্যেই ৩১. ৩. ১৯৩২ তারিখের এক চিঠি থেকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্বন্ধে তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, সে-প্রসঙ্গের উল্লেখ

করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে হোমর, শেক্স্‌পীয়র,বাল্মীকি ;—দ্বিতীয় শ্রেণীতে দান্তে, কালিদাস, ঈস্‌কিলস, ভার্জিল এবং মিল্টন,—আর তৃতীয় শ্রেণীতে গ্যেটের নাম করা হয়েছিল। এই সূত্রে কবিদের সামর্থ্য বিচারের নিরিখ কি হবে, সে-বিষয়ে তিনি তাঁর ধারণা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর ধারণা—'The first three have at once supreme imaginative originality, supreme poetic gift, widest scope and supreme creative genius'. ব্যাসদেবকেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে জায়গা দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু শেলি, কীট্‌স, ওয়ার্ডস্বার্থকে তিনি যথার্থ বড়ো কবি বলতে রাজী হননি। তাঁর মতে, এসব কবিও ভালো কবিতা লিখেছিলেন বটে, তবে সে-সব খুব বড়ো কিছু নয়—'their best work is as fine poetry as any written, but they have written nothing on a larger scale which would place them among the greatest creators'! এও ১৯৩২ সালের মন্তব্য। শেক্স্‌পীয়র, শেলি ইত্যাদি প্রসঙ্গে আর-এক মন্তব্যের মধ্যে তিনি কবিদের বিশেষ সামর্থ্য সম্বন্ধে এই ইশারা দিয়েছিলেন যে, একদিকে ভাষার ওপর দখল, অন্যদিকে অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির অকৃত্রিমতা—যুগপৎ এই দু'টি ক্ষমতাই তাঁদের পক্ষে আবশ্যিক বলে বিবেচ্য। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বা বেদনা আছে, অথচ ভাষার জোর নেই—কবিতার এরকম দৃষ্টান্তও তাঁর নজর এড়াতে পারেনি। এই চিন্তাসূত্রেই কবি ব্লেকের কথা উঠেছিল। তিনি ব্লেকের বিষয়ে বলেছিলেন যে, য়ুরোপের মিস্টিক্‌দের মধ্যে ব্লেকের প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁর কবিতার মধ্যে সারল্য বা স্বচ্ছতার নমুনা নিশ্চয় আছে, তবু যে-সব ক্ষেত্রে তিনি দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিলেন, সে-সব ব্যাপারের মূলে ছিল তাঁর বিশেষ ভাবনারই বিশেষত্ব :

> 'His occasional obscurity...is due to his writing of things that are not familiar to the physical mind and writing them with fidelity instead of accomodating them to the latter.'

অর্থাৎ—অসাধারণ মনোধর্ম বা অ-সাধারণ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠা ছিল ব্লেকের।

শুধু মাধুর্য বা বিস্ময়ের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রের পক্ষেই এ-কথা মেনে নেওয়া যায় যে, এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ার কোনো স্তরে কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। পশ্চিমের কাব্যক্ষেত্রে মহাকাব্যও একটিমাত্র আদর্শের মধ্যে নিশ্চল হয়ে নেই। হোমার সেই কাব্যাদর্শের স্বরূপ দেখিয়ে গেছেন, ভার্জিল তাকে আরো পরিণতি দিয়েছেন,—মিল্টন তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পুনরপি পরিস্ফুট করে গেছেন। এদেশেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। বাল্মীকি এবং বেদব্যাসের মূল গ্রন্থের নানা অনুবাদের কথাই শুধু নয়,—

বাংলায় উনিশ শতকের মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কথাও স্মরণীয়। তাঁরা প্রাচ্য মহাকাব্যের আধুনিক পরিবর্তন দেখিয়ে গেছেন। উনিশ শতকে পশ্চিমের ভাব লেগেছিল আমাদের কবিদের মনে। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' প্রভৃতি উনিশ শতকের রচনা তারই অভিব্যক্তি। এই সূত্রে মধুসূদন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তি স্মরণীয়:

> 'I had once the regret that the line of possibility opened out by Michael Madhusudan was not carried any further in Bengali poetry ; but after all it may turn out that nothing has been lost by the apparent interruption. Magnificent as are the power and swing of his language and rhythm, there was a default of richness and thought-matter, and a development in which subtlety, fineness and richness of thought and feeling could learn to find a consummate expression was very much needed.'

শ্রীযুক্ত পুরানি [A. B. Purani] প্রণীত 'Sri Aurobindo's Savitri—An Approach and Study' বইখানির সাহায্যে মূলগ্রন্থের মর্মার্থ সন্ধান করলে উপকার হয়। কারণ, মূল বইয়ের প্রথম সর্গের প্রথম দশ লাইনের মধ্যেই একে একে 'The huge foreboding mind of Night', 'unlit temple of eternity', 'eyeless muse' এবং 'A fathomless zero occupied the world'—এই চারটি রূপধ্যানের দ্রুত সমাগমকে ঠিক কবিতার মধুর এবং মিহি লহরী-লাবণ্য মনে করা, বা তা থেকে কবিতার সাধারণ অভ্যস্ত আবেদন লাভ করা, এমন কি তাকে অসাধারণ তীব্র কোনো কাব্যাঘাত বলে বিবেচনা করাও সহজ নয়। শ্রীযুক্ত পুরানি তাঁর সহায়িকা-গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Future Poetry গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'The work of the poet depends not only on himself and his age, but on the mentality of the nation to which he belongs and the spiritual, intellectual, aesthetic tradition and environment which it creates for him.' অর্থাৎ কবির কাজ তো শুধু তাঁর আপন ব্যক্তিসত্তার অথবা নিজের কালধর্মের প্রতিফলন ঘটানো নয়,—তাঁর স্বজাতির আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, সৌন্দর্যরুচিগত ঐতিহ্য,—এবং এই সবের ফলে তাঁর বিশিষ্ট যে পরিবেশ-প্রকৃতি গড়ে ওঠে, তারও প্রভাবের স্মারক!

সে যাই হোক্, 'সাবিত্রী' এক স্মরণীয় আখ্যানের ব্যাখ্যা,—এ এক বিশেষ রূপক,

এই কাব্য সম্বন্ধে ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'a legend and a symbol'। একজন মার্কিন সাংবাদিক এই কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—'One of the longest and worst epic poems of all time.'; শ্রীযুক্ত পুরানি আমাদের সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন। কারণ, শুধু সূক্ষ্ম বা গভীর, দীর্ঘকালের অথবা দীর্ঘতর কালের পক্ষে সমাদরণীয় কোনো বিষয়বস্তুর গুণেই কোনো রচনাকে মহৎ কাব্য বলতে হবে, এমন ধারণা আমাদের অভ্যস্ত কাব্য-বিশ্বাসের পরিপন্থী! প্রথম দর্শনে একে গভীর সমাদরযোগ্য কাব্য বলতে আপত্তি জাগলে মার্জনাশীল অনুরাগী ব্যক্তি অপরাধ নেবেন না। এ রচনা সুদীর্ঘ তো বটেই, তা'ছাড়া এটি ইংরেজিতে লেখা। পূর্বোক্ত ইংরেজি-ভাষী আলোচক একে 'worst' বিশেষণ দিয়েছেন কোন্ বিশিষ্টতার কথা ভেবে তা নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হবার প্রয়োজন নেই! শ্রীযুক্ত পুরানির কথাই প্রাসঙ্গিক। তিনি 'সাবিত্রী' কাব্যের নিন্দা ও প্রশংসা, দুয়েরই নমুনা তুলে দিয়ে জানিয়েছেন যে, এরকম ক্ষেত্রে এ-কাব্যের মূল্য নির্ণয় করা কঠিন কাজ। তিনি আরো বলেছেন,—'Savitri has an Indian legendary background. But this background is merely the starting point of the poet's inspiration and the reader is not expected to know all the details of the original legend.' 'সাবিত্রী' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্মরণ করে তিনি বলেছেন যে, 'সূ' ধাতুর অর্থ প্রসব করা; আবার 'সোম' বা স্বর্গীয় আসব বাচক শব্দটির মূলেও এই একই ধাতুর প্রভাব স্বীকার্য। অতএব 'সাবিত্রী' শব্দের মধ্যে সৃজন এবং সৃষ্টির আনন্দ, দুটি ভাবই বিদ্যমান। সবিতা একদিকে যেমন দ্যুতির দেবতা, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টিরও দেবতা। সাধারণতঃ সূর্যকেই তাঁর প্রতীক ধরা হয়। তাই 'সাবিত্রী' মানে সবিতা-সম্ভূত অর্থাৎ সূর্যাগত কোনো সত্তা বা শক্তি। আলোচ্য কাব্যে সাবিত্রী হলেন মানবের যাত্রা-সহচরী ভগবৎ-মমতা। মানুষকে তিনি সার্থকতার ঘাটে পৌঁছে দিতে চলেছেন। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী আছে মহা-ভারতের বনপর্বে। সেই কাহিনী মনে রেখে তিনি তাঁর অন্তরানুভূতির প্রসাদ পরিবেষণ করেছেন। কিন্তু পুরোনো কাহিনীর নতুন পরিবেষণ কেন? ভাবনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভাবুক তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতার সমাহার থেকে কিছু কিছু উপকরণ বেছে নেন। সেই বাছাইয়ের মূলে অনেক রকম উদ্দেশ্যবোধ থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ছবি তুলে তুলে সেই সব ছবির সাহায্যে জীবন-প্রবাহের ধারণা সঞ্চার করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়র নাট্যাভিনয়ের প্রকৃতি মনে করিয়ে দিয়ে, তারই সাহায্যে জীবনের নশ্বর সমারোহবোধ জাগিয়ে দিয়েছিলেন! তেমনি 'সাবিত্রী'-উপাখ্যান অবলম্বন করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আত্মানুভূতি এবং বিশ্বানুভূতির রস সঞ্চারের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই সংকল্পের ফল এই রচনা। তিনি নিজে

বলে গেছেন যে, এই সংকল্পের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রেরণাকে যুক্ত হতে দিয়েছিলেন। ১৯৩১ সালের একখানি চিঠিতে এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে ঃ

'I do not work at the poem once a week ; I have other things to do. Once a month perhaps, I look at the new form of the first Book and make such changes as inspiration points out to me— so that nothing shall fall below the minimum height which I have fixed for it.'

প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। 'সাবিত্রী'ও কবি-মনের প্রেরণার দান। কিন্তু পরমা ঐশী শক্তির সম্পূর্ণ অধিকারই বা কোন্ কবির আয়ত্তাধীন ? সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টার সত্তাই মুখ্য। লেখক তার নিজের মনের সাহায্যেই লোক-মনের আবেদন-গ্রাহিকা শক্তির সীমা বুঝতে পারেন। তাই মনে হয়, কবির সংকল্পের সঙ্গে প্রেরণার যোগ থাকাটা যেমন আবশ্যিক এবং অনিবার্য শর্ত, তেমনি প্রেরণাকেও কতকটা মনের বশীভূত রাখা দরকার। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের লেখক কিন্তু বিপরীত মার্গের সাধক। তিনি দু'রকম প্রেরণার কথা তুলেছেন—এক হোলো ওপর থেকে পাওয়া প্রসাদ—'Without any initiation by myself or labour of the brain',—আর এক হোলো সাধারণ কবিসমাজের পরিচিত কাব্যপ্রেরণা,—যাকে তিনি বলেছেন, 'insufficient inspiration'। ১৯৩৪ সালের একখানি চিঠিতে তিনি প্রেরণার এই জাতিভেদের কথা জানিয়েছিলেন। পণ্ডিচেরী থেকে প্রকাশিত তাঁর 'সাবিত্রী' বইখানির পরিশিষ্ট হিসেবে এইসব চিঠি ছাপা হয়েছে। সে কথা পরে আলোচ্য। এই সূত্রে 'সাবিত্রী-সত্যবান' কাহিনীর জনপ্রিয়তা,—এবং একেবারে আধুনিক কালেও এ-কাহিনী সম্বন্ধে নব্যতন্ত্রের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যেও বিশেষ আগ্রহের একটি নজীর উল্লেখযোগ্য। 'মণিবজ্র ভারতী'র 'পত্র' [১৩৩৪ সালের ১০ই কার্তিক] বেরিয়েছিল ঐ বছরের কার্তিক সংখ্যার 'কালি-কলম' পত্রিকায়। সে-সময়কার বাংলা সাহিত্যের নব্য লেখকদল যে বিশেষ ধরনের বস্তুনিষ্ঠা চর্চা করছিলেন, তারই সমর্থন-সূত্রে মণিবজ্র ভারতী সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প স্মরণ করেছিলেন। সে গল্পের মধ্যে তিনি সাহিত্যের সেই 'বড় দিক' প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন যাতে দেখা দেয় 'শান্ত অবহিত হয়ে মানুষের বিচার, তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দানের বাস্তবিক চেষ্টা'। সেকালের বাংলা সাহিত্যের সেই বস্তুতন্ত্রবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যান তাতে কতোদূর সমর্থিত হয়েছিল, সে-কথা এখানে আলোচ্য নয়। শুধু সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী সম্বন্ধে সেকালের সাহিত্য-চিন্তার আগ্রহের কথাই স্মরণীয়। সেই পৌরাণিক আখ্যানের সার-সংক্ষেপ ছিল মণিবজ্রের লেখাটির মধ্যে। তিনি কেবল এইটুকু জানিয়েছিলেন যে—

'...রাজ-কন্যা সাবিত্রী কাঠুরে সত্যবানের প্রেমে পড়লেন। অবশ্য সেটা তাঁর পিতার ভাল লাগে নি ; আজ পর্যন্ত, কোন পিতার তা ভাল লাগে না।'

অতঃপর সত্যবান সম্বন্ধে সাবিত্রীর অনুরাগের নজীর তুলে পুত্র-কন্যার প্রেম সম্বন্ধে পিতামাতার বিরোধিতার দিকটিকে আরো তীব্র ভাবে তিরস্কৃত করবার সুযোগ নিয়েছিলেন 'মণিবজ্র ভারতী'। তারপর আবার গল্পের খেই ধরে তিনি লিখেছিলেন :

'সাবিত্রীর বিপদের উপর বিপদ হল, ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নারদ এসে বললেন, সর্বনাশ! সত্যবান? আরে ও-তো বিয়ের বছর পার-না-হতেই মারা যাবে। নারদ সাবিত্রীকে ডেকে বললেন, ছি ছি মা, এ কাজ তুমি কিছুতেই করতে পাবে না...জেনে শুনে বৈধব্যকে কে বরণ করে নেয়? সাবিত্রী কিন্তু অচল-অটল। বললেন, সে কেমন করে হয়? আমি যে সত্যবানকে প্রাণ-মন সমর্পণ করে বসেছি। এখন অন্য পুরুষের কথা মনে স্থান দেওয়া যে পাপ!'

সংঘর্ষ এবং প্রত্যয়ের এই নাট্য-সন্ধিতে টেনে এনে লেখক অতঃপর তার পাঠকদের তাড়াতাড়ি জানিয়েছিলেন :

'অবশেষে প্রেমের জয়-জয়কার! মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠলো।'

এবং পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছিলেন :

'সাবিত্রী-ব্রত হিন্দু-ঘরের মেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে আজও করে থাকেন। আসল বস্তুটি বাদ দিয়ে অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হয় না!

সাবিত্রীর উপাখ্যানের আসল মর্মটি আমরা হারিয়ে বসেছি।'

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যে সেই বিশেষ মর্মকথা উপলব্ধিরই একরকম প্রকাশ দেখা গেছে। 'কালি-কলম' গোষ্ঠীর লেখক মণিবজ্র সে আখ্যান স্মরণ করেছিলেন এক প্রয়োজনে,—শ্রীঅরবিন্দ অন্য প্রয়োজনে! সেই বিশেষ প্রয়োজনের কথাই বিবেচ্য।

এ-যুগে মহাকাব্য লেখা অসম্ভব,—কিংবা মহাকাব্যের প্রেরণা নিতান্তই অতীতের ব্যাপার ইত্যাদি ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা জোরের সঙ্গে এই কথাটাই জানিয়ে থাকেন যে, বর্তমান যুগ প্রধানতঃ যুক্তিরই অনুরাগী। যুক্তিবাদ এবং মহাকাব্য কেন যে পরস্পরের বিরোধী বলে মানতে হবে, সে-কথা ধীরে সুস্থে ভেবে দেখা দরকার। সে ভাবনা অল্প কথায় বলবার নয়। এখানে তার প্রয়োজনও নেই। তবে শ্রী পুরানির বইয়ে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, সেটুকু স্মরণীয়। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এদেশে পশ্চিমের সাহিত্যাদর্শ দিয়েই আমরা অনেকদিন চালিত হয়ে এসেছি। য়ুরোপের সাহিত্য-সমালোচকরা রাষ্ট্র আর অর্থনীতি-ক্ষেত্রের মতন সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও য়ুরোপের প্রাধান্যের কথা ধরে নিয়ে আলোচনায় নেমে থাকেন। পুরানি সেটাকে

ভ্রান্ত ধারণা বলতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর অভিপ্রায় হোলো য়ুরোপের সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক আরো গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার অনুকূলে। সেভাবে দেখলে এটা অবশ্যই চোখে পড়ে যে, উনিশ শতকে য়ুরোপের সংযোগ লাভের ফলে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্য-বৈচিত্র্যের অপূর্ব জোয়ার এসেছিল। সেই সঙ্গে ইংরেজি আমাদের সর্বভারতীয় ভাষা বলেও গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সংস্কৃতি-সচেতন মানবজাতির মধ্যে অখণ্ড কোনো রকম ঐক্য সম্ভব কি-না, সেটা যদিও বিচারসাপেক্ষ, তবু পুরানি বলেছেন যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে যে Indo-English সাহিত্য দেখা দিয়েছে, সেটি নাকি মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যের আশাপ্রদ ভূমিকা বা সূচনা—'a very hopeful prelude to the cultural unification of mankind.' এই ইংরেজির—এবং য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের যুগে এদেশের সাহিত্যরাজ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই! যাঁরা মহাকাব্যের অনুকূল সমাজ-পরিবেশ হিসেবে আদিকালের কথা উল্লেখ করেন এবং সে তুলনায় বর্তমানের অনুপযোগিতার কথা বলে থাকেন, পুরানি তাঁদের এই বলেছেন যে, এ-কালের এই নব্য ভারত-ইঙ্গ সংকর-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' দ্রষ্টব্য। এবং—'It was therefore a phenomenon of very great significance when Sri Aurobindo turned his remarkable poetical capacity to the creation of an epic in English to embody his grand vision of the spirit.' সাহিত্য-রাজ্যে য়ুরোপের সৃজনীশক্তিতে আজ হয়তো ভাঁটা দেখা দিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেই ইংরেজির মাধ্যমেই ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা ছড়িয়ে পড়লো—প্রথমে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-তে,—তারপর শ্রীঅরবিন্দের নানান্ রচনায়!

'গীতাঞ্জলি' গীতিকবিতা, কিন্তু 'সাবিত্রী' মহাকাব্য। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির যাঁরা গুণমুগ্ধ, অথচ নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সজাগ, সে-রকম আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে গীতিকবিতা এবং মহাকাব্য দুই-ই যোগ্য বাহন হতে পারে। 'Life Divine'-এ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সত্যোপলব্ধি প্রকাশের যে বিপুল আয়োজন দেখিয়েছেন, 'সাবিত্রী'তে তারই রূপভেদ! K. D. Sethna-র কথায়—'To create a poetic mould equally massive and multiform as the 'Life Divine' for transmitting the living Reality to the farthest bound of speech—such a task is incumbent on one who stands as a maker of a new spiritual epoch.' এই মন্তব্য উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত পুরানি জানিয়েছেন—'Savitri fulfils that task.'

ধর্মচিন্তায় বা দার্শনিক মননে যাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ নেই, অথচ বহুপ্রশংসিত বা

বিচিত্রভাবে আলোচিত কোনো কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা অকৃত্রিম, সেরকম পাঠক-সমাজে 'সাবিত্রী' বইখানি প্রথমে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা এবং অশান্তির কারণ বলে মনে হবে। প্রথম সর্গের শুরুতেই দেখা যায় বৈদিক উষার ভাবনা,—অনন্ত কালের নিরালোক স্তব্ধতার বর্ণনা। সে-অংশের শব্দে, রূপে এবং রূপকে—সৃষ্টির আদিপ্রান্তের প্রলয়ান্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে! প্রাণহীন, আকৃতিহীন, অবয়বহীন সেই সুবিপুল বিস্তারের কোনো দূর প্রান্তেও কোনোরকম মননের সম্ভাবনা ছিল কি? প্রলয়ের শূন্য গহ্বরে পৃথিবী যেন আত্মবোধহীন সুষুপ্তির মধ্যে লীন ছিল! আদি-কালের সেই কায়াহীন নিশ্চেতনার মধ্যে হঠাৎ কোন্ এক নবজন্মের যন্ত্রণা দেখা দিলো। সে এক নামহারা অভিব্যক্তি,—মনঃসম্পর্কহারা ধারণা,—লক্ষ্যহীন ব্যাকুলতা।

'Then something in the inscrutable darkness stirred ;
A nameless movement; an unthought Idea
Insistent, dissatisfied, without an aim,
Something that wished but knew not how to be,
Teased the Inconscient to wake Ignorance'.

সেদিন অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠেছিল আলোর পিপাসা। ঘুমন্ত মায়ের গালে যেন শিশুর আঙুলের ছোঁওয়া লাগলো! সেই জননী-রূপের কল্পনা শ্রীঅরবিন্দের কবিমনের দান! এই অবস্থায় সৃষ্টির আদি-জননীর স্বরূপ কি ছিল, তৎসূত্রে কবি অরবিন্দ লিখে গেছেন :

'The heedless Mother of the universe,
An infant longing clutched the somber Vast'.

আদি-অন্তহীন সেই অন্ধকারের মধ্যেই দেখা দিলো মন, জেগে উঠলো বোধ! তার্কিক যদি জিগেস করেন, 'কোন্ উপায়ে?'—তাহলে কবির কথা দিয়েই সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাবে :

'All can be done if the god-touch is there'.

সময়ের অশেষ ধারার ধারণাটি ফুটিয়ে তোলবার অভিপ্রায়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই 'সাবিত্রী' কাব্যের সূচনাতেই 'উষা'-প্রতীকের সদ্ব্যবহার করেছেন। এইসব ছবির সাহায্য নিতে নিতে পাঠকের মন ক্রমশঃ তাঁর গভীর উপলব্ধির হদিস পেতে থাকে। সাধারণতঃ যে বুদ্ধি-বিবেচনার স্তরে আমরা আবদ্ধ থাকি, সে-লোক থেকে অন্যলোকে এগিয়ে যাওয়া এইভাবেই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ একটি সত্যের কথা এই সূত্রে মনে আসে। কবিতার রাজ্যে এমন লেখাও আছে

বৈকি, যার ছন্দের দোলাটা আশ্চর্য মনে হয়, যা পড়তে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে,—মনের মধ্যে যার প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতেই থাকে,—তবু মানে তলিয়ে দেখতে সত্যিই অসুবিধা হয়! যেমন :

'Sing a song of six pence
A pocket full of rye
Four and twenty blackbirds
Baked in a pie.
When the pie was opened
The birds began to sing :
Was n't that a dainty dish
To set before a king ?'

এই ইংরেজি লেখাটির সমধর্মী বাংলা নমুনাও দুর্লভ নয়। বোধ হয়, পৃথিবীর যতো ভাষাতে কবিতা লেখা হয়েছে, সে রকম প্রত্যেক ভাষা থেকেই এ-রকম কিছু কিছু উদাহরণ তুলে দেখানো যেতে পারে। এবং সেইসব নমুনা পড়বার সময়ে সমালোচকের ব্যাপক এবং অকাট্য মন্তব্যই স্বীকার্য—'Even the stoutest enthusiast for the symbolical interpretation of poetry would be hard put to it to discover any important 'message' here :—but the enchanting lilt of these lines !' অর্থাৎ, এর ভেতর থেকে কোনো-রকম 'বাণী' খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ; যাঁরা প্রতীক ব্যাখ্যানে অত্যন্ত উৎসাহী, তেমন ব্যাখ্যাতার দলও হার মানবেন , কিন্তু তবু এই লাইনগুলির দোলা কী আশ্চর্য !

অনুবাদের কাজে এই রকম অংশ যে কী দুর্ভেদ্যভাবে দুরূহ মনে হয়, সেকথা যিনি কখনো এ-কাজে হাত দিয়েছেন, তিনিই জানেন। বাস্তবিক সব শব্দের প্রতিশব্দ হয় না ; এক ভাষায় যে-সব শব্দ খুবই পরিচিত, অন্য ভাষায় চেষ্টা করলেই যে তাদের প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে সে-ধারণা ঠিক নয়। প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দের সঙ্গে নানা স্বাদ জড়িয়ে যায়। সেই অনুষঙ্গ থেকে শব্দকে আলাদা করে দেখা যায় না। 'The Problem of Translation' নামে এক প্রবন্ধের লেখক বলেছেন—'It is an illusion to suppose that every word, has an exact equivalent in other languages'—অর্থাৎ এক ভাষার প্রত্যেক শব্দের হুবহু প্রতিশব্দ আছে অন্য ভাষাতে,—এ ধারণা মোহ মাত্র! এই সূত্রে আরো একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। Alexander Haddow-র লেখা 'On the Teaching of Poetry' নামে একখানি বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবিতার অধ্যাপকের পক্ষে কী কী গুণ থাকা

দরকার সে-বিষয়ে নির্দেশ আছে। তার প্রধান কথাটা এই যে, কবিতার শিক্ষককে কবিতা ভালোবাসতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন, যে, এই অনুরাগ-মন্ত্রই যখন আসল মন্ত্র, তখন অধ্যাপক-মশাইকে তাঁর নিজস্ব প্রিয় কবিতার একখানি সংকলন তৈরি করে নিতে হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে হ্যাডো বলেছেন কবিতা পড়াতে গিয়ে কবির জীবনী নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়; ব্যাখ্যার বাড়াবাড়িও পরিত্যাজ্য। তার পরের অধ্যায়ে তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কবিতা কানে শোনবার শিল্প-সৃষ্টি, তা চোখে দেখবার আড়ম্বর নয় মোটেই। এবং তারও পরের অধ্যায়ে বলেছিলেন,—কে যে কোন্ রীতি ধরে কবিতার আলোচনা করেন, সে-বিষয়ে সর্বজনস্বীকার্য কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। এ হোলো ভালবাসার খেলা—যাঁর যেমন রুচি, যাঁর যেমন প্রেরণা, তিনি সেইভাবেই এগুবেন।— 'It is like love-making, each must do it in his own way.'

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বক্ষেত্রে সেই তাড়না থেকেই এই রকম প্রতীক প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছেন। 'রাত্রি'-প্রতীক থেকে 'উষা'-প্রতীক এসেছে, সেই ভূমিকায় দেখা গেছে সাবিত্রীর অবস্থান। সাবিত্রী মানবিকও বটে, ঐশ্বরিকও বটে। পৃথিবী, প্রেম এবং মৃত্যু,—এই তিনের সমন্বিত সত্যেরই সে সম্মুগান! আমাদের এই মর্তের মধ্যেই উর্ধ্বায়নী আকাঙ্ক্ষা জেগে আছে। সাবিত্রী সেই আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ। এ-কাব্যের গল্পবস্তু অপ্রধান। অতি সামান্য পৌরাণিক কাহিনীর অবলম্বন এখানে এ-যুগের নিখিল মানব-সমাজের গভীর আত্মাভিব্যক্তির পথ খুলে দিয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় নশ্বরতার মধ্যে আত্মার আত্মাবিষ্কারই তাঁর এই মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। নানা উদ্ধৃতি তুলে কাব্যের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র অনুষঙ্গের পরিচয় দিয়ে শ্রীযুক্ত পুরানি লিখেছেন:

> 'A cosmos of multiple worlds acting and reacting upon the growing consciousness of the earth is seen moving towards planes of consciousness unattained by man and the future destiny of man, the whole life of man with all his multifarious activities is seen in the light of this grand vision··· The most ultramodern elements find their proper place in this complex and integral vision'.

'পৃথিবী' বা 'পার্থিব' বলতে বুঝতে হবে আদিম অজ্ঞানের অবস্থা; 'প্রেম' এখানে ঐশ্বরিক সেই লক্ষণ, যার ফলে পরম নেমে আসেন সীমিত প্রাণিজগতের মধ্যে—মানুষকে চরিতার্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহে! মৃত্যু বা তমঃ হোলো প্রকৃতির বস্তুতাবোধ—মানুষকে যা নিরন্তর বাধা দিচ্ছে,—জড়ের রাজ্যে তাকে কেবলই

টেনে নামিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। এই তিন সত্যই মানব-জীবনের সত্য। এরাই মানুষের সুখ-দুঃখের হেতু। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে সাবিত্রীর নবোন্মেষিত ব্যক্তিত্ব এসে দাঁড়িয়েছে জগতের দুরতিক্রম্য অবরোধের মুখোমুখি। চারিদিকের বাধা-বন্ধনের মধ্যে মানুষ তার আপন স্বাধীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। সমস্ত মুক্তি-সাধনার মধ্যেই এ অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। একে অস্বীকার করা অসঙ্গত। 'সাবিত্রী' কাব্যের প্রথম দিকে সেই বাধার চেতনা সুস্পষ্ট। তবু তারই মধ্যে মুক্তির পথ প্রচ্ছন্ন ছিল। ধী'র ধীরে সেই সম্ভাবনার দিকে কবি তাঁর পাঠককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মর্তের নশ্বরতা উত্তীর্ণ হয়ে অন্তরের অবিনশ্বর সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই। এই সব ভাবনা-সূত্রেই রাজযোগের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে—এবং তা খুবই সংগতভাবে।

আমাদের অভ্যস্ত ধারণা অনুসারে কবিতার পক্ষে যোগের প্রসঙ্গ হয়তো কতকটা অবান্তর, এমন কি প্রতিকূল বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে তা হয়নি। বইখানির আয়তন বেশ বড়ো,—এর ভাষা ইংরেজি এবং বিষয়বস্তু বড়োই অন্তর্বোধ-প্রধান। ফলে, যে পাঠক অল্প মাত্রায় কাব্যরসে অভ্যস্ত, তাঁর পক্ষে ধৈর্য বজায় রেখে সবটা পড়ে দেখা সময়সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে, এর কাব্যগুণে কোনো পক্ষেরই সন্দেহ হবার কথা নয়। প্রথম আবির্ভাবের লগ্নে সাবিত্রীকে দেখা গেছে—

'Akin to the eternity whence she came,
No part she took in this small happiness ;
A mighty stranger in the human field,
The embodied Guest within made no response.
The call that wakes the leap of human mind,
Its chequered eager motion of pursuit,
Its fluttering-hued illusion of desire,
Visited her heart like a sweet alien note.'

এবং নানা খণ্ডে, বিভিন্ন সর্গে প্রবাহিত এই সুদীর্ঘ রচনার শেষ পর্যন্ত এগিয়েও তার সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয় না। বর্তমান কালের যন্ত্র, বিজ্ঞান, সমস্যা এবং জটিলতার মধ্যে মানুষের মনে পরমের আকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে অবশ্যই জাগছে। একালের ভাবুক মনেব সেইসব যাবতীয় আত্মজিজ্ঞাসার বিস্ময় এবং বেদনা আছে শ্রীঅরবিন্দের এই ইংরেজি মহাকাব্যে!

সাবিত্রীর সত্তা বা প্রকৃতির বিশেষত্ব সম্বন্ধে 'সাবিত্রী' কাব্যের প্রথম সর্গের মধ্যেই কয়েকটি কথা স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। মানব-শরীরের স্থূল বস্তু-পরিসীমা

অস্বীকার করা অবান্তর। কিন্তু সেই সীমার মধ্যেই অসীম যিনি, তিনি অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছেন :

'In her there was the anguish of the gods
Imprisoned in our transient human mould;
The deathless conqured by thy death of things.

আত্মার অনন্ত ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও বিশ্বময় ঐক্যবোধের বাহন আমাদের এই মর্ত্য শরীর। অথচ জড় থেকে উৎপন্ন এই শরীরের নিজস্ব বাধাও তো কম নয়। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের পার্থিব-প্রকৃতির সেই বিশেষত্বের কথা-প্রসঙ্গেই বার বার 'earth-nature', 'earth-scene' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। রোগ, শোক, অভাব, মৃত্যু—এদেরই আমরা সঙ্গী হিসেবে পাই। এই জগৎ-সত্যের মধ্যেই সাবিত্রীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। সেই অবস্থা থেকেই সাবিত্রীর জীবন-যাত্রা শুরু হয়েছিল :

'A solitary mind, a world-wide heart,
To the lone Immortal's unshared work she rose'

কিন্তু নিঃসঙ্গ, দুঃখ-সমাকীর্ণ এই যে পথ, এই পথ-পরিক্রমার চেতনা সহসা দেখা দেয়নি! প্রথমে জড়ের মতন নিশ্চেতন ছিলেন সাবিত্রী। তাঁর জন্মের অব্যবহিত পর-মুহূর্তগুলি ছিল বিস্মৃতির সুখাবেশে নিশ্চিন্ত। কবি বলেছেন—'Inert, released into forgetfulness'! তারপর ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে দেহ-চৈতন্যের স্ফুরণ; এসেছে সীমিত সময়ের বোধ, নিরুদ্ধ আকাশ বা Space-এর ধারণা! এলো স্মৃতি, এলো ভাবনা! এলো পার্থিব আয়ুর,—পার্থিব অস্তিত্বের বন্ধনবোধ। সেই সঙ্গে প্রেমও তাঁর চৈতন্যে প্রবেশ করেছে,—ছায়া ফেলেছে মৃত্যুর ধারণা। বহির্জগতের নানান অনিবার্য প্রাকার এবং অন্তর্জগতের নিগূঢ় দুঃখ, নৈরাশ্য, বিবেক,—এ সবই সাবিত্রীর মধ্যে সত্য হয়ে উঠেছে। তখন মর্তে নবজাগ্রত সাবিত্রী!

'Awake she endured the moment's serried march
And looked on this green smiling dangerous world,
And heard the ignorant cry of living things.'

'সাবিত্রী' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির এই বিশেষ সত্যটি পাঠকের গোচরে আসে যে, মানুষের জীবনে যথার্থ সত্য-স্বীকৃতির লগ্ন বড়োই আশ্চর্য-রকম অন্ধকার! অন্ধকার,—কারণ জীবনে যে মায়া বা অজ্ঞানের আলো ধরে আমরা প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ পেতে পেতে জন্মকাল থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই, সত্যের অনুভূতি যখন দেখা দেয় তখন আমাদের চারিদিকের সেই অভ্যস্ত মায়ারশ্মি হঠাৎ নিভে যায়!

'An absolute Supernatural darkness falls
On man sometimes when he draws near to God :
An hour comes when fail all Nature's means ;
Forced out from the protecting ignorance
Aad flung back on his naked primal need
He at length must cast from his surface soul
And be the ungarbed entity within :'

ক্রমে সাবিত্রীর বোধে দেখা দেয় সেই আত্মাবিষ্কারের পরম লগ্ন। প্রশ্ন এই যে, সে অবস্থায় সে কী ভাবে সেই বোধের আনুগত্য করবে? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—
'Her will must cancel her body's destiny ।'

এই কঠোর সত্যটি কবিমাত্রেই একবাক্যে জানিয়ে থাকেন যে, এই মর্ত্য জীবনে আমরা যাকে মনোরম বা প্রিয় সামগ্রী বলে মানতে চাই, তার আয়ু বড়োই সীমিত। মর্তের সুখ নশ্বর। নশ্বরতার তাড়না থেকেই ভাবুক মনের অন্তর্মুখিতা উৎসাহিত হয়ে থাকে! 'সাবিত্রী'র জীবনেও তাই ঘটেছিল।

'A glowing orbit was her early term,
Years like gold raiment of the gods that pass ;
Her youth sat throned in calm felicity.
But joy cannot endure until the end ;
There is a darkness in terrestrial things
That will not suffer long too glad a note.'

সাবিত্রীর আত্মানুভূতির প্রথম স্ফুরণের মধ্যেই দেখা গেছে তার বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতিশায়ী প্রেম!

'Love in her was wider than the universe
The whole world could take refuge in her single heart.'

প্রেমের এই বিশ্ববরণী শক্তিই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। অজ্ঞানের বিরুদ্ধে এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে তার অভিযান। এই সূত্রে সাধারণ প্রাণী বা জীবমাত্রের অবস্থা সম্বন্ধে কবি শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন যে, তারা হোলো অদৃষ্টের পর্দার ওপর চকিতে ভেসে ওঠা ক্ষণস্থায়ী ছায়ামাত্র,—কামনার সমুদ্রে ভাসমান তুচ্ছ বস্তু,—নশ্বর দৃশ্য-প্রবাহের মধ্যে অর্ধ-সঞ্জীবিত সত্তা। পরিদৃশ্যমান জড় জগৎকে তিনি কারাগার বলে অভিহিত করেছেন। এই কারাগারের পথে পথে কঠোর আইনের প্রহরী। প্রাণ (Life) চলেছে তার অন্তহীন আবিষ্কারের ব্রত উদ্‌যাপনে। মৃত্যু দাঁড়িয়েছে তার গতিরোধ করবার সংকল্প

নিয়ে। তবু শত বাধা উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাওয়াই প্রাণের স্বধর্ম। সাবিত্রীর মধ্যে প্রাণধর্মের এই বিশিষ্টতার কথা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কলমে দেখা দিয়েছিল আমাদের বৈষয়িক বৈশ্য জগতেরই সববোধ্য একটি চিত্রানুষঙ্গ :

Writing the unfinished story of her soul
In thoughts and actions graved in Nature's book,
She accepted not to close the luminous page
Cancel her commerce with eternity,
Or set a signature of weak assent
To the brute balance of the world's exchange.'

বইখানির প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সর্গে রাজযোগের কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র,—'The Ideal of the Karmayogin'-এর মধ্যে যোগের সরল অর্থটি বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'Yoga is communion with God for knowledge, for love or for work'। বিরাট বিশ্বাত্মার সঙ্গে প্রত্যেকটি ব্যক্তি-প্রাণের অনিবার্য, অনস্বীকার্য যোগের কথা তিনি বারবার নানাভাবে বলেছেন। অনন্তের মধ্যে মানবচিত্তের গভীর গাহনের জন্যেই যথোচিত অবস্থা সৃষ্টি করে দেন বিধাতা—

'The cosmic worker set his secret hand
To turn this frail mud engine to heaven-use.'

মানুষের অন্তর্নিহিত যে আত্মদৃষ্টির শক্তি অব্যবহৃত থেকে যায়, সেই নিগূঢ় শক্তিরই বিকাশ ঘটিয়ে তোলা চাই। জগতের অজস্র রূপ এবং অম্লান প্রাণ, অশেষ ভাবনা এবং সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যেতে যেতে সাধকের সত্তা অনাস্বাদিতপূর্ব যে গভীরে গিয়ে পৌঁছোয়, সেই স্তরেরই বর্ণনাসূত্রে বলা হয়েছে :

'Where world was into a single being rapt
And all was known by the light of identity
And spirit was its own self-evidence.'

সমস্ত ভেদাভেদ সেখানে ঐক্যে লীন হয়ে আছে। জ্ঞান সেখানে ভাষা ব্যতিরেকেই সুসার্থক, স্বয়ংসম্পূর্ণ!

এই আত্মদৃষ্টি সার্থক করে তোলবার জন্যেই দুটি ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য,—ওপর থেকে নেমে আসা চাই পরা-জ্ঞান (God-knowledge),—আর মনের ভেতর থেকে বিশাল মর্ত্য-জ্ঞানের (world-knowledge) অধিকার জেগে ওঠা চাই। জড় এবং আত্মা—দুই-ই সত্য, দুই-ই স্বীকার্য। শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক বিচারে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এই দুই সত্যের যৌগপত্য-বোধ একটি বিশেষ উপস্থাপনা! তিনি শক্তির ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যত্র যথাক্রমে এই স্তরগুলির কথা বলেছেন—

জড় (matter), প্রাণ (life), 'সাইকি' (psyche), মন (mind); অতি-মন (supermind), আনন্দ (bliss), চিৎ (consciousness-force) এবং সৎ (existence)। এদের মধ্যে প্রথম চারটি হোলো নিম্নার্ধ; শেষের চারটি উচ্চার্ধ। নিম্নার্ধের স্তরগুলিরই সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তি ঘটেছে ওপরের চার স্তরে। মন এবং অতি-মনের সন্ধিতে তিনি এক গ্রন্থি কল্পনা করে সেই গ্রন্থি মোচনের ঈশ্বর-প্রদত্ত সামর্থ্যের কথা জানিয়ে গেছেন। 'সাবিত্রী' কাব্যের রাজযোগ-প্রসঙ্গ সেই বিশেষ উপলব্ধির স্মারক।

দর্শন-শাস্ত্রের বইয়ে কিংবা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বর্ণনায় এই রকম তর্ক-বিতর্ক অথবা উচ্ছ্বাস বা আবেশ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু কাব্যের রাজ্যে এইসব গূঢ় বিশ্বাসের অতি-বিস্তার অনুচিত। লেখক যে কবি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপমার বৈচিত্র্যে, অনুভূতির মৌলিকতায় এ কাব্য খুবই সমৃদ্ধ। তবু সাধারণ কাব্যামোদীর পক্ষে এ-রচনা কতকটা দুস্তরও বটে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে জানিয়েছেন :

> 'Savitri is the record of a seeing, of an experience which is not of the common kind and is often very far from what the general human mind sees and experiences. You must not expect appreciation or understanding.'

ব্যাপক অর্থে এ রচনাকে মিষ্টিক বলা বোধ হয় অসংগত নয়। ধর্ম-সম্পর্কিত মরমীয়াবাদের সংজ্ঞাসূত্রে W. R. Inge লিখেছিলেন যে, মানুষের ভাবনা আর অনুভূতির সাহায্যে অনিত্যের মধ্যে নিত্যের এবং নিত্যের মধ্যে অনিত্যের ব্যাপ্তি বা অস্তিত্ব উপলব্ধির প্রয়াস থেকেই মিষ্টিসিজম্ বা গূঢ়ৈষণার উদ্ভব ঘটে থাকে—'the attempt to realise, in thought and feeling, the immanence of the temporal in the eternal, and of the eternal in the temporal'।

স্থূল, ইন্দ্রিয়-জগতের অতিশায়ী গূঢ় কল্পনা বা অনুভূতির কথা বলতে গেলেই বিশেষ-বিশেষ প্রতীক, সংকেত বা রূপকের সাহায্য নিতে হয়। কবি-মনের আইডিয়া বা ভাবের অত্যাবশ্যক শরীর বা বাহন হোলো এই জাতীয় নানাবিধ সংকেত। ইন্‌জ্ এই সূত্রে বলেছিলেন যে, রূপক মাত্রেরই (symbols) সাধারণ স্বভাবটা এই যে, হয় সেগুলি তাদের নমনীয়তা এবং অর্থব্যঞ্জনা হারিয়ে ক্রমশঃ বিশেষ কোনো প্রয়োগের স্মৃতিচিহ্নমাত্র হয়ে দাঁড়ায়,—নয়তো তারা সেই বিশেষ প্রয়োগের উদ্দেশ্য বা স্বাদ পুরোপুরিই হারিয়ে ফেলে। তখন আবার নতুন পর্ব শুরু হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গূঢ়ৈষণার মূলে আছে এই ক'টি বিশেষ বিশ্বাস : প্রথমতঃ—আমাদের যেমন শরীরের দৃষ্টি, আত্মারও তেমনি দেহ-নিরপেক্ষ নিজস্ব দৃষ্টিক্ষমতা আছে; মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে

সমধর্মিতা না থাকলে ঈশ্বরের উপলব্ধিই যেহেতু অসম্ভব হোতো, অতএব মানুষ ঈশ্বরেরই অংশ ; এবং তৃতীয়তঃ—মানুষের অন্তঃকরণ শুচি না হলে ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব হয় না। Sermon on the Mount-এর প্রসিদ্ধ উক্তিটি এই সূত্রে স্মরণ করা হয়েছিল—'Blessed are the pure in heart : for they shall see god।' চতুর্থতঃ মিষ্টিকরা বিশ্বাস করেন যে, ভগবৎ-দর্শনের উপায় বা পথ হোলো প্রেমের সাধনা। বৈষ্ণবেরা এই প্রেমেরই ব্যাখ্যা করে গেছেন :

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যে আধুনিক জগৎ-পরিবেশের অনেক কথাই জায়গা পেয়েছে। কিন্তু সে-সবই আনুষঙ্গিক এবং বহির্জাগতিক ব্যাপার। অন্তর্জগতের পথ-সন্ধান প্রসঙ্গটাই এ-কাব্যের আসল কথা। বর্তমান কালের অন্যতর নানা ভাবনায় আসক্ত অধিকাংশ পাঠকেরই তা যে ভালো লাগবে না, সেকথা তিনি নিজেই বলেছিলেন। কিন্তু রসিক পাঠকের জন্যেই তো দুস্তর পথ !

কবির ধ্যান ও আধুনিক কবিতা

একশ তিরাশি নম্বর ল্যান্সডাউন রোডে, জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে, উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের দোশরা জুন সন্ধ্যায় আলাপ হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন : 'আমার লেখা প্রথম ছাপা হয় উনিশ শ' চব্বিশে, বরিশাল থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকায়। 'বঙ্গবাণী'তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা আমার একটি কবিতা বেরিয়েছিল। তারই কাছাকাছি সময়ে 'কল্লোলে' আমার 'নীলিমা' কবিতাটি ছাপা হয়।

আমি জিগেস করেছিলুম : মোহিতলাল মজুমদার তো তখনকার প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর লেখা আপনার ভালো লাগতো নিশ্চয় ?

সংক্ষিপ্ত একটি 'হ্যাঁ' বলেই জীবনানন্দ আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। অন্য কথার টান চলছিল তাঁর ভাবনার মধ্যে। কিন্তু সে ধারায় ছেদ না পড়ুক, বাধা বোধ করেছিলেন নিশ্চয়। কারণ, মোহিতলালের কথাতেই তিনি ফিরেছিলেন আবার।

সেদিন তিনি বললেন : 'মেডিটেশন ছাড়া সত্যিকার ভাল এবং সত্যিকার গভীর কবিতার সম্ভাবনা কোথায় ?'

আবার থামলেন জীবনানন্দ। তক্তপোষ থেকে উঠে ঘরের আলোর সুইচ্ টিপলেন। পাশে বসে বললেন : 'উনিশ শ' তিরিশের আগেই 'প্রগতি' বেরিয়েছিল। কল্লোলের তখন শেষ পর্ব। আমার 'ঝরা পালক' ছাপা হয় তেরশ চৌত্রিশের আশ্বিন

মাসে। লোকে 'কল্লোলে' সে-সব লেখা তার আগেই পড়েছে। 'প্রগতি'তে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতা বেরিয়ে গেছে। 'ঝরা পালক' বইখানার মধ্যে সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম তিনজনেই আছেন। তিনজনেরই প্রভাব স্পষ্ট। কেবল আমি নিজেই বোধ হয় নেই!

মুখ টিপে হাসতে লাগলেন জীবনানন্দ। তাঁর বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টিতে, আর তাঁর সেই মৃদু হাসির সঙ্গে কৌতুক, ঋণস্বীকৃতি, প্রশ্নময়তা এবং আরো একটি ভাব মিশেছিল বোধ হয়।

আমি বলেছিলুম: 'মেডিটেশন' কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

—মোহিতলালের মধ্যে তা আছে।

জীবনানন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সেই হাসিটুকুই পুনর্বার উপহার দিলেন। আমি নিরুপায় হয়ে অন্যদিক থেকে আমার জিজ্ঞাসা নিবেদনের চেষ্টা করলুম; জিগেস করলুম, —আচ্ছা, দেবেন সেন আপনার প্রিয় কবি ছিলেন কি?

—হ্যাঁ, দেবেন সেনের কিছু কিছু লেখা আমি তখনই পড়েছি।

—'তাঁর মধ্যে 'মেডিটেশন'-এর লক্ষণ ফুটেছে কি?'

—'মোহিতলালের মত নয়।'

কিন্তু প্রসঙ্গটি আর বিস্তৃত করতে তাঁকে নারাজ মনে হোলো। তখন বললুম: আপনার 'মহাপৃথিবী' আর 'সাতটি তারার তিমির' সম্বন্ধে কিছু বলুন।

তিনি বললেন: আট দশ বছর ধরে 'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলি লেখা হয়। 'সাতটি তারার তিমির'-এ যে-লেখাগুলি ছাপা হয়েছে, রচনাকালের দিক থেকে সেগুলি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের বিস্তারে ছড়িয়ে আছে। আমার মনের মধ্যে নিরন্তর একটা জগৎ তৈরি হয়ে উঠছে। তাতে ঠিক বাইরের ইন্দ্রিয়গোচব জগৎটাই যে হুবহু তার সমস্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে একই ভাবে প্রতিফলিত দেখা যাচ্ছে, তা নয়। আমার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বইয়ের নাম বুদ্ধদেব বসুর দেওয়া। সে বইয়ের নাম সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বাবুর সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি হয়েছিল। মনে আছে, আমি নিজে যে-সব নাম ভেবেছিলুম, তার মধ্যে একটি ছিল 'ধূসর মিনারের মায়াবী'। সে-সব চিঠির তারিখ তেরশ'-বিয়াল্লিশের কোনো সময়ে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বই হয়ে বেরিয়েছিল তেরশ'-তেতাল্লিশের অগ্রহায়ণে।

আমি বলেছিলুম: আপনার 'সাতটি তারার তিমির'-এর কোনো কোনো লেখা যে দুর্বোধ্য হয়েছে, সে কি আপনার মেডিটেশনের ফলে?

তিনি বললেন: কিছুতেই ছাড়বেন না, তা হলে? জবাব চাই?

আবার সেই বিস্ফারিত চোখের হাসি দেখা গেল জীবনানন্দের মুখে।

আমি বললুম: আপনার নিজের মনের কথা জানতে ইচ্ছে করে। তাই জিগেস করছি।

মনে আছে সেই সন্ধ্যায় তাঁর উপবেশন-ভঙ্গি। তক্তপোষে বসে একটু দুলছিলেন মাঝে মাঝে। সম্পূর্ণ স্থির হয়ে বসছিলেন কখনো কখনো। হঠাৎ আমাদের সেদিনের প্রসঙ্গ থেকে নিজের অতীতে চলে গিয়েছিলেন অতঃপর। তাঁর কথা শোনা গিয়েছিল—সে যেন সময়ের বহুদূর অন্য কোন প্রান্ত থেকে:

'আমার জন্মস্থান বরিশাল। সেখানকার কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করি আঠারো বছর বয়সে। কলকাতায় এসে বি. এ, এম. এ, ল' পড়লুম। উনিশ শ' বাইশ থেকে আঠাশ পর্যন্ত সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছি। আঠাশ সালে সরস্বতী পুজোর ব্যাপার নিয়ে হেরম্ববাবুর সঙ্গে সুভাষবাবুর সংঘষ মনে পড়ে। আড়াই হাজার থেকে তখন বোধ হয় ছাত্র-সংখ্যা নেমে গিয়েছিল আড়াইশ-তে। সিটি কলেজের চাকরিটা গেল। গেলুম বাগেরহাট কলেজে। সেখানে মাস-তিনেক ছিলুম। একবার দিল্লীর রামযশ-কলেজেও ছিলুম। উনিশ শ' চৌত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ পর্যন্ত বরিশাল কলেজে ইংরেজি পড়িয়েছি। সাতচল্লিশ পর্যন্ত সেখানে আমার চাকরি ছিল। কিন্তু ছেচল্লিশের পরে আর যাইনি। 'স্বরাজ' কাগজে ছিলুম ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সালে। তখন আপনার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, মনে পড়ে তো?'

জীবনানন্দ সেদিন যে 'মেডিটেশন'-এর কথা তুলেছিলেন, সে ধ্যান শিল্পী মাত্রেরই কাম্য এবং সাধনীয়। কবিদের পক্ষে এই ধ্যানের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালে অমিয় চক্রবর্তীর 'পালাবদল' বেরিয়েছিল। সে বইখানির প্রথম কবিতা 'এপারে'। কবিতাটির প্রথম ক'লাইন পড়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনানন্দের সঙ্গে সে ঘটনার প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার এক আলোচনার স্মৃতি মনে জেগেছিল।

দেখলাম দু-চক্ষু ভরে হে প্রভু ঈশ্বর মহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিও নক্ষত্রে বাজলো এই দেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়ানো নহবৎ

মনে মনে এই উক্তির গভীর দোলাটুকুর আস্বাদন মানতেই হয়। তবে, 'রেডিও নক্ষত্র' কিংবা 'খচিত রাত্রির দেয়া গান' যে সুস্পষ্ট কোনো অর্থের ভাষা নয়, সে-কথাও না মেনে উপায় নেই। 'শিরায় জড়ানো নহবৎ'-ও তেমনি সুবোধ্য বটে,

কিন্তু বিশ্লেষণের অধিগম্য হলেও তা যে দুরূহ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ, এই তিনটির প্রত্যেকটিই আবেগের সন্তান! কবির 'ধ্যান' মানে পূর্ণ প্রকাশের খণ্ড খণ্ড ধারণা অথবা তাদের সমাহার মাত্রই তো নয়। সেটা মনেরই গভীর এক অবস্থা! সে অবস্থায় বস্তু-অনুভূতি আর শব্দানুভূতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভেতরের আস্বাদন বাইরে উচ্চারণযোগ্য ধ্বনিতে পরিণত হয়। এই রূপান্তরণ কিন্তু বিশ্লেষণে পুরোপুরি ধরা দেয় না। 'এই হ্রদ' নামে ঐ বইয়েরই আর-একটি কবিতায় অমিয়চন্দ্র লিখেছিলেন :

পুরোনো শালের লাল পশমের লাল
মেপ্‌ল পাতায়
ঝরে হ্রদ-আয়নায়।
আগুনি বেগুনি বেলা হঠাৎ দারুণ
জ্বলে উঠে ডোবে বহুগুণ, গাঢ় ঢেউয়ে নির্বিত আকাশে
হেমন্তের সরে-যাওয়া ছায়া মেঘ ছেয়ে আসে,
ঐ ঝিল, ঝিনুকি সন্ধ্যায় করে ঝিলমিল।

এই উজ্জ্বল ছবির মধ্যে 'আগুনি বেগুনি'-র স্বাদটুকু মর্মস্পর্শী। সত্যিই এসব কথা বানানো অসম্ভব। এও ধ্যানের ফল। এবং 'ধ্যান' বললে এখানে লেখকের সেই সমর্পণের কথাই বুঝতে হবে, যাতে জীবনের বক্তব্য যথাযথ শব্দে ছন্দে ব্যক্ত হতে কোনো বাধা থাকে না।

'ভারতী'-পর্বের কবিরা যে সে রকম ধ্যানে কতটা সমর্থ ছিলেন, মোহিতলালের কবিতায়, সেইটুকুই দেখা গেছে। তারপর আধুনিকতর বাংলা কবিতা নিঃসন্দেহে সে সীমানা পেরিয়ে এসেছে। মোহিতলাল অর্থবহ শব্দকেই প্রধানতঃ ধর্তব্য বলে ধরেছিলেন। সেই সঙ্গে ব্যঞ্জনাও ব্যঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু অর্থানুসরণের দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে বিশেষ চিত্তাবস্থার আরো সাক্ষাৎ সঞ্চারের দিকেই আধুনিকতর বাংলা কাব্যধারার বিশেষ আগ্রহ। জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষ্ণু দেও এ-দিক থেকে পরস্পর তুলনীয়। এঁদের মূল বক্তব্য এক নয়। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ধারণাধর। কিন্তু কবির সাধ্য কাব্য-ধ্যানের দিক থেকে এঁদের সাদৃশ্যই স্বীকার্য।

কাল ও কালান্তর

সুধীন্দ্রনাথের জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৯০১, মৃত্যু ২৫ জুন ১৯৬০।

তাঁর সাহিত্য-চিন্তার প্রধান প্রধান কয়েকটি দিকের মধ্যে একটি হোলো এই যে,

তিনি বলে গেছেন : 'সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য লেখকের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে পাঠক-চৈতন্যের উদ্‌বোধন।'

তাঁর আরো কয়েকটি কথা এখানে তুলে দেওয়া গেল :

'জীবন যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই সাহিত্যের অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী।'

'অন্তে অমরাবতীর সন্ধান মিললে পাঠক পর্বতলঙ্ঘনেও কাতর নয়।'

'মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর করেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে ভাষা সম্বন্ধে তিনি কোনো কালেই ঔদাসীন্য দেখান নি। তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিল; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানতে হবে। ......মাইকেল শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলেই ঝিমিয়ে পড়েন নি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই।'

'প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাই কালোপযোগী; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার আরও একটা বাড়তি গুণ আছে, যেটা কালাতিরিক্ত।'

'প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবিই তাঁদের প্রসঙ্গকে যে-পরিমাণে বিস্তৃত করেন, পদ্ধতিকেও বদলান সেই অনুপাতে।'

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' বইখানির দুটি প্রবন্ধ থেকে পর পর এই ক'টি অংশ আবার পড়ে দেখলুম। এই উক্তিমালার প্রথম তিনটি তাঁর 'ধ্রুপদ-খেয়াল' প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া গেল,—শেষ তিনটি 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' থেকে। এই কথাগুলির মধ্যেই কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মপরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সেই সঙ্গে ছিলেন নবীনদের নেতা। শব্দ, ছন্দ এবং প্রসঙ্গের প্রকৃতি, কবিদের—কল্পনাশক্তি,—বাস্তব অভিজ্ঞতা,—তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিমার্জন ইত্যাদি নানা বিষয়ে গদ্যে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। স্বকীয়তা দেখাবার দিকে বিদেশে এ-কালের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ কতো যে উদ্ভট চেষ্টা করেছেন, সে-সব উদাহরণ তাঁর বাংলা প্রবন্ধে বিশদভাবে বলা হয়েছে। 'মৌলিকতা', 'প্রথা', 'ঐতিহ্য'—এই তিনটি শব্দ তিনি অনেকবার ব্যবহার করেছেন। কবিতায় দুর্বোধ্যতার অপবাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। অথচ বিষ্ণু দের মতন দুর্বোধ্য ছিলেন না তিনি। আর একথাও স্বীকার্য যে, কবিবন্ধুদের মধ্যে বিষ্ণু দের সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রীতি ছিল সর্বাধিক।

সৌজন্যে, শিষ্টতায়, আর্থিক এবং অন্য বিষয়েও—আভিজাত্যে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট একজন সামাজিক মানুষ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় যে-কাজ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরবর্তী কালের ভবিষ্যতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, সে তাঁর ত্রৈমাসিক (পরে কিছুকালের জন্যে মাসিক) 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা,—তাঁর গদ্য-রচনা,—এবং তাঁর সন্নিহিত সাহিত্যিকবন্ধুদের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণার প্রভাব। 'অতিপ্রজ', 'মাতরিশ্বা', 'আত্মৌপম্য', 'উপশয়ী', ইত্যাদি কতো বিচিত্র শব্দই যে তিনি ব্যবহার করে গেলেন! সেই সঙ্গে মনে পড়ছে শেক্স্‌পীয়রের একটি চতুর্দশপদী কবিতার শেষ দু'লাইন—কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যা অনুবাদ করেছিলেন :

না, তোরে সাধি না, কাল; দেখি তোর ক্ষমতা কেমন :
আমার কবিতা দিবে প্রেয়সীরে অনন্ত যৌবন।

এ 'শতাব্দীর সমবয়সী' কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্রথমেই এই দু'লাইন কবিতা মনে এলো।

সাতাশে এপ্রিলের সন্ধ্যায়

এক সঙ্গে অনেক মানুষ আর অনেক ঘটনার কথা মনে পড়লো।

বকুলবাগানের বাড়িতে সন্ধ্যার আলো জ্বলছে তখন। বেশ একটু জোরেই জ্বলছে। সামনে কয়েক জন মাত্র লোক। বোঝা গেল যে, রাজশেখর বাবুর মরদেহের শেষ দর্শনলাভ কপালে নেই। তবু মন মানে না। এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে কেওড়াতলার ঘাটে পৌছোলুম ছুটতে ছুটতে।

দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলো। শুনলুম, গ্যাসচুল্লির ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেছে কয়েক মিনিট আগেই। পদ্মফুলের স্তূপ পড়ে রয়েছে বাইরের ঢাকা বারাণ্ডায়।

কয়েকটি চেনা মুখ। আরো বেশি অচেনা মুখ। এপ্রিলের ভ্যাপসা গরম। চুল্লির একটানা চাপা শব্দ। মাথার ওপর অশেষ আকাশ। অন্ধকার, অশেষ অন্ধকার।

সেই আবহাওয়ার মধ্যেই একটি ভ্রমণের স্বপ্ন মনে এলো :

'বাংলার নদ-নদী, ঝোপঝাড় পল্লীকুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানা পুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ—এসব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পাঞ্জাব মেল সন সন ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে পট পরিবর্তন। মাঝে মাছে বিরাম—পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী-কচৌড়ি, রোটী-কাবাব, Dinner at

Shikohabad? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দুপাশে আকের ক্ষেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান অরণ্যানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে।'

পরশুরামের 'কচি-সংসদ'-এর মধ্যে—দার্জিলিং-যাত্রার ঠিক আগের অংশেই যাত্রী-হৃদয়ের এই দুরাকাংক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল। এ স্বপ্ন অবিশ্যি শরৎকালের। আজ, কলকাতায় উনিশ-শ' ষাট সালের এই এপ্রিল-সন্ধ্যায়—এ-স্বপ্ন অসংগত বোধ হয়। কানের পাশেই আজ অন্য শব্দ,—চোখের সামনেই আজ অন্য ছবি। চুল্লির চাপা শব্দে অন্য ছবি মনে এলো:

'হাতিবাগানের দরজী আবুবকর মিঞা আর তার বউ রমজানী বিবি সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ঈদের চাঁদ দেখছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস রমজানীর নজরে পড়ল। সে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, ও মিঞা, আসমানের মধ্যিখানে ছোট্ট কাটারীর মতন জুলজুল করছে ওটা কি গো? আবুবকর অনেকক্ষণ ঠাহর করে বলল, কাটারি নয় রে, ওটা পয়জার, দেখছিস না তালতলার চটির মতন গড়ন।'

রাজশেখর বাবুর শেষ দিকের গল্পসংগ্রহ 'আনন্দীবাঈ'-এর মধ্যে এই 'গগন চটি'-অ্যাস্টারয়েডের উদয়াস্ত কাহিনী দেখা গিয়েছিল! আকাশে অচেনা তারা উঠলে পৃথিবীর মানুষ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কোনো তারা শুভ, কেউ বা অশুভ। 'গগন চটি' কিন্তু দুষ্টগ্রহ। মনে পড়লো, রাজশেখর বাবু লিখেছিলেন, 'কিছুদিন পরেই দফায় দফায় যে জ্যোতিষিক সংবাদ আসতে লাগল তাতে লোকের পিলে চমকে উঠল, রক্ত জল হলে গেল। গগন-চটি নামক এই দুষ্টগ্রহ ক্রমশঃ পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে এবং মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পরস্পর টানাটানি চলছে। চন্দ্র সমেত পৃথিবী আর গগন-চটি যেন মিলে মিশে তাল-গোল পাকাবার চেষ্টায় আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, পাঁচ মাসের মধ্যেই চন্দ্র আর গগন-চটির সংঘর্ষ হবে, তারপর দুটোই হুড়মুড় করে পৃথিবীর উপর পড়বে। তার ফল যা দাঁড়াবে তার তুলনায় লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা তুচ্ছ। সংঘাতের কিছু পূর্বেই বায়ুমণ্ডল লুপ্ত হবে, সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত প্রাণী রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরবে। চরম ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় নেই।'

সেই মহাপ্রলয়ের আশঙ্কায় পৃথিবীর বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ তাঁদের গত পঞ্চাশ বছরের যাবতীয় কুকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে এক 'হোয়াইট বুক' ছেপেছিলেন! ঈশ্বরের কাছে নিজের অন্তর খুলে ধরা ছাড়া মানুষের বাঁচবার আর কোনো রাস্তা নেই যে! রাজশেখর বাবুই সেই বৃহৎ চতুঃশক্তির সম্মিলিত আর্তকণ্ঠের বাণীটি প্রকাশ করে গেছেন—'সব মানুষ ভাই ভাই, কিছুমাত্র বিবাদ নাই।' এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের সেই চরম চঞ্চলতার দিনে তাঁরই আপন-হাতে-গড়া হাটখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন 'পাপ যা করেছি তা করেছি, ঢাক পিটিয়ে সবাইকে তা বলতে যাব কেন রে হতভাগারা? গগন-চটি না ঢেঁকি, আকাশে লাখ লাখ তারা আছে, আর একটা না হয় এল, তাতে হয়েছে কি? তোরা বললেই প্রলয় হবে? মরতে এখন ঢের দেরি রে, এখনই হা-হুতোশ করছিস কেন? ভগবান আছেন কি করতে? 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'—রবি ঠাকুরের এই গান শুনিস নি? মানুষকেই যদি ঝাড়ে বংশে লোপাট করে ফেলেন তবে ভগবানের আর বেঁচে সুখ কি?'

সেই ভুবনেশ্বরীর বয়স হয়েছিল আশি বছর।

রাজশেখর বাবুরও আশি পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর জন্ম-তারিখ ১৮ই মার্চ, ১৮৮০—মৃত্যু ২৭এ এপ্রিল, ১৯৬০।

আজ, পদ্মের স্তূপের কাছে দু'একটি লোক ঘুরছে এপ্রিলের এই সাতাশে তারিখের সন্ধ্যায়। আজ এ দৃশ্যে চুল্লির ঐ চাপা শব্দ,—কয়েকটি মানুষের মনঃস্রোত,—আকাশে দুস্তর অন্ধকার আর, শহরে অর্থহীন আলো! শ্মশানে দাঁড়িয়ে জীবনের অপূর্ব চলচ্চিত্রের অনন্ততার কথা মনে জাগে। মন নিজেকে প্রশ্ন করে—কোন্ নিগূঢ় স্থির সমাহিত আছেন এই বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার আড়ালে? কে সেই 'অস্তি' এই বিশ্বব্যাপী 'নাস্তি'র আড়ালে?

তারই জবাব খুঁজতে খুঁজতে আবার মনে এলো তাঁরই আর একটি রচনা—

উর্বশী স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে চলে আসতে চেয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের তাতে আপত্তি ছিল। উর্বশীর বিশ্বাস ছিল যে, স্বর্গের সব দেবতাকেই তিনি কাবু করেছেন! ইন্দ্রের কাছে তাই অবশেষে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হোলো। অনেকের মধ্যে তিনটি মহর্ষিকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হোলো স্বর্গের উৎসব-সভায় উর্বশীর 'নির্মোক নৃত্য' দেখবার জন্তে।

নারদের মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে ঋষিরা খুশি হয়ে দেখতে এলেন।

'লাস্যনৃত্যের উপযুক্ত বেশভূষার উপর একটি আলখাল্লা বা ঘেরাটোপ পরে উর্বশী ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করলেন। সকলকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললেন, হে মহাভাগ দেবগণ এবং ঋষিগণ, আমি যে নির্মোক নৃত্য দেখাব তাতে আমার দেহ ক্রমে ক্রমে অপাবৃত হবে। আপনাদের তাতে আপত্তি নেই তো?'

কুতুক, পর্বত আর কর্দম তিন ঋষির মধ্যে কুতুক বললেন, 'আপত্তি কিসের? যাবতীয় জন্তুর ন্যায় তোমার দেহও পঞ্চভূতের সমষ্টি। তার অভ্যন্তরে নারীসত্তা কোথায় আছে, তাই আমরা দেখতে চাই।'

ঘেরাটোপ ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের চিত্তপীড়া হোলো। উর্বশীর দেহের উর্ধ্বাংশ অনাবৃত হতে দেখে কর্দমও বিচলিত হলেন। একমাত্র কুতুক রইলেন নির্মোহ। উর্বশীর 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি' প্রকাশিত হতে দেখবার পরেও তাঁর প্রতীক্ষা রইলো অশ্রান্ত, প্রস্তুত, প্রত্যাশী!

কুতুক বললেন, 'থামলে কেন উর্বশী, আরো নির্মোক ত্যাগ করো।'

নারদ বললেন, 'আর নির্মোক কোথায়! উর্বশী তো সমস্তই মোচন করেছে।'

কুতুক বললেন, 'ওই যে ওর সর্বগাত্রে পদ্মপলাশতুল্য শুভ্রারক্ত মসৃণ আবরণ রয়েছে।'

কিন্তু হায় রে অপরাজিত কুতুক! হায় রে পুরুষচিত্তবিজয়িনী উর্বশী! সেই শুভ্রারক্ত মসৃণ আবরণ তো উর্বশীর গায়ের চামড়া! সেই চর্মের নিচে মেদ, তার নিচে মাংস, তার নিচে কঙ্কাল!

কঙ্কালের নিচে কিছুই নেই। সব শূন্য! কিছুই থাকে না!

অতঃপর নারদ সে কথা কুতুককে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।

উর্বশীর পরমাশ্চর্য নারীত্ব তো তার কঙ্কালে নিহিত থাকবার কথা নয়। সে তার বসনে, ভূষণে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবে, ভঙ্গিতে—আর, আছে পুরুষের চিত্তে। জীবনের এই অপূর্ব চলচ্চিত্রের মধ্যেই জীবনের অন্তহীন মাধুর্য! রাজশেখর বসু সেই কথাই কতোভাবে যে বলে গেলেন! চোখ বুজলুম। চোখ বুজে তাঁর উদ্‌ভাসিত শরীর দেখতে পেলুম। কুঠারপাণি পরশুরাম। নির্মোহ কুতুক! স্নিগ্ধ-গম্ভীর রাজশেখর!

কয়েকটি আধুনিক বাংলা কবিতার বই

১৯৩৮ সালে অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস থেকে লুই ম্যাকনিসের 'মডার্ন পোয়েট্রি' বইখানি বেরিয়েছিল। তাতে তিনি চিত্রকল্পবাদী কবিদের এই দোষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, যে-কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করেই কবিতা লেখা যেতে পারে, এই

দলগত ধারণার ওপরে তাঁরা নাকি কতকটা বেশি রকম জোর দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। যাঁরা 'স্টাইল' সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহী, তাঁরা বিষয়বস্তুর নিজস্ব কোনো দাম দিতে চান না। অথচ এই সহজ কথাটা অনস্বীকার্য যে, 'বস্তু' ছাড়া 'রীতি' হয় না। লুই ম্যাকনিস আরো বলেছিলেন যে, টি, এস্, এলিয়ট যদিও তাঁর নিজের লেখাতে একদা এইসব 'ইমেজিষ্ট' কবিদলের প্রভাব মেনেছিলেন, তবু সে-ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ আঙ্গিক গড়ে তোলবার দিকে। এলিয়টের কাব্য-বস্তুর দিকে নজর দিলে এটা চোখে পড়তে দেরি হয় না যে, তিনি আধুনিক নগর-জীবন, খ্রীষ্টান ধর্ম এবং য়ুরোপের ইতিহাস—এই তিন দিকেই বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন। ম্যাকনিস বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, বর্তমান শতকের প্রথম দিকে ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে যাঁরা জর্জিয়ান-যুগবর্তী বলে চিহ্নিত, তাঁরা তাঁদের সীমিত বাসনা এবং সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার রাজ্যে নিরীক্ষাগত বিশেষ একরকম সামর্থ্য দেখিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু বৃহৎ, ব্যাপক, কোনো নিখিল বিশ্ব-বীক্ষার তাগিদ ছিলো না তাঁদের মধ্যে। এলিয়ট এসে সেই বিশ্ববীক্ষার বিশেষত্ব দেখালেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের ধাত সকলেরই পরিচিত। তিনি ব্যক্তিগত ভঙ্গির খুবই ভক্ত। নিজের নিজস্ব কোণ থেকেই সমকালীন জগতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন তিনি। জগৎকে সে-ভাবে দেখার মধ্য দিয়ে জীবন সম্বন্ধে যতটা বাস্তব আগ্রহ প্রকাশ করা সম্ভব, এলিয়টের মধ্যে সেইরকম বাস্তবতাই দেখা গেছে।

এলিয়ট সম্বন্ধে 'ক্লাসিক্যাল' স্বভাব বা শাশ্বত মনোধর্মের কথাও বহুবিশ্রুত। সে-সম্বন্ধে ম্যাকনিস বলেছিলেন যে, তাঁর বাক্‌সংযমগুণ এবং তাঁর চিত্রকল্পের সুমিতিকে যদিও 'ক্লাসিক্যাল' বলা যেতে পারে, তাঁর মনোভঙ্গি বা তাঁর কবিতার সামগ্রিক আবেদনের দিক থেকে তাঁকে কিন্তু আত্মানুশোচনা-প্রবণ, খ্রীষ্ট-নীতি-প্রভাবিত, বিশ্ব-কুতূহলী আধুনিক কবি বলেই মেনে নেওয়া ভালো।

•

আধুনিক বাংলা কবিতার কথা-প্রসঙ্গে প্রায়ই আধুনিক ইংরেজি কবিতার কথা উঠে থাকে। এলিয়ট বা অন্য কোনো বিদেশী কবির সঙ্গে বাংলা কবিতার কোনো বিশেষ লেখকের তুলনা অবান্তর। কারণ, দেশভেদে রুচি, ব্যক্তিত্ব, স্বভাব ইত্যাদির পার্থক্য ঘটে থাকে। তবে, এলিয়ট একালের বাঙালী কবিদের প্রিয় আদর্শ। বিষ্ণু দে তো তাঁর গভীর অনুরাগী; সুধীন্দ্রনাথ দত্তও তাই। বুদ্ধদেব বসু এবং আরো কেউ কেউ তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন। এঁদের পরে যাঁরা, তাঁরাও অনেকেই জীবনবীক্ষাগত এই পাশ্চাত্ত্য কাব্যভঙ্গির অনুরাগী। এঁরা বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথের মতন প্রবন্ধ লিখে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যরীতির বিশ্লেষণ করেন নি বটে,

কিন্তু তা না করলেও এঁদের মধ্যেও সে-সব আদর্শ কিছু-না-কিছু পরিমাণে, কোনো-না-কোনোভাবে প্রবেশ যে করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এলিয়টের আত্মশোচনার ঝোঁক কিংবা তাঁর চিত্রকল্প রচনার অভ্যাস আমাদের আধুনিকদের মধ্যে বর্তেছে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁর যে অন্যতর প্রবণতা বা প্রত্যয়ের কথা শোনা যায়, আমাদের কবিদের ক্ষেত্রে সেই দিকটির সঙ্গে তুলনীয় অনুরূপ বা অন্যতর কোনো ধর্মানুধ্যানের অভিব্যক্তি এখনো চোখে পড়বার মতো গুরুত্ব অর্জন করেনি। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলায় যে-সব নবীন কবি অল্পবিস্তর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনের কবিতা নিয়ে এইসূত্রে আমাদের সাম্প্রতিকতম শক্তিমান অথবা প্রতিশ্রুতিশীল কবিদের সাধারণ স্বভাবের সূত্রগুলি ভেবে দেখা যেতে পারে।

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং কটাক্ষের দিকে একালের প্রায় সব কবিরই অল্পবিস্তর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণু দে'র প্রথম দিকের লেখাগুলিতে, সমর সেনের মধ্যে,—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি লেখাতে এ-ঝোঁক আগেই দেখা গিয়েছিল বটে; এঁরা ছাড়া আরো কেউ কেউ এ-দিকে কিছু চর্চা দেখিয়ে গেছেন; কিন্তু আরো সাম্প্রতিক কালে এ-অভ্যাস ব্যাপক হয়ে উঠেছে। সজনীকান্ত দাস বা বনফুলের মতন নয়,—এ বিদ্রূপ-স্বভাব একেবারে পৃথক জাতের।

জীবিকা অর্জনের রূঢ় নিরানন্দে এবং প্রাত্যহিক বৈচিত্র্যহীনতায় এঁরা এতো বেশি পরিমাণে অবরুদ্ধ বোধ করেন যে, কোনোরকম সুন্দর অভিজ্ঞতাকেই এঁরা আর সহজ বা স্বাভাবিক বলে মনে করতে পারেন না। শুদ্ধসত্ত্ব বসু যদিচ এঁদের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ তবু তাঁর 'আজন্ম' (বৈশাখ, ১৩৬০) বইখানির প্রথম কবিতাটি এখানে এই বিশেষত্বের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলে অন্যায় হবে না। সে লেখাটির নাম 'ব্যঙ্গ'। তার প্রথম কয়েক লাইনে তিনি বলেছেন যে, ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল ইস্পাতে কতো মানুষই যে কাটা পড়েছে, তার আর লেখাজোখা নেই! তাঁর সেই বেদনার মধ্যে তাঁর মনের এই আধুনিক প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

তবুও এমন মনে রাত্রি আসে, রঙ জাগে
জানালার পাখি বেয়ে চাঁদ আসে,
স্বপ্নের সারঙে তোলে সুর।
মন দিয়ে তোমাকে যে করি অনুভব
কত কাছে, কত কাছে, একান্ত নিবিড়!
পুষ্পধন্বা ব্যঙ্গ করে নাকি

এটি তাঁর ১৯৪৫-এর রচনা। 'পুষ্পধন্বা' শব্দটির মানে কামদেব। অর্থাৎ চাঁদের আলোতে সে-রাত্রে মনে যে কোমল ভাব দেখা দিয়েছিল, কবি তাকে মদনের ব্যঙ্গ বলে

সন্দেহ করেছিলেন! এই 'আজন্ম' বইখানির মধ্যেই তাঁর ১৯৪৩-এর রচনা 'প্রেম', ১৯৪৪-এর 'নেপথ্য', ১৯৪৮-এর 'যাদু' এবং ১৯৫০-এর 'আজন্ম' ছাপা হয়েছিল। এই চারটির প্রত্যেকটিতে প্রেমের স্বীকৃতি ছিল। বইয়ের নাম-কবিতায় তিনি সেই প্রেমের উদ্দেশেই বলেছিলেন:

তোমাকে পেয়েছি আমি ইতিহাস-চেতনার আগে—
সৃষ্টির সুরুর থেকে তুমি এক প্রসন্ন কাকলি,
রক্তের সমুদ্র যেন নিরুপম দ্বীপের সংকেত,
জীবন-সংগ্রামে তুমি মূর্তিময়ী অক্লান্ত সাধন:
মৃত্যুর দুর্ধর্ষ ভয় ভেঙে তুমি অক্ষয় আশ্বাস—
তোমাকে পেয়েছি বলে আমি এক সম্পূর্ণ মানুষ!

কিন্তু এই সম্পূর্ণতা-বোধকেও তিনি যে ব্যঙ্গ-চেতনার ওপরে জায়গা দিতে চাননি, তারই ক্ষীণ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে বইখানির অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির বিন্যাসের মধ্যে। বইয়ের নাম 'আজন্ম'—এবং তার প্রথম কবিতাই হোলো 'ব্যঙ্গ'!

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকন্যা' বইখানি বেরিয়েছিল ১৩৬১ সালে। সেইখানিই তাঁর প্রথম কবিতার বই। তাতে 'শব্দময়' নামে যে লেখাটি ছাপা হয়, তার প্রধান কথাটা এই ছিলো যে, কবির মনে কোনো এক আকাশের কোনো চঞ্চল ডানার শব্দ এসে পৌঁছেচে। একদিকে এই বাস্তব জগৎ, অন্যদিকে সেই ডানার শব্দ,—কবির মনে অনুক্ষণ জেগে আছে সেই শব্দ!

ছেঁড়ে মালা কাটে সুর
তবু কাছে আসে সে সুদূর।

এবং এই বোধ, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতার সূত্রেই 'একটি কবিমন' নামে তাঁর অন্য একটি কবিতার কথাও বিবেচ্য। তাতে তিনি সাধারণ ভাবে কবি-স্বভাবের বর্ণনা দিয়েছিলেন। কবি এই শহরেরই সাধারণ মানুষ মাত্র। তবু—'দুঃখে বেদনায় ক্ষোভে সে মন জ্বলেও বহ্নিমান।' কবি-মনের এই 'বহ্নিমান' অবস্থার কথা গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় বার বার স্মরণ করেছেন। 'অগ্নিমান' কবিতাটির শেষ কয়েক ছত্রে তিনি প্রশ্ন করেছেন:

রঙিন ফুলের ঢেউ
আকাশ পাখিরো আছে গান,
তারার প্রশান্তি কই! হৃদয় তো আজো বহ্নিমান।
জমাট-তুষার ভেঙে অশান্ত সাগরে ঠেলে ঢেউ
উষর মরুর বুকে জাগাবে না পুষ্পবন্যা কেউ।

অর্থাৎ তাঁরও মনে সংশয়, সন্দেহ এবং বিষাদের বিষ ঢুকেছে।

চাঁদের আলো দেখে শুদ্ধসত্ত্ব বসু পুষ্পধন্বার ব্যঙ্গের কথা ভাবেন, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় উষর মরুর বুকে পুষ্পবন্যার সুদূর সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটু আশার কথা শুনতে চান! ভাবতে ভাবতে তিনি কবিদের 'রাজকন্যা'-বাসনাও ফেলতে পারেন না, আবার সারা পৃথিবী যে এ-কালে বিরাট এক হাসপাতালের মতন যন্ত্রণার জায়গা হয়ে উঠেছে, সে-সত্যবোধও তাঁর মনে কাঁটার মতন বিঁধতে থাকে।

ক্লান্ত রোগীর মতন হাঁপাই
প্রহরে প্রহরে দিন গুণে
ভাবি, কবে শেষ এ-যন্ত্রণার
কোন্ আশা-ভরা ফাল্গুনে।

জীবনের 'নিচে-তলায়' স্থূল সংসারের রূঢ়তায় পিষ্ট কবিমন তাঁর কলমে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আশার কথাই জাগিয়ে রেখেছে :

তবু মনে হয়,
এ-কানুন চিরদিন নয়
পাতাল উত্তাল হবে, একদিন সূর্য উঠবেই
এ আঁধার পুড়ে যাবে, আর দেরি নেই।

১৩৬৫-র ১৪ই অগ্রহায়ণ দুর্গাদাস সরকারের 'দ্বিতীয় সন্ধি' বেরিয়েছে। তাতে 'বাঁশি' বলে যে কবিতাটি ছাপা হয়েছে, সে-লেখাটিতে এ-যুগের কবিমনের প্রতীক হিসেবেই বাঁশি-কে তিনি কাজে লাগিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। খিদিরপুর অঞ্চলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত একটি ভিখিরি রাস্তায় পড়ে পড়ে বাঁশি বাজাতো। সেই দুর্ভাগা একদিন মরে গেল।

ফুটপাতে যারা হেঁটে গেল তীরের চেয়েও জোরে,
দুচোখে দেখলো হাত-পা ছড়ানো উলঙ্গ রোগীটা
চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে।
সারা গায়ে তার মাছির পাহাড়।
শিয়রে কাঁদছে একটা অচেনা ছোট্ট ছেলে
যেমন ময়লা তেমনি রোগাটে।

এবং সেই দুঃখের মধ্যেই—

ঝাড়ুদার এলো কিছুক্ষণ পরে।
ফুটপাত থেকে তুলে নিল একটা পুরোনো বাঁশি,
ফেলে দিল সেটা ডাস্টবিনে!

—এই তো সে কবিতার সহজ, সরল বিষয় বা বস্তু-প্রকৃতি !

অথচ দুর্গাদাস সরকার প্রধানতঃ সৌন্দর্যপিপাসু, প্রেমার্থী, প্রকৃতি-রসিক কবি। সকরিগলি ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে মনিহারী হয়ে কিষণগঞ্জ, শিলিগুড়ি ইত্যাদি ছুঁয়ে উত্তরে দার্জিলিং-যাত্রী তাঁর এই কবিমনের কিছু কিছু ভাবনার খবর আছে তাঁর 'সমুদ্র সংবাদী' লেখাটিতে। শুকনার শালবন দেখেছেন তিনি। এবং সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেই—

তখন কে মিতস্বরে বলে কানে কানে—
(জীবনের যে জেনেছে মানে। শীতে তার কুঞ্চিত কপাল,
নগ্ন হাত, নীল মুখ, দুর্ভিক্ষের সে এক কঙ্কাল।)
অমিত বিক্রম মানে—প্রাগৈতিহাসিক গ্লানি চায়ের বাগানে।

এ কালের বাংলা কবিতায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ, সমর্থ, নবীন কবিদের ব্যঙ্গদৃষ্টির এই হোলো স্বরূপ। জীবনের কঠোর সামাজিক এবং আর্থিক অসংগতির পরিমণ্ডলে কবিদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া একে অন্য কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ জন্যে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলা বা পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গি অনুকরণের দরকার হয় না। এটি এযুগের স্বদেশী ব্যাধি—এবং এ ব্যাধি জগদ্ব্যাপী !

১৩৬৩ (১৯৫৬, ডিসেম্বর) সালের অগ্রহায়ণে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লখিন্দর' প্রকাশিত হয়। যন্ত্রণা এবং আশা,—একই সঙ্গে এই দুই অভিজ্ঞতার বোধ ফুটেছে সে বইয়ের 'বেহুলা' কবিতাটিতে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মতন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বাংলার প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কার-কে আধুনিক পরিবেশে আধুনিক লক্ষ্যের অনুকূল করে তোলবার পক্ষপাতী। বিষ্ণু দে ইত্যাদি প্রবীণতর কবিদের দ্বারাই এঁরা হয়তো এদিকে প্রভাবিত হয়েছেন, হয়তো বা স্বাধীন ভাবেই এ-দিকে এগিয়েছেন। সে যাই হোক, 'বেহুলা'তে বীরেন্দ্র লিখেছেন যে 'বাংলার বিধবা সতী' তাঁর মৃত দয়িতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের আশাতেই ভেলায় ভেসে চলেছেন :

সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্ত-পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে।

তিনিও আশাবাদী কবি। তিনিও যন্ত্রণার চারণ। আশা, বেদনা, স্মৃতি এবং দীর্ঘশ্বাসের সাহচর্যে তাঁর কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো এক-একটি ছবি জেগে ওঠে। 'ঘুড়ি' রচনাটির মধ্যে কোনো এক মাদ্রাজী পানশালায় পানরত, তাস খেলায় নিযুক্ত কয়েকটি যুবকের অপরাহ্ণকালীন সম্মেলন দেখে তিনি বলেছেন :

অন্য তাস নেই ; ছেঁড়াখোঁড়া একটি গোলাম
ধ্রুব নক্ষত্রের মত টেবিলের উত্তর কিনারে

বর্তমান পৃথিবীর সভ্যতার যৌবমূর্তি দেখে
বিতৃষ্ণায় চোখ বোজে। কিন্তু বয়সের সাধ আছে…
সেই সব টুকরো সাধ জোড়া দিয়ে রাত্রির আঠায়
বিশ্বকর্মার চেয়ে অধিক উৎসাহ বুকে নিয়ে
মহামান্য যুবকেরা—ডক্টর, শ্রীযুক্ত, কমরেড—
শিল্প, রুচি, প্রগতির দায়িত্বে সৃষ্টির কর্মে মাতে।

এবং এইসব দেখে তিনি বলেছেন :

সেই সৃষ্টি—ব্যবহৃত ঠোঙা আর কাগজ—
আমাদের সূর্য ; এসো, আকাশে উড়িয়ে দেওয়া যাক।

ছবি ফুটিয়ে তোলার দিকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহ অনেকের চেয়ে বেশি। কেবল বর্ণনার জন্যেই যে তাঁর আগ্রহ, তা নয়। আমাদের সমসাময়িক জীবনের বিষাদ, নৈরাশ্য, যন্ত্রণাবোধের কথা বলতে বলতে তাঁর মনে আপনা থেকেই ছবি জেগে ওঠে। 'গোধূলি যাত্রা' কবিতাটির মধ্যে সেইভাবেই সারসের ছবি জেগেছে :

মনের সারস হাঁটে
মন্থর সন্ধ্যায়
একাকী।

এই একাকিত্ববোধও সাম্প্রতিক কোনো কোনো কবির মধ্যে বিশেষ তীব্র হয়ে উঠেছে। সারসের ছবি এঁকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই নিঃসঙ্গতার কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন :

মন্থর সন্ধ্যায় হাঁটছে—
কোনোখানে নেই ঘর।
সময়ের গায়ে জ্বর,
কাটা ভিজে ছাইচাপা ঠোঁট দুটি চাটছে ;
মনের সারস তবু হাঁটছে।

স্মৃতির বালুচর, ক্লান্তি, স্মৃতির তুষার, হাওয়ার জ্বর ইত্যাদি প্রয়োগ তাঁর নানা কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একা এবং কয়েকজন' (পৌষ ১৩৬৪) বইখানির মধ্যে তাঁর সমর্থ কলমের স্বাতন্ত্র্য চিনিয়ে দেবার মতন অনেকগুলি রচনা জায়গা পেয়েছে। একাকিত্বের বোধ তাঁর মধ্যেও সুস্পষ্ট, তবে 'একা এবং কয়েকজন' এই গ্রন্থনামের মধ্যে তিনি তাঁর নিঃসঙ্গতার কথাটা একটু অন্যভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। মনের যে

অন্ধকার থেকে কেউ কেউ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা তুলেছেন, সেই অন্ধকার থেকেই তিনি তামসিক চাঞ্চল্যের কথা বলেছেন। 'তামসিক' শিরোনামে তিনি বলেছেন :

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও গভীরে যাও বুকের হলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভরে, তবু ফেরাও মুখ
গভীরে যাও, গভীরে যাও দুহাতে ধরো আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

আধুনিক বাংলা কাব্যরীতির একটি বিশেষত্বই হোলো চাতুর্যের চর্চা। শব্দে, ছন্দে, ছবিতে বাহিত বক্তব্যের মধ্যে এইসব কবিদের সামান্য—অর্থাৎ সাধারণ লক্ষ্যগত একরকম ঐক্য তো খুঁজে পাওয়া যায়ই—তা'ছাড়া এঁদের বাচনভঙ্গির মধ্যেও এই সাধারণ বিশেষত্বটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চতুরের উপমা', 'মঞ্চ' ইত্যাদি কবিতা সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তাঁর একাকিত্বের কথা তিনি তাঁর 'একা' কবিতাটিতেই বেশ সহজভাবে জানিয়েছেন :

গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন
অন্ধকার চিন্তাকুণ্ডে পা ছড়িয়ে বোসো হে আরামে
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে।

এবং তাঁর অন্ধকার চিন্তাকুণ্ডের ভাবনাই 'আত্মকাহিনী' নামে অন্য একটি কবিতায় অন্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

দিনের যুদ্ধে সমস্ত আশা নিঃশেষ হলে
রাত্রি তখন প্রেয়সীর মত আভরণ খোলে।
তার রূপ যেন মৃত্যুর মত ম্লান মনে হয়
সঁপে দিই তাকে নিজের ব্যর্থ ক্লান্ত হৃদয়।
শুধু মনে মনে প্রার্থনা করি অস্ফুট স্বরে
নতুন দৃশ্য ঘুম ভেঙে যেন দেখি কাল ভোরে।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও এ-যুগের কবিসত্তার বিশেষ প্রকৃতির কথা ভেবেছেন এবং তাঁর 'কবি'-র মধ্যে তিনি সেই একই কথা লিখেছেন :

তার কোনো দুঃখ নেই, সে তো সব দুঃখেরও অতীত
তার চক্ষে আলো জ্বলে, সে আলোর বর্ণ নেই কোনো
তার বুকে এত ঘুম, ছুঁয়ে দেখি সে তো নয় মৃত
যন্ত্রণার আভা দিয়ে তার মুখ আগুনে সাজানো।

মাঝারি-কবিতার সংকলন

সৌম্যদর্শন, কৃতী, মধ্যবয়সী কোনো কোনো লোকের মুখে কখনো কখনো এ-কথা শুনতেই হয় যে—'কবিতা এক সময়ে আমরাও লিখেছি মশাই! কিন্তু সে ছিল ছেলেবেলার স্বভাব। এখন এই বুড়ো বয়সে কবিতা আর আসেই না। তবে হ্যাঁ, তেমন লাইন দেখতে পেলে মনটা এখনো দুলে ওঠে বৈ কি!'

কথায় কথায় সেই পুরোনো কথাই সেদিন আর একজন বলে গেলেন।

আমি তাঁকে জিগেস করলুম, 'কি রকম লাইন?'

তিনি দু'এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইলেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—'না তেমন অবিস্মরণীয় কিছু নয়,—সে-কালের মাঝারি কবিরা যেমন লিখতেন, সেইরকম আর কি!'

তারপর আমরা দু'পক্ষই সে-কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তিনি উঠে যাবার সময়ে তাঁর হাতের বইখানি নিয়ে যেতে ভুলে গেলেন। এবং তিনি চলে যাবার পরে সেই বইখানির পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে তাঁর বিগত জীবনের কবিতা-প্রীতির কথা আমার আবার মনে পড়লো।

১৩৩৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'বিচিত্রা' সেখানা; সাতাশ বছর আগে সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকের বয়স নিশ্চয় আরো সাতাশ বছর কম ছিল। আজ যিনি পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েছেন, সেদিন তিনি ছিলেন তেইশ বছরের নব যুবক। হয়তো একালের বাংলা কবিতার স্রোত তাঁকে তাঁর তেইশ বছরের যৌবনের কথা আর ভাবতেই দিচ্ছে না,—হয়তো একালের বিষয় তাঁর মনে ধরছে না,—একালের সঙ্গে সেকালের কোনো যোগই হয়তো তাঁর নজরে পড়ছে না।

কৌতূহলবশে সেই পুরোনো 'বিচিত্রার' মধ্য দিয়ে সে-কালের দিকে চোখ ফেরালুম।

প্রথমেই চোখে পড়লো 'পারস্য ভ্রমণ' নামে একটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তখন পারস্য-ভ্রমণ শেষ করে ফিরেছেন। আশোকবিজয় রাহা সেই ঘটনা উপলক্ষে 'পারস্য-প্রত্যাগত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে' এই কবিতাটি লিখেছিলেন। সেই লেখাটির কয়েকটি পৃষ্ঠা পরেই দেখা গেল নবেন্দু বসু এম. এ. মশায়ের লেখা 'লছমন-ঝুলায় গঙ্গা'। সেটিও কবিতা। সুবোধ দাশগুপ্ত নামে আর এক কবি 'ফাল্গুন-সনেট' নাম দিয়ে পর পর চারটি 'সনেট' লিখেছিলেন। অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের 'পঞ্চাঙ্কুর' অতি সাধারণ কয়েক ছত্রে পরিসমাপ্ত। জসীম উদ্‌দীনকেও সেই 'বিচিত্রা'তেই উপস্থিত দেখা গেল। তাঁর সে-লেখাটির নাম 'মুই তো যোগ্য নই'। সাতাশ বছর আগেকার

সেইসব লাইন দেখে যাঁদের মন দুলে উঠতো আজ তাঁরা কোথায় আছেন জানি না! তবু তাঁদের কথা ভেবেই গুন্ গুন্ করে পড়লুম দু'লাইন :

'ফুল যদি হইতাম বন্ধু! পরতা গলায় মালা;
বাতাসে ছড়াইয়া বাস জুড়াইতাম মনের জ্বালা!'

হঠাৎ দমকা বাতাসের ঢেউ এলো জানালা দিয়ে। পত্রিকার সেই পাতাটা উড়ে ভাঁজ হয়ে হারিয়ে গেল। চোখের সামনে অন্য এক পৃষ্ঠায় অন্য একটি লেখা স্থির হয়ে আছে দেখলুম। সেটিও কবিতা। রচনার নাম 'মানসী'। তাতে কবি লিখে গেছেন :

এসো রমা, মনোরমা; এখানেতে এসো না।
তোমারে যা বলি আমি শুনে যেন হেসো না।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এই প্রান্ত থেকে সাতাশ বছর আগেকার বাঙালী কবিদের এই অতি সরল আবেগের কথা ভাবতে ভাবতে আরো কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে এগিয়ে গেলুম 'সংগীতের ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে। তাতে প্রবন্ধকার মণিলাল দেবশর্মা লিখেছিলেন, 'একই কবিতা আবৃত্তি করিতে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লয়ের পরিবর্তন অনেকটা ছায়া অভিনয়ের দৃশ্যপট পরিবর্তনের মত করিতে হয়।' সকলেই জানেন সে-সময়ে 'বিচিত্রায়' দিলীপকুমার রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন এবং অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মণিলাল সেনশর্মার এই লেখাটির পাদটীকায় 'বিচিত্রা' সম্পাদক জানিয়েছিলেন—'বিচিত্রায় ছন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই প্রবন্ধটি আমাদের হস্তগত হইয়াছিল।' এই খবরটুকু পেয়ে প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে হোলো। দেখলুম লেখক বলেছেন, 'সঙ্গীত-অভিজ্ঞ কোন কবি যদি সঙ্গীতের ছন্দ অনুযায়ী কবিতা লিখেন তবে বাংলা ছন্দ আরও নূতন কিছু লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই কারণে সঙ্গীত আলোচকদের সুবিধার জন্য সঙ্গীতের ছন্দের বিশেষত্ব ও যথাসম্ভব অনুরূপ কবিতা দিতেছি।' এই ঘোষণা অনুসারে তিনি দৃষ্টান্তও দিয়ে গেছেন। যেমন—

তেতালা—ভোম্‌রায় গান গায় (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)
ঢিমা তেতালা—পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভোতল…(ঐ)
আদ্ধা—ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা (ঐ)
ঠুংরী—গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই
কার্ফা—সত্যেন্দ্রনাথের পাল্কীর গান
কাহারবা—তুল্ তুল্ টুক্ টুক্…

কিন্তু সংগীতশাস্ত্র আমার স্বদেশ নয়। অতএব সে-আলোচনাতেও বেশিক্ষণ মন দেওয়া গেল না, যদিও কবিদের উদ্দেশে 'সংগীতের ছন্দ অনুযায়ী' কবিতা রচনার পরামর্শটি

বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হোলো। অতঃপর তরুণ কবি সুকুমার সরকারের মৃত্যু-সংবাদে পৌঁছে মনের সেই ঈষৎ কৌতুক এবং প্রসন্নতার ভাবটি চকিতে অন্তর্হিত হোলো। তখনকার 'স্বদেশ' মাসিক-পত্রিকায় সুকুমার তাঁর নিজের স্বভাবের কথা বলে গেছেন। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা ইত্যাদি নানা প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়েছিল। 'স্বদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সেই বিশেষ কবিতাটির নাম ছিল 'মুসাফির'। ১৩৩৩ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ছাত্র-জীবন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অমিয় চক্রবর্তী ইত্যাদি অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিত্বের নমুনা আমার ভালো লাগেনি। তাঁর অসংযমের কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। কিন্তু সে-কথা যাক্‌। 'বিচিত্রা' পত্রিকার সেই সংখ্যায় ১৯৩২ সালের ১০ই জুলাই তারিখে সুদূর ভেনিসে রচিত কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'ভেনিসিয়া (সনেট)' শিরোনামে যে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল, কয়েকবার গুণে গুণেও তাতে বার-বার মাত্র তেরটি লাইনই আমার চোখে পড়ল,—এবং ততক্ষণে সে-কালের বাংলা কবিতার অন্ততঃ এই আলোচিত স্তর সম্বন্ধে আমার মনে একরকম ধারণা দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু সে ধারণা নিতান্তই ব্যক্তিগত। তাতে অতীতের প্রতি অনাদরও ছিল না, আকর্ষণও ছিল না। সাতাশ বছর আগেকার কাব্যানুরাগী এক বাঙালী যুবকের পক্ষে সেকালের মাঝারি বাংলা কবিতা কতদূর উপভোগ্য ছিল, সেই ভাবনাই আমার মনে জেগেছিল। এবং ঠিক সেই সূত্রেই আরো দশ বছর আগেকার একটি উক্তি মনে পড়েছে। ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যার 'ভারতী'তে নবকুমার কবিরত্ন (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছদ্মনাম) লিখেছিলেন, 'যা যুগধর্মের অতীত বা যুগোত্তর, তাই চিরকালের জিনিস। ভাব-জগতে যাঁরা যুগ-প্রবর্তক, যাঁরা প্রতিভাবান, তাঁদের উপর যুগের প্রভাব অতি অল্প। তাঁদের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি নিজের যুগকে, জাতিকে, এমন কি নিজেকেও অতিক্রম করে চলে। যাঁরা পাঁচ-পাঁচী রকমের লেখক তাঁদের লেখাতেই যুগের—কালের জগদ্দল পাথর চেপে বসে থাকে। তার কারণ, তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব তেমন সুস্পষ্ট নয়। তাই যুগ-ধর্মের ছাপ ও সমাজ-ধর্মের চাপ বিশেষ করে তাঁদের রচনাতেই জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে।' বাংলায় 'পাঁচ-পাঁচী' কথাটা আজকাল আর চোখেও পড়ে না, শোনাও যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ বোধ হয় মাঝারি-স্তরের লেখকদের সম্বন্ধেই ও-কথা প্রয়োগ করে গেছেন। কিন্তু তাই কি ? তাঁরই স্ব-প্রদত্ত পরবর্তী শ্রেণীবিভাগ মনে পড়লো—'যুগোত্তর সাহিত্যের পরবর্তী স্তরে যে সাহিত্য তাকে যুগন্ধর সাহিত্য বলা যেতে পারে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের উপর যুগেরও খানিকটা প্রভাব থাকে, আবার যুগের উপরেও খানিকটা এর নিজের প্রভাব বিস্তৃত

হয়। বস্তুভিত্তির বিপুল পৃষ্ঠে যুগকে এ ধারণ করে কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্যে দেশ-কালকে অতিক্রম করে।' অতঃপর আরো নিচের স্তরের সাহিত্যকে তিনি বলেছিলেন 'যুগোদ্ধারণ সাহিত্য'। আবার তাঁর নিজের কথাই দেখা দরকার—'যুগের ধর্ম এ বদলে দিয়ে যায়, কিন্তু এর দৌড় খুব বেশি নয়। টলস্টয় এই সাহিত্যের ধুরন্ধর। আর্টের হিসাবে অনিন্দ্য হলেও বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং গোর্কির 'কম্‌রেড্‌স্‌' এই শ্রেণীর বই। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ-সংগীত ও জাতীয় সংগীত এই কোঠাতেই পড়ে।...'

তাঁর মতে যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নাম তাহলে দাঁড়াচ্ছে 'যুগোত্তর', 'যুগন্ধর' এবং 'যুগোদ্ধারণ' সাহিত্য। অতঃপর তৃতীয়ের নিচে কি? 'তার নিচের স্তরে যে সাহিত্য তা চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্য,—তা যুগানুগ, যুগোচ্ছিষ্ট ও যুগোপ্ত সাহিত্য।'

এই পর্যন্ত লিখেই সত্যেন্দ্রনাথ অতঃপর আরো তীব্রতর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'অনুকরণে এর জন্ম, অনুসরণে এর পুষ্টি আর যুগধর্মের অনুমরণে এর মৃত্যু। ছেঁড়া মতে জোড়াতালি দেওয়া এর কাজ। আধ-মরা আবেগের আধকপালে রোগে এর মাথা-ব্যথা, মানুষের মুক্ত মূর্তি এখানে পদে পদে সংকুচিত। এর ভাবোচ্ছ্বাস পর্যন্ত সংহিতা-শাসিত; চিদ্‌ধাতুর কোনো চিহ্নই এতে নেই। সাময়িক পত্র এর প্রধান বাহন, রঙ্গালয় এবং চায়ের দোকান এর দুর্গ। তোতাপণ্ডিত এবং হাতুড়ে সমালোচকের প্রশস্তি এর পুরস্কার।'

আমরা সাধারণতঃ যাকে মাঝারি-লেখা বলে থাকি, সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে তারই নাম দিয়েছিলেন 'পাঁচ-পাঁচী' রকমের লেখা! তবে তিনি একটু মাত্রা চড়িয়ে বলেছিলেন। যে সৌম্যদর্শন, কৃতী এবং মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটির কথা ভাবতে ভাবতে এই সব কথা এতো বিস্তৃতভাবে মনে এলো, তিনি তাঁর নিজের যৌবনকালে অবশ্যই এক বা অনেক সাময়িক পত্রিকা পড়েছেন। সাময়িক পত্রিকার সাধারণ কবিতার মধ্যে চিদ্‌-ধাতুর চিহ্ন যে আদৌ থাকে না, তা নয়। তবে চিত্তের সংযম সত্যিই সাধনার ব্যাপার! মাঝারি লেখার মধ্যে সেই সংযমের মান তেমন উঁচু না দেখতে পাওয়াটাই প্রত্যাশিত। সাময়িক পত্রিকার উদার আশ্রয়ে এমন অনেক লেখাই জায়গা পেয়ে থাকে যাতে চিত্তের ক্রিয়া দেখা যায় বটে,—কিন্তু যা দেখা যায় না, সে হোলো চিত্তের শিল্পাদর্শপ্রবুদ্ধ শাসন! যেমন, সেকালের এই দু'ছত্র ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে:

পল্‌কা ভাব-স্পর্শ-লাগা হাল্‌কা স্নায়ু-কম্পনে—
খেলতো ছুটে টাটকা প্রাণ, মটকা-ছোয়া লম্ফনে।

১৩২৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'প্রবাসী'তে সেকালের প্রসিদ্ধ কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'এখন' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই দু'লাইন সেখান থেকেই তুলে দেখা গেল।

সেকালের সাময়িক পত্র খুঁজে দেখলে এরকম নমুনা ভূরি পরিমাণে পাওয়া যাবে। এবং এও কেবলমাত্র সেকালেরই বিশেষত্ব নয়। সব যুগে,—সব কালেই এই রকম মাঝারি ধরনের আবেগ কোনো-না-কোনো কবিগোষ্ঠীর মন থেকে নিঃসৃত হয়ে কোনো-না-কোনো পত্র-পত্রিকায় আশ্রিত হচ্ছে। বিজয় মজুমদারের ঐ নমুনাটির দশ বছর পরে—১৩৩৬-এর কার্তিক সংখ্যার 'মানসী ও মর্মবাণীতে' প্রসিদ্ধ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখে গেছেন 'বর্ষামিলন'। সেও এই জাতের জিনিস। মাঝারি লেখা বিখ্যাত লেখকদের কলম থেকে বর্ষিত হবার সত্যিই কোনো বাধা নেই। যাঁরা এ জিনিস রেখে যান তাঁরা সকলেই কিছু অখ্যাত নন!

সাধারণতঃ বড়ো কবি একলা দেখা দেন,—সেও আবার অনেক কালের ব্যবধানে। মধুসূদনের পরে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে আজো অনেক কবি অনেক ভঙ্গি, অনেক চাতুর্য, অনেক কলাকৌশল দেখাচ্ছেন এবং মন্তব্য শোনাচ্ছেন। তাঁদের সকলের শক্তি সমান নয়। কারো আবেগ প্রগাঢ়, কারো বা তরল। আজ থেকে বিশ বছর পরে ভবিষ্যতের প্রৌঢ় কাব্যানুরাগীদের কেউ কেউ যে একালের দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিক্ষেপ করবেন এবং একালের যাঁরা মাঝারি শিল্পী তাঁদের কারো কারো পাঠক যে সে-কালেও মনে মনে তাঁদেরই প্রত্যাশায় থাকবেন, সে-কথা অননুমেয় নয়। সেই প্রতীক্ষা পূরণের জন্যে তো বটেই, তাছাড়া ইতিহাসের ধারা মনে রাখবার জন্যেও প্রত্যেক দশ বছরে এক-একখানি মাঝারি কবিতার সংকলন ছাপা হওয়া উচিত। এরকম সংকলনে প্রসিদ্ধ কবিরা যদি জায়গা না পান. তাহলে স্থান-সংকোচের অভিযোগ আনা চলবে না, বরং সেটাই স্বাভাবিক বলতে হবে। প্রসিদ্ধ কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাঝারি। প্রসিদ্ধির ছাড়পত্র কখনোই গুণের বিচার নয়! কিন্তু মাঝারিদের মধ্যে অপ্রসিদ্ধ যাঁরা, কে তাঁদের ছাড়পত্র দেবে?

মাঝারি কবিতার সংকলনে বিশেষতঃ সেই সব কবিদেরই জায়গা হওয়া উচিত যাঁরা যুগের হাওয়ায় নিজেদের ভাসিয়ে রাখবার দক্ষতা তো দেখিয়েইছেন,—ততোধিক এও দেখাতে পেরেছেন যে, যুগ-মনোভাবের সাধারণ বাহক মাত্র হয়েও সমকালীন সমবেদনার পথ ধরে অনুরাগী ব্যক্তির মনে পৌঁছানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

সকলেই জানেন, মন আমাদের অনতিজ্ঞাত রহস্যপুরী! তার কোন্ কক্ষে কে যে কতোকাল বসে আছেন, সে-পরিচয় সম্পূর্ণভাবে জানা না থাকলেও এ-অভিজ্ঞতা সকলেরই জানা কথা যে বিস্মৃতপ্রায় অতি-সাধারণ কোনো কোনো কবিতার স্পন্দনের সঙ্গে কাব্যানুরাগীর হৃৎস্পন্দন বিস্ময়জনকভাবে জড়িত। স্মৃতির মন্দিরে সকলেই কিছু কিছু অর্ঘ

দিয়ে যেতে চান। জীবনে বিচিত্রের সমাবেশ। নানা মানুষ নানা কাজে ব্যস্ত। সকলের নিবেদনে সমান আন্তরিকতা থাকে না। এসব সত্ত্বেও কবি মাত্রেই আন্তরিক! গম্ভীর অধ্যাপক, সতর্ক ব্যবসায়ী, কৃতী চাকুরে অথবা নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরাও যখন কবিতা লেখেন, তখন তাঁদের অনতিদৃষ্ট অন্যতর সত্তাকেই কালের মন্দিরে প্রবেশার্থী বলে চেনা যায়। ১৩৩৫ সালের পয়লা পৌষ তারিখে স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে'র লেখা 'দীপালি' নামে একখানি কবিতার বই বেরিয়েছিল। সে বইখানির মাত্র পাঁচশ কপি ছাপা হয়েছিল। তার প্রথম কবিতার শেষ স্তবকে অধ্যাপক দে তাঁর এই গ্রন্থ-নামের মর্মার্থ টুকু প্রকাশ করেছিলেন :

বাসনার দীপগুলি একত্র জ্বালায়ে তুলি
স্মৃতির মন্দিরে দিনু দীপালি আমার।

১৩৩৪ সালে দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামে যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর 'নীহারিকা' বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন। তাতে 'দুঃখবিবাদী' নামে একটি কবিতা আছে এবং পাদটীকায় বাগচী কবির এই মন্তব্যটুকুও চোখে পড়ে যে তাঁর সে-কবিতাটি 'কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদী কবিতার ব্যঙ্গোত্তর'! বাগচী লিখেছিলেন :

'হায় কবি হায়! এমনি করিয়া মিথ্যার ঠুলি পরি
ভরা দুপুরেতে ঘনায়ে তুলিছ তমিস্রা শর্বরী।
দিনও যেমন রাত্রিও তাই, সমান আঁধার আলো
দুই আছে বলে সুখে ও দুঃখে জগতে বেসেছি ভালো।'

ব্যঙ্গে, অনুকরণে, প্রতিধ্বনিতে,—প্রসিদ্ধ উক্তির সজ্ঞান ও অজ্ঞান অনুস্মৃতিতে,—রূপের ছায়ায়, ছন্দের নকলে এবং প্রথার অভ্যাসে মাঝারি-কবিতার রাজ্য ভরপুর! অনুকরণ কোথাও খুবই সুস্পষ্ট, কোথাও অনতিস্পষ্ট। নরেন্দ্র দেবের 'বসুধারা' বইতে 'পরাস্ত প্রভাত' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। তাতে 'ভোরাই' শব্দটির মধ্যে সত্যেন দত্তের শব্দ-প্রভাবের লক্ষণ অন্ধ মানুষেরও চোখে পড়বে। আবার সেই বইয়েরই 'প্রসূতি' কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'-র ছাপ থেকে গেছে। 'ফাঁসি' এবং 'ফাঁসিয়ে দিয়ে' কথা দুটির ওপর তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। যতীন বাগচীর 'অপরাজিতা' বইয়ের 'ঘুমহারা', 'কালো', 'অভিমান', 'বরাত', 'মুরুব্বি', 'পাণ্ডা', নামের লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র ছায়া পড়েছিল। আবার ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'যমুনাতে' প্রকাশিত তাঁর 'চরকা-সঙ্গীত'-এর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার গান'-এর ছন্দ বদল হয়ে ভিন্ন ছন্দে একই বিষয় দেখা দিয়েছিল!

অনুকরণ ছাড়া মাঝারি-কবিতার আরো এক বিশেষ দিক আছে। শুধু 'নাস্তি'র দিক নয়, 'অস্তি'-র দিকটাও স্মরণীয়। ১৩২৯-এর জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে কুমুদরঞ্জন

মল্লিকের 'গাঁটকাটার চিঠি' বেরিয়েছিল। সেই সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'জীবন-দেবতা' ছাপা হয়। সময়ের স্রোতে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের নাম আজ প্রায় হারিয়েই গেছে। কুমুদরঞ্জন এখন বৈষ্ণব এবং পল্লী-কবি নামে সমাদৃত। কিন্তু তাঁর অন্য পরিচয় এই 'গাঁটকাটার চিঠিতে' সংরক্ষিত,—পরেও এ-ধারা তিনি পুরোপুরি ছেড়ে দেন নি।

কীট্‌সের La Belle Dame Sans Merci কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর সাতেক পরে ১৩৩৬ সালের পৌষের 'মানসী ও মর্মবাণী'তে মোহিতলাল লিখেছিলেন 'নিঠুরা রূপসী'। সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী' নামটি তিনি একটু বদলে নিয়েছিলেন। ঐ বছরেই অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে তাঁর 'নিশি-ভোর' বেরিয়েছিল। সেটিও মাঝারি-কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রে ও প্রভাতে'র রেশ ধরে গিয়েছিল তাঁর মনে। সেকালের এইসব মাঝারি এবং বিস্মৃতপ্রায় রচনার কথা ভাবতে ভাবতে আমার সৌম্যদর্শন, কৃতী এবং মধ্যবয়সী সেই অতিথির জন্যে কেমন যেন বেদনা বোধ করলুম। সেকালের জন্যে একালের মনেও মমতা টি঳কে থাকে। চারদিকের শত-সহস্র কোলাহলের মধ্যেও যৌবনের মগ্নতার স্মৃতি অটুট থাকে। স্মৃতি আমাদের দুর্গ—আমাদের মন্দির। সেই ব্যক্তিগত নির্জনতার হাওয়ায় যে-সব আবেগ এবং হৃৎস্পন্দন থেকে যায়, তারা তাদের রচয়িতার সম্পর্ক হারিয়েও বিলুপ্ত হয় না মাঝারি কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই তেমনি পরিত্যক্ত স্বাক্ষর। লীলাময় রায়ের 'মাঙ্গলিক' মনে পড়লো। ১৩৩৬-এর পৌষের 'বিচিত্রা'য় ছাপা হয়েছিল সে-কবিতা। জগতের তরুণ-তরুণীকে সম্বোধন করে লীলাময় লিখেছিলেন—'বক্ষস্তবক বসন্ত-অবনত, মলয়গন্ধী সুরা তোমাদের ঠোঁটে।' আরো আগে ১৩২৯ সালে বেরিয়েছিল সুরেশ চক্রবর্তীর 'ষোড়শী'। আজকের বিচারে সেও বোধ হয় মাঝারি-কবিতা বলেই গণ্য। তার কয়েক লাইন মনে এলো :

বসনখানি শাসন করো অয়ি
বয়েস তোমার হোলো বছর ষোলো
বুকের পরে জমাট-বাঁধা মধু
এ বারতা কেমন করেই ভোলো!
চোখের পাতে তড়িৎ হোলো ঢালা
সারাদিনের নেই সে অবোধ বালা
কোন্ অজানার তরে গোপন মালা
মনে মনে অমনি গেঁথে তোলো
বসনখানি শাসন করা সাজে
আজ যে বয়েস সর্বনাশা ষোলো।

এ লেখাটি তাঁর 'ইন্দ্রধনু' বইয়ের মধ্যে আজো আছে। তেমনি তাঁর 'অদরকারের না' এবং সেই সুদূর ১৩৩৪ সালের 'নবীনের গান'। সে-কালের নবীনরা একালে প্রবীণ হলেন। আমার আজকের এই কৃতী, মধ্যবয়সী, সৌম্যদর্শন অতিথি তাঁদেরই একজন। আমাদের সেই অতিক্রান্ত দশকের বাংলা মাঝারি-কবিতার একখানি সংকলন আজ তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলে সত্যিই সুখী হতুম!

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস আর কাশীরামের নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যুগযুগান্তব্যাপী প্রীতির সূত্রে জড়িয়ে আছে। কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন, আর, কাশীরাম দাস করেছিলেন সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। এই দুই মহাকাব্যের রসধারায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বহুকাল থেকে পুষ্টিলাভ করেছে। অতীতে তো বটেই, এমন কি উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রবল জোয়ারে যখন বাংলা দেশের সাহিত্য-সভ্যতা,—সব কিছুই নতুন রূপ নিতে আরম্ভ করে, সে-সময়েও, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ আমাদের কবি, সাহিত্যিক, চিন্তানায়ক—সকলেরই মনে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত্তিবাসের বিশেষ ভক্ত পাঠক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই একই কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্র-রচনাবলীরও একাধিক অংশে কৃত্তিবাসের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা গেছে। অর্থাৎ, এদেশের সংস্কৃতির সুদীর্ঘ প্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব যে এখানে কতো গভীর, কতো ব্যাপক, কতো বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে অণুমাত্র অসুবিধা হয় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কবির সম্বন্ধে বলেছিলেন :

'জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্তির বসতি
সতত তোমার নাম সুবঙ্গ-ভবনে,……'

মনে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই কবি কতোদিন আগে জীবিত ছিলেন? তাঁর পিতামাতার নাম কি? কোন্ গ্রামে তাঁর বসতি ছিল? তাঁর রচনার প্রকৃতিই বা কি রকম? এতোবড়ো খ্যাতিমান্ কবি যে-গ্রামে বাস করেছেন, যেখানকার ফলে-ফুলে, জলে-হাওয়ায় তাঁর দেহমন গঠিত হয়েছে, সে দেশ অবশ্যই তীর্থের সামিল! বাংলাদেশের সেই পবিত্র তীর্থটি কতোদূরে?

রানাঘাট রেলস্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে ছায়াচ্ছন্ন ছোটো একটি গ্রাম। বহুকাল

পূর্বে এই গ্রাম ছিল লতায়-পাতায়-ফলে-ফুলে স্নিগ্ধ। এখানকার অধিবাসীরা জাতিতে ছিলেন মালাকর। কৃত্তিবাস-কবির পূর্ব-পুরুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন ফুলের সম্পর্ক থেকে এ গ্রামের নাম হয় 'ফুলিয়া'। কৃত্তিবাস বলে গেছেন :

'গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী ॥'

চতুর্দশ শতকের শেষদিকে, সম্ভবতঃ ১৩৮০-র কাছাকাছি কোনো সময়ে এই ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, তিনি নাকি দীর্ঘজীবী হননি। সম্ভবতঃ পনেরোর শতকের প্রথম দিকেই তাঁর দেহাবসান হয়। পনেরোর শতকের শেষ দিকে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়, এবং তাঁর আবির্ভাবের বহুপূর্বে কৃত্তিবাসের তিরোভাব ঘটে।

বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, গুরুদক্ষিণা দিয়ে, মনে মনে রাজপণ্ডিত হবার আশা নিয়ে কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের কাছে পাঁচটি শ্লোক উপহার পাঠিয়েছিলেন :

'দ্বারীহস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখ টি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ ॥'

কৃত্তিবাস এই যে গৌড়েশ্বরের কথা বলে গেছেন, ইনি কে? কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন যে ইনি রাজা কংশনারায়ণ।—অন্যেরা বলেছেন, রাজা গণেশ। মনে হয়, এই গণেশ রাজাই ছিলেন কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক। তিনি গৌড়ে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। রাজা স্বয়ং তাঁকে রামায়ণ রচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই গৌরবের কথা স্মরণ করে কবি বলেছেন :

'চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত
সব বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥'

কৃত্তিবাসের এই যে সম্মান,—এ শুধু সেই রাজসভাতেই যে স্বীকৃত হয়েছিল, তা নয়। কৃত্তিবাসের অনেক দিন পরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনাকালে বলেছেন :

'করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস।
যাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ ॥'

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের আদি অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাস ঠাকুরের এবং সেই সঙ্গে তাঁর জন্মভূমি ফুলিয়া গ্রামের নাম আমাদের সকলেরই বন্দনার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। কবির আত্মপরিচয় থেকে তাঁর কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্য—এই দুই বিষয়েই কবির নিজের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর পিতার নাম বনমালী, মাতার নাম মেনকা—এবং সর্বসমেত ছয় সহোদরের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, এ তথ্যগুলিও জানা যাচ্ছে।

কিন্তু এই সব বিবরণ হাতে পাওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের চোখে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ এক জটিল সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর এই কাব্য-খানির ব্যাপক প্রচারের ফলে কৃত্তিবাসের রচনার অনুলিপি দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। এ-কালের গবেষকরা এই গ্রন্থের যে-সব পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, সেগুলির মধ্যে পাঠবৈষম্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে। এই সব বিভিন্ন পুঁথির আলোচনা করে পণ্ডিতরা দেখেছেন যে, পূর্ববঙ্গে যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলিতে বৈষ্ণবী ভক্তি প্রচারের বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়নি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুঁথিগুলিতে রাক্ষস-মুখে রামচন্দ্রের বন্দনাগান আরোপ করা হয়েছে এবং রামচন্দ্রের শরীরে বিষ্ণুর নানা লক্ষণ দেখে রাক্ষসরা ভয়ে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছেন বলেও মনে হয়। বীরবাহু আর রামচন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনাটিই দেখা যাক্ঃ ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে রামচন্দ্র যখন বীরবাহুর ধনুক খান্ খান্ করে দিলেন, তখন বীরবাহু কি করলেন ?

'কহিতেছে বীরবাহু যোড় করি হাত।
জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু অবতার ॥
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন ॥'

বীরবাহু বীর রাক্ষস। শত্রু রামচন্দ্রের অস্ত্রে আহত হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এরকম কথা বললেন কি করে ? বাল্মীকি তো এমন বর্ণনা দেননি। কৃত্তিবাস নিজের যে বিবরণ লিখে গেছেন, তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি রয়েছে। তাহলে বাল্মীকির রামায়ণে যা নেই, এমন বিষয় তাঁর গ্রন্থে কি সত্যিই লেখা হয়েছিল ? ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলিতে মূল রামায়ণ-বহির্ভূত এই জাতীয় বর্ণনা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুঁথিগুলিতে এই শ্রেণীর নানা কথা স্থান পেয়েছে। দশাননের আজ্ঞায় তরণী সেন রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে যখন মাতা সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন, সরমা তাঁকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। সেই নিষেধ শুনে রাক্ষস তরণী সেন বলেছিলেনঃ

'তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্য্যাস।
মরিলে রামের হাতে গোলকে নিবাস ॥'

পশ্চিমবঙ্গের পুঁথিতে এই সব ব্যাপার চোখে পড়ে। শুধু কি এইটুকু? তরণী সেনের যুদ্ধের সাজসজ্জা একটু দেখা যাক্:

'লক্ষ লক্ষ রাম নাম ধ্বজ পতাকাতে।
লিখিলেক রথে আর আপন অঙ্গেতে ॥'

অবশ্য, যুদ্ধে তরণী সেন বিশেষ সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু 'ত্রিভুবন বিজয়ী রামচন্দ্র' যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন সেই যুদ্ধের তাণ্ডব আবহের মধ্যেই তরণী সেন রামচন্দ্রের শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন! তরণী বলেছিলেন:

'কি ছার মিছার গর্ব স্বর্গ নাহি চাই।
মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণ খড়্গে মোক্ষমার্গে যাই।'

বলা বাহুল্য, তরণী সেনের ভক্তিময়তার এই বৃত্তান্তও বাল্মীকির রামায়ণে নেই। এই শ্রেণীর আর একটি দৃষ্টান্ত হোলো অঙ্গদের রায়বার। 'রায়বার' কথাটির মানে কি? 'রায়বার' কথাটি এসেছে 'রাজবার্তা' শব্দ থেকে। রাজার কাছে যে স্তুতি পাঠ করা হয়, অথবা কোনো দূত রাজার কাছে যা নিবেদন করেন, তারই নাম 'রায়বার'। রামচন্দ্রের দূত বানর বংশজ অঙ্গদ রাবণের কাছে যে বার্তা নিবেদন করেছিলেন, অঙ্গদের রায়বার-অংশে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণে সেই তথ্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই বর্ণনায় রাবণ আর অঙ্গদের বিদ্রূপদক্ষতার সরস দৃষ্টান্তগুলি দেখে পাঠকের মন প্রসন্ন হয় বটে; কিন্তু, এই 'অঙ্গদের রায়বার' অংশও বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত উপাদান। বাংলা রামায়ণের এ হোলো নিজের এলাকা,—এবং এই এলাকায়, অর্থাৎ 'অঙ্গদের রায়বার' বর্ণনায় কৃত্তিবাস এবং কবিচন্দ্র নামে দুই পৃথক কবির রচনার যে মিশ্রণ ঘটেছে, পণ্ডিতরা সে কথা স্বীকার করেছেন।

বাংলা রামায়ণের আদি অনুবাদক কৃত্তিবাসের রচনার পাঠবৈচিত্র্য দেখে পণ্ডিতরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটি এখানে সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যেতে পারে—কৃত্তিবাস ছিলেন বাংলার অতি জনপ্রিয় লেখক; ফলে, তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর ভক্ত কবিদের অনেক রচনাংশ, অনেক কল্পনা, অনেক ভক্তির কথা এবং হাস্যপরিহাসের দৃশ্য বহুকাল ধরে মিশ্রিত হয়ে এসেছে। তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তথাপি, বাল্মীকি রামায়ণের পরিবেশটি তিনি নিজে যে তাঁর অনুবাদে সর্বপ্রকারে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, তা ঠিক বলা যায় না। বাংলাদেশের সংস্কার, আচার এবং বিশেষ প্রবণতাগুলির প্রভাব কবি নিজেই কিছু কিছু তাঁর অনুবাদে এনে ফেলেছিলেন। তারপর আরো নানা কবির রচনার মিশ্রণে আমাদের বর্তমান যুগে কৃত্তিবাসের মূল অনুবাদ বহুধা বিকৃত রূপে আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজও সে-সব প্রচলিত রয়েছে।

কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণের মধ্যে আজ আর অবিমিশ্র কৃত্তিবাসী কাব্যের সৌরভ পৃথক করে পাওয়া যায় না। বাংলার কৃত্তিবাস আজ বাংলার একাধিক শতাব্দীব্যাপী জীবনের বিচিত্র কথা-উপকথার একটি প্রীতিকর প্রতীক রূপেই বন্দিত!